(উপন্যাস)

নরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ঃ
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ঃ আশাপূর্ণা দেবী ঃ
বাণী রায় ঃ সুশীল রায় ঃ শচীন্দ্রনাথ
বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বিমল মিত্র ঃ বিমল
কর ঃ সুমথনাথ ঘোষ ঃ
গজেন্দ্রকুমার মিত্র

প্রকাশক :—

বাসন্তী দাশগুপ্তা

গুপ্ত প্রকাশিকা

১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা—

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ-মুদ্রণ—

রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট

মুদ্রাকর—

হীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সুরেন্দ্র প্রেস

১৮৬৷১, আপার সার্কুলার রোড,

কলিকাতা

(১—১০ ফর্মা)

এবং

প্রদোষকুমার পাল

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

১৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

(১১—১৩ ফর্মা)

সাড়ে তিন টাকা

নিবেদন

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত অন্যান্য উপন্যাসের সহিত 'উন্মেষে'র পার্থক্য—ইহা কোন একক লেখকের রচনা নয়। বাংলার এগারোজন সুবিখ্যাত সাহিত্যিকের লেখনী ইহাকে একটি সম্পূর্ণ রূপ দিয়াছে। বিভিন্ন লেখকের চিন্তাধারার সম্মিলন একটি সম্পূর্ণ কাহিনী গড়িয়া তুলিয়াছে, কেহই কাহারও সহিত আলোচনা করেন নাই—ইহাই এই বারোয়ারী উপন্যাসটির বৈশিষ্ট্য। আধুনিককালে বর্তমান শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ কর্তৃক রচিত 'বারোয়ারী উপন্যাস' সম্ভবত ইহাই প্রথম ও অনন্য। 'উন্মেষ' পড়িয়া পাঠকসমাজ যদি আনন্দ লাভ করেন, তাহা হইলে আমাদের শ্রম সার্থক হইল মনে করিব। ইতি

প্রকাশক

লেখকগণের নাম রচনানুক্রমিক সাজানো হইল

উন্মেষ

ক্লাসের একঘর মেয়ের সামনে বাঙলার টিচার মণিকা দত্ত একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, 'বাঃ চমৎকার হয়েছে। বসন্ত ঋতু সম্বন্ধে এমন সুন্দর প্রবন্ধ ফার্স্ট ক্লাসের কোন মেয়েও লিখতে পারেনি। আমি তাদেরও এই বসন্তের ওপরেই লিখতে বলেছিলাম। কিন্তু মঞ্জুর মত এত ভালো লেখা, এমন নিখুঁত বর্ণনা কারোরই হয়নি। তোমাদের সকলের উচিত, ওর এই প্রবন্ধটা একবার করে পড়া। সবটাই তো তোমার লেখা মঞ্জু? না, কি কারো সাহায্য নিয়েছ?' মিসেস দত্ত একটু হাসলেন।

মঞ্জু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'না দিদিমণি, সব আমার নিজের। কারো কাছ থেকে কোন হেল্প্ নিইনি। কোটেশনগুলি নিয়েছি শুধু রবীন্দ্রনাথ থেকে।'

মিসেস দত্ত বললেন, 'তাঁর কাছ থেকে সবাইকেই নিতে হয়। তোমার কোটেশনগুলিও খুব এ্যাপ্ট হয়েছে। ভারি চমৎকার হয়েছে প্রবন্ধটি। বোসো।'

সহাধ্যায়িনীদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে মঞ্জু বসে পড়ল। আত্মপ্রসাদে ওর কোমল সুন্দর মুখখানা আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই প্রশংসা আজ নতুন নয়। প্রায় রোজ প্রত্যেক পিরিয়ডে ইংরেজি, বাঙলা, অঙ্ক, সংস্কৃত সব বিষয়ের টিচারদের কাছ থেকে কিছু-না-কিছু প্রশংসা পায় মঞ্জু। কিন্তু কোনদিন একঘেয়ে লাগে না। যত শোনে, ততই নতুন মনে হয়।

চৌদ্দ উৎরে সবে পনেরয় পা দিয়েছে মঞ্জু। এখনো ষোড়শী হয়নি, কিন্তু ভুবনেশ্বরী হয়েছে। নিজের ছোট জগতে মঞ্জুর একান্ত আধিপত্য।

বীণাপাণি বিত্তাপীঠের এই দ্বিতীয় শ্রেণীতেই মঞ্জু, যে শুধু অদ্বিতীয়া তাই নয়, সারা স্কুলের মধ্যে ওর একটি বিশেষ স্থান আছে। টিচাররা সবাই ওকে স্নেহ করেন। হেড মিস্ট্রেস আশা করেন, মঞ্জু জেনারেল স্কলারশিপ পেয়ে স্কুলের গৌরব বাড়াবে। দেখা হলেই পড়াশুনো সম্বন্ধে তিনি ওকে খুব উৎসাহ দেন।

শুধু যে ক্লাসে আর টিচার্স রুমে মঞ্জুর গুণপনা নিয়ে আলোচনা হয়, তাই নয়,—ক্লাসের প্রতিষ্ঠা দিবস, পুরস্কার বিতরণের দিন, আরো সব ছোট ফাংশনে গান আর আবৃত্তির জন্য ডাক পড়ে মঞ্জুশ্রী রায়ের। সেখানেও হাততালি আর বাছা বাছা পুরস্কারগুলি তার জন্যে বাঁধা থাকে।

সাধারণত পড়াশুনোয় যারা ভালো হয়, দেখতে তারা হয় কালো কুশ্রী। কিন্তু মঞ্জু এই নিয়মের ব্যতিক্রম। ওর গায়ের রঙ গৌর, মুখের ডৌল আর দেহের গড়ন সুন্দর। স্কুলের উৎসব-অনুষ্ঠানে, ছোট ছোট নাটকের অভিনয়ে মঞ্জুশ্রীই অবিসংবাদী নায়িকা।

সবুজ মলাটের মোটা এক্সারসাইজ বইটা মঞ্জুর হাতে ফিরিয়ে দিতে দিতে মিসেস দত্ত বললেন, 'প্রবন্ধ তো হোল, কিন্তু তোমাদের পত্রিকাব খবর কি? 'উন্মেষ'এর বসন্ত সংখ্যা কবে বেরোবে। ফাল্গুন গেছে, চৈত্রেরও আধাআধি হোল, এর পর তো দারুণ গ্রীষ্ম। কলকাতায বসন্ত আর ক'দিন।'

জীবনের বসন্তও খুব বেশি দিনের নয়। মিসেস দত্ত তিরিশ পেরিয়ে গেছেন। বোধ হয়, সে কথাটাও তাঁর মনে পড়ল।

মঞ্জুরা একটা হাতে-লেখা পত্রিকা বার করে—নামটা মিসেস দত্তই ঠিক করে দিয়েছিলেন 'উন্মেষ'। ঋতুতে ঋতুতে মঞ্জুদের 'উন্মেষ' বেরোয়, ঋতুতে ঋতুতে প্রচ্ছদপটের রঙ বদলায়। এ-পত্রিকারও

সম্পাদিকা মঞ্জুশ্রী রায়। লেখাগুলি মণিকাদিই মোটামুটি দেখে শুনে দেন। এসব কাজে তাঁর ভারি উৎসাহ।

মঞ্জু বলল, 'লেখাগুলি সবই খাতায় তোলা হয়ে গেছে। শুধু মলাটের ছবি আঁকাই বাকি। এবারও আর্টিস্ট স্বরজিৎ সেন ছবি এঁকে দেবেন। খাতাটা তাঁর বাড়িতেই পড়ে আছে।'

মিসেস দত্ত বললেন, 'তাগিদ দিয়ে বের করে আন। আর্টিস্টদের মত কুঁড়ে মানুষ আর দুটি নেই। তাঁরা নিজেরা কাজ করেন না, কাজ তাঁদের দিয়ে করিয়ে নিতে হয়।'

মঞ্জু বলল, 'আমি আজই করিয়ে আনব।'

স্কুল ছুটি হোল সাড়ে চারটেয়। এর মধ্যে অনেকবারই 'উন্মেষ' আর স্বরজিৎ সেনের কথা মঞ্জুর মনে পড়েছে। সত্যি অনেকদিন ধরে পড়ে আছে খাতাটা ওঁর কাছে। দিই দিই করে আর দিচ্ছেন না। ভারি অলস ভারি কুঁড়ে মানুষ স্বরজিৎ দা। নাছোড়বান্দা হয়ে ওঁর পিছনে লেগে না থাকলে ওঁকে দিয়ে ছবি তো ভালো, একটা লাইন পর্যন্ত টানানো যায় না। হেমন্ত আর শীত সংখ্যার বেলাতেও এই অভিজ্ঞতা হয়েছে মঞ্জুশ্রীর। আর্টিস্টের কুঁড়েমি ভাঙতে কি কম হাঁটাহাঁটি করতে হয়েছে মঞ্জুর ?

রত্না দাস পত্রিকার সহ-সম্পাদিকা। বয়সে মঞ্জুর চেয়ে বছর খানেকের বড়। কিন্তু পদগৌরবে ছোট বলে মঞ্জু তার ওপর খুবই প্রভুত্ব করে। স্কুল থেকে বেরিয়ে এসে মঞ্জু বলল, 'চল রত্নাদি, খাতাটা নিয়ে আসি স্বরজিৎদার কাছ থেকে।'

রত্না বলল, 'না ভাই, আমার কাজ আছে। তিনদিন ধরে মা গেছেন শিশুমঙ্গলে। ফিরে গিয়ে বিকেলের সব কাজ সেরে রান্না করতে হবে। স্কুলে যে আসতে পারছি এই ঢের।'

মঞ্জু ধমকের স্বরে বলল, 'না, তোমাদের নিয়ে আর পারা গেল না।

আজ শিশুমঙ্গল, কাল তমুক মঙ্গল। একটা-না-একটা অজুহাত লেগেই আছে। এমন করলে ক্লাবই বা চলবে কিভাবে, কাগজই বা বেরোবে কি করে!'

রত্না বলল, 'কি করব ভাই, আজকাল আমাকেই সব দেখতে হয়। পড়াশুনোর পর্যন্ত সময় পাইনে। তুমি বরং অমিয়া কি সুজাতা ওদের কাউকে নিয়ে যাও।'

মঞ্জুশ্রী বলল, 'তোমাদের কাউকেই লাগবে না, আমি একাই যেতে পারব।'

বান্ধবীদের বিদায় দিয়ে হাজরা রোডের মোড়ে এসে মঞ্জু মুহূর্তকাল ভাবল। এখনই সুরজিৎদের ওখানে যাবে না বাড়িতে বইগুলি রেখে তারপর যাবে। হাতে একরাশ বই। এ্যালজেবরা, ব্যাকরণ-কৌমুদী আর প্রবেশিকা-ভূগোলে বোঝা বেশ ভারী হয়েছে। এগুলি বাড়িতে রেখে আসাই ভালো। বইয়ের রাশ হাতে দেখলে সুরজিৎদা ভারি ঠাট্টা করেন, 'এই যে মূর্তিমতী সরস্বতী ঠাকরুণ, আজ গোটা কলেজ ষ্ট্রীটটা বগলে নিয়ে চলেছ, কিন্তু দু বছর বাদে যখন কলেজে ঢুকবে, দুই আঙুলের টিপে পাতলা একখানা খাতা ছাড়া কি কিছু আর তখন শোভা পাবে?'

এমন মজার মজার কথাও বলতে পারেন সুরজিৎদা। ভারি চমৎকার মানুষ, ভারি অদ্ভুত মানুষ।

সদানন্দ রোডের লাল রঙের ফ্লাট বাড়িটার তেতলায় তিনখানা ঘর নিয়ে মঞ্জুরা থাকে। বাবা মা দাদা বউদি আর সে। দুই দিদির আগেই বিয়ে হয়ে গেছে। তাই ছোট ঘরখানা মঞ্জুর ভাগেই পড়েছে। পুরো একখানা ঘরেরই সে মালিক। এ ঘরখানার ওপর দাদার লোভ ছিল। এ ঘরে সে পড়বে, বন্ধুরা কেউ এলে তাদের এখানে বসিয়ে গল্প করবে। কিন্তু দাদার অবুঝ আবদার মা কি বাবা কেউ মানেন নি।

তাঁরা দুজনেই বলেছেন, 'না না না। মঞ্জুর একখানা আলাদা ঘরের দরকার বই কি। ও বড় হয়ে উঠছে না, তাছাড়া পড়াশুনো আছে না ওর ?'

দাদা একটু আপত্তি করলে মা বলেছেন, 'ঘর তো তোমার পাওয়ার কথা নয়; সুমিতা আছে তাই ঘর একখানা তাকে দিয়েছি নইলে তোমার আবার ঘরের কি দরকার। কতক্ষণই বা বাড়িতে থাক। নেহাৎই কয়েক ঘণ্টা অফিসে থাকতে হয়, তাই—নইলে চব্বিশ ঘণ্টাই বন্ধুদের বাড়ি আড্ডা দিতে পারলে তোমার ভালো হয়। তোমার আবার বাড়ি ঘরের কোন দরকার আছে নাকি মৃণাল ?'

দাদা হেসে বলেছে, 'দরকার থাকলেও কি আর পাব ? মঞ্জু যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিনী সেখানে কারোরই জয়ের আশা নেই।'

লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়িগুলি ডিঙিয়ে মঞ্জু এসে নিজেদের পাঁচ নম্বর ফ্লাটটার সামনে দাঁড়াল। তারপর কড়া নাড়ল জোরে জোরে।

বউদি সুমিতা এসে দোর খুলে দিল। একুশ-বাইশ বছরের তরুণী বধূ। ছোট ননদের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'ব্যাপার কি, কড়া দুটি ভেঙে ফেলবে নাকি ?'

মঞ্জু বলল, 'নইলে কি তোমার ঘুম ভাঙবে ? আর ঘুমিও না বউদি। যথেষ্ট মোটা হয়েছ। নাও এবার ধরতো বইগুলি।'

সুমিতা বলল, 'ইস আমার দায় পড়েছে। স্কুলে পড়বে তুমি, আর বইয়ের বোঝা বুঝি আমি বয়ে বেড়াব ?'

বইয়ের বোঝা দু' বছর আগেও সুমিতা বয়েছে। যে বছর বি. এ. দিয়েছে, সেবারই বিয়ে দিয়েছেন বাবা। আর বোঝা বইতে হয় না।

মঞ্জু অবশ্য বইগুলি সত্যি সত্যিই বউদির হাতে পৌছে দিল না। নিচের মোটা খাতাটা কাঁধে ঠেকিয়ে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে চলল।

মেয়ের সাড়া পেয়ে ঘর থেকে সরোজিনী বেরিয়ে এলেন। বয়স

পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই করছে। পরনে চওড়া লালপেড়ে মিহি শাড়ি। সিঁথিতে মোটা সিঁদুরের দাগ। ঠোঁট দুটি পান আর দোক্তার রঙে রঞ্জিত। গায়ের রঙ এঁরও উজ্জ্বল। স্থূলাঙ্গী হলেও এখনো সুন্দরী বলা যায়। দেখলেই বোঝা যায় বেশ একটি সুখী স্বচ্ছল সংসারের গৃহিনী। মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হাঁপাচ্ছিস যে। ছুটতে ছুটতে এলি বুঝি, রোদে শুকিয়ে মুখের কি ছিরি হয়েছে দেখ।'

মঞ্জু হেসে বলল, 'মোটেই শুকোয়নি মা। আর আজ তেমন রোদ কোথায়, কেমন মেঘলা মেঘলা দিন দেখছ না।'

সরোজিনী বললেন, 'দেখেছি বাপু দেখেছি। এবার বইগুলি আমার হাতে দাও। আমি রেখে দিচ্ছি। নাতির চেয়ে পুতরা ভারি। একরত্তি মেয়ে, বই চেপেছে একরাশ। কি যে হয়েছে আজকালকার স্কুলগুলি।'

মায়ের পাশ কাটিযে নিজের ছোট ঘরে এবার ঢুকে পড়ল মঞ্জু। নিজের পছন্দ মত এ ঘরখানাকে সে সাজিয়েছে। জানলায় দরজায় নীল পর্দা। এক পাশে ছোট খাট। খাটের ওপর সাদা ধবধবে বিছানা। গেরুয়া রঙের শান্তিনিকেতনী বেড-কভারে আবৃত। মাথার কাছে ছোট বইয়ের সেলফ। ওপরের তাকে প্রাইজ পাওয়া গল্প আর কবিতার বই। নিচের তাকগুলি স্কুলের বই আর খাতায় বোঝাই। ঘরের কোণে ঢাকনিতে ঢাকা ছোট একটি সেতার। সপ্তাহে দু' দিন গানের স্কুলে যায মঞ্জু। ডান দিকে দেওযালের কুলুঙ্গিতে হলদে রঙের গুটিকয়েক সুন্দর সুন্দর ফাইল আর বাঁধানো খাতা। উন্মেষের সম্পাদিকার দপ্তর। মনোনীত আর অমনোনীত লেখা সবই সযত্নে সাজিয়ে নীল ফিতেয় বেঁধে রেখেছে মঞ্জু। অমনোনীত লেখার একটা ফাইল রাখা দস্তুর, তাই রাখতে হয়েছে। নইলে কিছুই মঞ্জুর অমনোনীত নয়, সমস্ত জীবনটাই পরম মনের মত।

বাবা কাজ করেন কাস্টমস-এ, দাদা ইনকাম ট্যাকস-এ। দুজনই অফিসারি গ্রেডে। তাঁরাই মঞ্জুর এসব সখের প্রশ্রয় দিয়েছেন—ফাইল, রঙীন পেন্সিল আর কাগজচাপা কিনে দিয়ে খেলনা অফিস সাজিয়ে দিয়েছেন মঞ্জুর। দাদা বলেছেন, 'একটা কলিং বেল কিনে দিতে হবে তোকে। যখন টিপবি আমিই না হয় বেয়ারার বেশে এসে হাজির হব। আর একটা পদ বাড়বে আমার। 'উন্মেষ' অফিসের হেড বেয়ারা।'

মঞ্জু হেসে বলেছে, 'আহা, ঠাট্টা করা হচ্ছে। সত্যিই কিন্তু 'উন্মেষ' অফিস একদিন আমাদের হবে। ছাপা হয়ে বেরোবে কাগজ, ছাপার অক্ষরে বেরোবে আমাদের সকলের নাম।'

এ স্বপ্ন মঞ্জু প্রায় রোজই দেখে। কলেজে একবার ঢুকতে পারলেই উন্মেষকে সে ছেপে বার করবে। সে হবে তখন সত্যিকারের কাগজের সম্পাদিকা।

কিন্তু সুরজিৎদার বাড়িতে আজই যেতে হবে, এখনই যেতে হবে মঞ্জুকে। উন্মেষের বসন্ত সংখ্যা কাল বার না করতে পারলে, মণিকাদির কাছে, মিতালী সঙ্ঘের সভ্যাদের কাছে তার মান থাকবে না। উন্মেষকে কেন্দ্র করে ছোট একটি ক্লাবও গড়ে উঠেছে মঞ্জুর—ক্লাসের বন্ধুরা যারা কাছাকাছি থাকে তারাই এ ক্লাবের সদস্যা। সপ্তাহে একবার করে অধিবেশন বসে। গান হয়, আবৃত্তি হয়। তারপরে হয় চা আর জলযোগ। দু চার আনা করে চাঁদা ক্লাবের সভ্যারা দেয়, কিন্তু তাতে খরচ কুলোয় না। সেজন্যে ভাবনা নেই মঞ্জুর। স্থায়ী পৃষ্ঠপোষক আছেন বাবা আর দাদা, আছেন মা আর বউদি। বাড়ির সবচেয়ে ছোট মেয়ে মঞ্জু। সে আজকাল আর পুতুল খেলে না, ক্লাব আর পত্রিকা নিয়ে খেলে। সে খেলায় অভিভাবকদেরও আনন্দ।

বাথরুম থেকে হাত মুখ ধুয়ে এসে স্কুলের শাড়ি বদলে পাট ভেঙে আর একখানা আকাশনীল শাড়ি পরল মঞ্জু। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলটা আঁচড়ে নিল আর একবার। আলগোছে পাউডারের পাফটা মুখে বুলিয়ে নিল।

সরোজিনী এসে ঘরের সামনে দাঁড়ালেন, বিস্মিত হয়ে বললেন, 'ওকি এখনই আবার কোথায় যাচ্ছিস মঞ্জু?'

'যাচ্ছি না, এক্ষুণি চলে আসছি মা।'

সরোজিনী ধমক দিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, কি তোরা হয়েছিস বল তো! স্কুল থেকে এই তো এলি। এক্ষুনি আবার হুট করে বেরোচ্ছিস। আচ্ছা তোর কি ক্ষিদে তেষ্টাও পায় না? এমন করলে শরীর টিঁকবে কি করে?'

মঞ্জু বলল, 'আমি একটু ক্লাবের কাজে বেরোচ্ছি মা। সুরজিৎদার ওখান থেকে ম্যাগাজিনটা আনতে যাচ্ছি। যাব আর চলে আসব। এসে খাব, এসে তোমার সব কথা শুনব। লক্ষ্মী মা।'

সরোজিনী শাসনের সুরে বললেন, 'থাক থাক আর আহ্লাদে দরকার নেই। আমার কথা না শুনলে ক্লাব-টেলাব সব আমি তুলে দেব বলে রাখছি। দয়া করে অন্তত এক কাপ দুধ খেয়ে যাও, কথা শোন আমার।'

পরম অনিচ্ছায় বড় এক কাপ দুধ আর দুটি সন্দেশ খেতেই হোল মঞ্জুকে। তারপর রুমালে মুখ মুছে আর কোন দিকে না তাকিয়ে দ্রুতপায়ে নেমে গেল নিচে।

সুরজিৎদা কাছেই থাকেন, হরিশ চ্যাটার্জি ষ্ট্রীটে। জায়গাটা অবশ্য ভালো নয়, বড় ঘিঞ্জি নোংরা গলি। বাড়িটাও খারাপ। পুরানো, নোনাধরা। একতলার যে ছোট ছোট দুখানি ঘর নিয়ে সুরজিৎদারা থাকেন সে ঘর দুখানাও ভালো নয়। ভারি স্যাঁতসেতে, কেমন যেন

অন্ধকার অন্ধকার। এই নিয়ে দাদার কাছে অভিযোগও করেছিল মঞ্জু, 'আচ্ছা দাদা, তোমার বন্ধু অমন কেন। একটু ভালো বাড়িতে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে থাকতে পারেন না?'

অমলেন্দু হেসে বলেছিল, 'পারে বইকি।'

মঞ্জু বলেছিল, 'তবে থাকেন না কেন?'

অমলেন্দু জবাব দিয়েছিল, 'ইচ্ছা করেই থাকে না। ছবির মত বাড়িতে যারা থাকে, তাদের দিয়ে ছবি আঁকা হয় না।'

মঞ্জু জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেন হয় না?'

অমলেন্দু বলেছিল, 'না, এত যদি কেন কেন করিস, আমি কেন, আমার ঠাকুরদাও সব জবাব দিতে পারবে না। আগে বড় হয়ে ওঠ, তারপর সব 'কেন'র জবাব একটা একটা করে নিজেই খুঁজে নিতে পারবি।'

ঢের বড় হয়েছে মঞ্জু। বুঝতে তার কিছু বাকি নেই। দাদা গোপন করলে কি হবে, সে টের পেয়েছে সুরজিৎদা'রা গরীব, খুবই গরীব। প্রথম প্রথম এই নিয়ে একটু মন খারাপ হয়েছিল, এখন আর হয় না। এখন বরং মনে হয়, ওই বাড়ি, ওই ঘর, ওই ছেঁড়া পাঞ্জাবি আর ময়লা পায়জামা ছাড়া যেন সুরজিৎদাকে মানায় না। সুরজিৎদা যদি ভালো বাড়িতে, ভালো সাজপোশাকে থাকতেন, তাহলে তিনি আর্টিস্ট না হয়ে দাদার মত ইনকাম-ট্যাক্স অফিসার হতেন। তা যে হননি, ভালোই হয়েছে। তাহলে মঞ্জুর ম্যাগাজিনের মলাট এঁকে দিত কে?

মাস ছয়েক আগে দাদাই একদিন সুরজিৎদার বাসায় সঙ্গে করে নিয়ে আলাপ করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'এঁকে চিনতে পারছ তো সুরজিৎ? 'উন্মেষ' পত্রিকার সম্পাদিকা। এঁর কাগজকে সচিত্র করবার ভার তোমার ওপর।'

সুরজিৎদা মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'বেশ তো।'

ঘর-বাড়ি যেমন সুন্দর নয়, সুরজিৎদাকেও তেমনি সুপুরুষ বলা চলে না। বয়সে দাদার চেয়েও বড়। বত্রিশ তেত্রিশ অন্তত হবে। শ্যামবর্ণ, রোগা ছিপছিপে চেহারা। প্রথমে একটু খুঁৎ খুঁৎ করেছিল মনটা। কিন্তু তারপর দেখতে দেখতে সয়ে গেছে। আর্টিস্টকে ওইরকম অসুন্দরই হতে হয়। সে যদি রূপবান হতো, তাহলে তো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে দিনরাত নিজের মুখ দেখলেই চলত। তাহলে তো সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকবার কথা তার মনেই হতো না।

এসব যুক্তিও দাদার মুখেই শুনেছে মঞ্জু। দাদা বড় অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলে, আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার বন্ধু সুরজিৎদা অদ্ভুত অদ্ভুত ছবি আঁকে। সে ছবি মঞ্জু বুঝতে পারে না। কিন্তু বুঝতে না পারার মধ্যেই তো মজা! অঙ্কের প্রশ্ন যত শক্ত হয় ততই ভালো, ততই মঞ্জুর হয় আনন্দ। সহজ প্রশ্ন যারা সাধারণ মেয়ে, যারা অঙ্কে কাঁচা তাদের জন্যে। ছবির বেলায়ও সেই কথা।

সেই থেকে সুরজিৎদার সঙ্গে মঞ্জুর ভাব। দাদার সঙ্গে তার এই বন্ধুর দেখা সাক্ষাৎ কদাচিৎ হয়। কিন্তু মঞ্জু যখনই ফুরসৎ পায় সুরজিৎদের বাসায় গিয়ে ঢোকে। এ যেন এক আলাদা দেশে বেড়িয়ে আসার আনন্দ।

সুরজিৎদা একা থাকেন না। তাঁর স্ত্রী আছে আর দুটি ছেলেমেয়েও আছে। বউদি দেখতে সুন্দরী নন। তেমন আলাপী কি মিশুকও নন। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। সুধা বউদির সঙ্গে তেমন দেখা সাক্ষাৎই হয় না মঞ্জুর। তিনি আবার কি একটা অফিসে টাইপিস্টের কাজ করেন। যতক্ষণ বাড়ি থাকেন, ততক্ষণও ঘর-সংসার, আর ছেলেমেয়েকে নাওয়ানো খাওয়ানো নিয়ে থাকেন। মঞ্জু বসে বসে সুরজিৎদার সঙ্গে গল্প করে। হাতের কাজ থাকলেও সে কাজ

রেখে সুরজিৎদা যে তার মত মেয়ের সঙ্গে সমবয়সী বন্ধুর মত গল্প করতে বসেন, এতে ভারি খুশি হয় মঞ্জু। ওর আত্মসম্মান যেন অনেকখানি বেড়ে যায়।

পরশু বিকেলেও পার্কের কাছে সুরজিৎদার সঙ্গে মঞ্জুর দেখা হয়েছিল। দেখা হতেই তাগিদ দিয়ে বলেছিল, 'কই, আমার ছবির কি হোলো?'

সুরজিৎদা বলেছিলেন, 'হচ্ছে।'

মঞ্জু হেসে বলেছিল, 'হচ্ছে হচ্ছে তো কতদিন ধরে করছেন। আর কিন্তু দেরি করতে পারব না।'

সুরজিৎদা বলেছিলেন, 'তাই নাকি?'

মঞ্জু বলেছিল, 'তা ছাড়া কি? আপনার জন্যে আমাদের কাগজ বেরোতে দেরি হয়ে যাচ্ছে যে। আর কোন কথা শুনব না আপনার, আমি কালই যাচ্ছি।'

সুরজিৎদা একটু শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন, 'না না কাল নয়, পরশু এসো।'

মঞ্জু জিজ্ঞেস করেছিল, 'পরশু কখন?'

'বিকেলে।'

'বিকেলে বেড়াতে বেরোবেন না তো!'

সুরজিৎদা বলেছিলেন, 'আমি বিকেলে বেড়াই না, দুপুরে বেড়াই। যখন সবাই কাজ করে আমি তখন টো টো করি। তুমি যদি যাও অবশ্যই থাকব।'

মঞ্জু বলেছিল, 'আমি নিশ্চয়ই যাব। ছবি তৈরি থাকে যেন।'

সুরজিৎদা বলেছিলেন, 'থাকবে।'

পুরানো বিবর্ণ বাড়িটার সামনে এসে মঞ্জু কড়া নাড়ল। একটি আধ বুড়ো ঝি এসে দোর খুলে দিয়ে বলল, 'এই যে তুমি। কিন্তু ওঁরা তো কেউ নেই।'

'সুরজিৎদা বাসায় নেই, কালীর মা? তুমি ঠিক দেখেছ তো?'

কালীর মা এ কথায় চটে উঠে রুক্ষ গলায় বলল, 'দেখেছি বাপু দেখেছি। বুড়ো হয়েছি বলে তো আর অন্ধ হইনি। না দেখতে পেলে করে-কম্মে খাচ্ছি কি করে!'

মঞ্জু মনে মনে হাসল। ঝি চাকরেরা একটু বেশি বকে। তাদের বাড়িতেও ঠিক এমনি।

মঞ্জু বলল, 'তাতো ঠিকই। আচ্ছা আমি একটু বাইরের ঘরটায় বসছি। ওঁরা আসুন ততক্ষণে। আমার বিশেষ দরকার।'

কালীর মা বলল, 'দরকার হয় বসতে পারো। কিন্তু কে কখন ফিরবেন তা আমি বলতে পারব না বাপু। যা মেজাজ নিয়ে আজ বেরিয়েছেন দুজনে।'

'আচ্ছা আচ্ছা, তোমার আর কিছু বলতে হবে না।'

মঞ্জু দোর ঠেলে সুরজিৎদার ঘরে এসে বসল। আজ যেন ঘরটা বড় বেশি অগোছালো। মেজেয় বইপত্র ছড়ানো, তক্তাপোশের ওপর কয়েকটা অসমাপ্ত পেন্সিল স্কেচ। খানকয়েক কাগজ টুকরো টুকরো করে ছেঁড়া। সুধা বউদি কি ঘরটা একটু গুছিয়ে রাখতেও পারেন না! আর সুরজিৎদারও আক্কেল দেখ। বললেন থাকবেন, অথচ এখন আর পাত্তা নেই। কিন্তু মঞ্জুও ছাড়বার মেয়ে নয়। যত রাতই হোক, সুরজিৎদাকে ফিরতেই হবে বাসায়। মঞ্জু তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে। তারপর ছবি আঁকিয়ে নিয়ে তবে বিদায় হবে এখান থেকে। তার আগে একটি পাও নড়বে না। কালকের মধ্যে বসন্ত সংখ্যা বার করাই চাই মঞ্জুর।

ভিতরের উঠানে কালীর মা বাসন মাজছে আর সুধা বউদির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বক বক করছে। মঞ্জু একা একা বসে থাকতে থাকতে একবার ভাবল উঠে যায় ওদিকে। কিন্তু কেমন যেন সংকোচ বোধ করল। সুধা বউদি নেই, তাঁর ঘরের ভিতর দিয়ে যাওয়াটা কি ভালো দেখাবে।

ঘরের এক কোণে একটা নেড়া টেবিল পড়ে আছে। ওপরে কোন ঢাকনির বালাই নেই। সুধা বউদি যেন কি! একটা টেবিল ক্লথও করে দিতে পারেন না। এর পরে যেদিন আসবে মঞ্জু একটা সুন্দর ঢাকনি করে নি আসবে। এই টেবিলের দুটি দেরাজের মধ্যে সুরজিৎদার তুলি আর রঙের বাক্স-টাক্স থাকে। অনেকদিন তাঁর সামনে মঞ্জু এসব দেরাজ ঘেঁটে দেখেছে। তিনি রাগ করেন নি, বরং খুশিই হয়েছেন। খোলা দেরাজ। চাবিটাবির বালাই নেই। আজও মঞ্জু দেখবে নাকি খুলে। যদি সুরজিৎদা কোন ছবিটবি রেখে গিয়ে থাকেন তার জন্যে? তাদের ম্যাগাজিনটা বা কোথায়? সেটাও কি দেরাজের মধ্যে রেখে গেছেন? মঞ্জুর ভারি লোভ হোলো দেরাজটা খুলে দেখে। কিন্তু খুলতে গিয়ে কেমন একটা সংকোচও বোধ করল। ছি ছি ছি ওঁরা কেউ বাড়ি নেই, কাজটা কি ভালো হবে!

কৌতূহল আর ভদ্রতার সঙ্গে এ দ্বন্দ্ব বেশিক্ষণ চালাতে হোল না, মিনিট পনর বাদেই সুধা বউদি ঘরে ঢুকলেন। ঘরে ঢুকেই একটু যেন চমকে উঠলেন, 'কে? কে অন্ধকারে বসে?'

সুধা সুইচ টিপে আলো জ্বালল ঘরের, 'ও তুমি?'

মঞ্জু বলল, 'হ্যাঁ বউদি, আমি। অনেকক্ষণ ধরে বসে আছি।'

সুধা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মঞ্জুর দিকে তাকাল, 'একাই বসে আছ? তিনি ছিলেন না?...তিনি কোথায় গেলেন?...আমার পায়ের সাড়া পেয়ে পালালেন নাকি?'

সুধা অদ্ভুত একটু হাসল।

মঞ্জু লজ্জিত হয়ে বলল, 'সুরজিৎদার কথা জিজ্ঞেস করছেন বউদি? তাঁর সঙ্গে তো আমার দেখা হয়নি, তাঁর জন্যেই তো অপেক্ষা করছি।'

সুধা রুক্ষ, শুকনো গলায় বলে উঠল, 'তা আমি জানি। তুমি যে কার জন্যে অপেক্ষা করছ তা আমার জানতে বাকি নেই।'

মঞ্জু অবাক হয়ে সুধা বউদির দিকে তাকাল। দেখতে আরো যেন রোগা হয়েছেন বউদি, আরো কালো, আরো বিশ্রী। আর কি খরখরে গলা! হঠাৎ কেমন যেন খারাপ লাগতে লাগল মঞ্জুর। তক্তাপোশ ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমাদের ম্যাগাজিনের ছবিটা কি আঁকা হয়ে গেছে বউদি? হয়ে থাকলে দিন। আমি নিয়ে চলে যাই।'

সুধা বলল, 'সে কি কথা। এতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করলে, দেখা না করেই যাবে? আরো খানিকক্ষণ বোসো।...সে আসুক। দুজনকে পাশাপাশি দেখে নয়ন জুড়াই তারপরে যেয়ো'...

মঞ্জু অস্ফুট, কাঁপা গলায় বলল, 'বউদি, এসব কি বলছেন? আমি যাই,...আমাকে যেতে দিন।'

কিন্তু হাতের ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে সুধা দোর আগলে দাঁড়াল। ওর মাথায় আঁচল নেই, কোটরের ভিতর থেকে চোখ দুটো জ্বলছে, 'না না, শোন,...আজ তোমাকে সব শুনে যেতে হবে।'

মঞ্জু অসহায় ভঙ্গিতে বলল, 'কি শুনব। আপনি এসব কি বলছেন আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে!'

সুধা চেঁচিয়ে উঠল, 'ন্যাকা, বদমাস মেয়ে? তুমি কিচ্ছু বুঝতে পারছ না!...তুমি কচি খুকিই আছ? তুমি কিচ্ছু জানোনা না, না? কিন্তু আমি সব জানি, আমি সব শুনেছি। কালীর মার কাছ থেকে আমার কিচ্ছু শুনতে বাকি নেই। আর অন্যের কাছে আমার

শোনা-শুনিরই বা কি আছে! আমি নিজেই কি সব দেখতে পাচ্ছিনে, নিজেই কি সব টের পাচ্ছিনে?'

নির্বাক বিমূঢ় মঞ্জু কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল। সুধা বলে চলল, 'আজ সাত আট দিন ধরে ঘরে একটি টাকা নেই। কোন রকমে ধার করে রেশন এনেছি। সারাদিন টাইপ করতে করতে আমার হাত ব্যথা হয়ে গেল। আর উনি আছেন ওঁর আর্ট নিয়ে আর তোমাকে নিয়ে।...যাতে দুটি পয়সা আসবে, ছেলেমেয়ে দুটি খেয়ে বাঁচবে তার নামে দেখা নেই, উনি ম্যাগাজিনের মলাট আঁকছেন, ষোড়শী সুন্দরীর ধ্যান করছেন।...এই নাও তোমার ম্যাগাজিন।'

তাকের ওপর থেকে উন্মেষের বসন্ত সংখ্যা নিয়ে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিল সুধা, 'যাও চলে যাও। মলাট আঁকাতে হয়, অন্য জায়গায় গিয়ে আঁকিও। কত পার্ক আছে, গার্ডেন আছে, আঁকবার জায়গার অভাব কি, মেলবার জায়গার অভাব কি!...কিন্তু আমার চোখের ওপরে নয়, আমার চোখের ওপরে নয়।'

ঘর থেকে এবার নিঃশব্দে রাস্তায় নেমে এল মঞ্জু। ধুলো মাখা খাতাটা তুলে নিল হাতে। পুরোপুরি ছবিটা আঁকা হয়নি। কেবল ফুলে পল্লবে ভরা বসন্ত ঋতুর অস্পষ্ট একটা আভাস পেন্সিলের দাগে দাগে ফুটে উঠেছে। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে দ্রুত পায়ে বাড়ির দিকে ছুটে চলল মঞ্জু। সুধা বউদির কথাগুলি বিকটমূর্তি ধরে যেন পিছনে পিছনে তাড়া করে আসছে। তার পালিয়ে যাওয়া চাই। কিন্তু চোখের জলে সামনের পথ ঝাপসা হয়ে আসছে মঞ্জুর, কিছু দেখতে পাচ্ছে না যে...

কবিতায় ভরা বসন্তকালের প্রবন্ধ, মণিকাদির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, ফুল আর ছবি, ক্লাব আর ম্যাগাজিনের মধ্যে হঠাৎ কতকগুলি বিশ্রী কটু শব্দ এসে জড়ো হয়েছে। আর আশ্চর্য, অভিধান ছাড়াই প্রত্যেকটি

শব্দের মানে বুঝতে পেরেছে মঞ্জু। কেন পারবে না? সে তো আর সত্যিই খুকি নেই। সে আজ বড় হয়েছে। বড় হওয়ার কি যে মানে, বড় হওয়ার কি যে জ্বালা তা আজ প্রথম টের পেয়েছে মঞ্জু।

আঁচল দিয়ে চোখ দুটো মঞ্জু আবার মুছে নিলো। শুধু সামনের পথই ঝাপসা নয়, সারা পৃথিবীটাই কেমন জমাট বাঁধা অন্ধকার। এগোনো যায় না। তার ওপর সুধা বউদির কথাগুলো যেন হুলের মতন ফুটছে সারা গায়ে। আশ্চর্য, সুরজিৎদার সঙ্গে তার মেলামেশা মানুষ এমন চোখে কখনও দেখতে পারে তা মঞ্জু কোনদিন ভাবতেও পারেনি।

গলির মোড় অবধি গিয়ে মঞ্জু চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়লো। বাড়ি ফিরতে মোটেই মন লাগছে না। আভাসে বুঝতে পারলো দুটো গাল এখনও টকটকে লাল, আঙুলের ডগাগুলো এখনো কাঁপছে থরথরিয়ে। বড়ো হওয়ার লজ্জাটুকু জানা ছিলো, কিন্তু বড়ো হওয়ার এতো অপমান, এত জ্বালা তা কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেনি।

চৌকাঠে পা দিলেই সুমিতা বৌদি মুখ মুচকে হাসবে, 'কি খবর, মঞ্জু দেবী, সুরজিৎবাবু বুঝি ধুলো পায়েই বিদায় করলেন?'

একটি কথাও মঞ্জু বলতে পারবে না। কিন্তু সত্যি ধুলোপায়ে বিদায় দেওয়াই যেন ছিলো ভালো, এমনভাবে মুঠো মুঠো ধুলো সারা গায়ে ছিটোনোর চেয়ে।

অবশ্য কথাগুলো বলা সুমিতা বৌদির কিছু অন্যায় হবে না। সুরজিৎদার বাড়ি থেকে অন্য কোন দিন এত সকাল সকাল মঞ্জু ফেরে না। ফিরতে দেন না সুরজিৎদা। প্রকাণ্ড ছবির অ্যালবাম খুলে সামনে ধরেন, সে অ্যালবামে অবশ্য সুরজিৎদার আঁকা একটা ছবিও থাকে না। নিজের ছবি অত যত্ন করে রাখবেন সুরজিৎদা, তবেই হয়েছে। তাঁর

সব ছবি, মঞ্জুই খুঁজে খুঁজে বের করে। নেড়া টেবিলের পাশ থেকে, খোলা দেরাজের তাক থেকে, কখনও বা ঘরের মেঝেয় পড়ে থাকে। আর নিজের ছবির সম্বন্ধে দরদের বালাই নেই সুরজিৎদার। মানুষটার মতন ছবিগুলোও অদ্ভুত। দু' একবার ছবিগুলোর মানে সুরজিৎদাকে জিজ্ঞাসাও করেছে মঞ্জু। চেয়ারে হেলান দিয়ে সুরজিৎদা মুচকি হেসেছেন, 'ছবির আবার মানে কি ?'

'কিন্তু এ ছবিটা চোখে কেমন যেন ঠেকছে !' হাতের ছবিটা মঞ্জু বাড়িয়ে দিয়েছে সুরজিৎদার দিকে। সবুজ পাতাসুদ্ধ একটা ডাল, পাতার ফাঁকে লালচে ফুলের আভাস। না গাছের গোড়া, না শিকড়। আচমকা ফুলে ভরা এমন একটা ডালের কোন মানে মঞ্জু খুঁজে পায় না।

সুরজিৎদা হাসি থামাননি। বলেছেন, 'চোখ দিয়ে ছবি দেখার দিন উঠে গেছে। আজকাল মন দিয়ে দেখতে হয়। মানেও খুঁজতে হয় মন দিয়ে !'

ছবির চেয়ে সুরজিৎদার কথাগুলো আরো শক্ত ঠেকেছিলো। আর কোন কথা বলেনি মঞ্জু। ঘুরে ঘুরে দেখে এক সময়ে রাস্তায় এসে নেমেছিলো।

হঠাৎ মঞ্জুর খেয়াল হলো। এমনভাবে গলির মোড়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে ভাববে কি মানুষ ! চেনা লোকের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেলে লজ্জার অবধি থাকবে না। তা ছাড়া বাবা আর দাদাও তো ফিরবেন এই পথ দিয়ে। বাবা হয়তো কিছু বলবেন না। একবার চোখ তুলে দেখেই পাশ কাটিয়ে চলে যাবেন। কিন্তু দাদা ঠিক এসে দাঁড়াবেন সামনে। টাইয়ের ফাঁস আলগা করে, মাথার হ্যাট খুলে সামনে ঝুঁকে পড়ে একগাল হাসবেন, 'কি ব্যাপার, রাস্তার মাঝখানেই 'উন্মেষ' বিক্রী চলছে না কি ?'

ঠিক এমনি করে দাদা কথা বলবেন। আজ বলে নয়, চিরকাল।

সেই কবে খেতে খেতে দাদার মস্করার উত্তরে মঞ্জু একবার বলে ফেলেছিলো, 'দেখবে, দেখবে 'উন্মেষ' আমরা ছাপিয়ে বের করবই। আর একটা বছর।'

'বটে'—দাদা ভুরু দুটো কপালের মাঝ বরাবর তুলে ফেলেছিলেন, 'কিন্তু তারপর, অতো কাগজ থাকবে কোথায়? সম্পাদিকার খাটের নিচে না আলাদা গুদামঘর ভাড়া নেওয়া হবে?'

'কেন বিক্রী হবে?'

'বিক্রী! মন্দ কথা নয়। তা হলে আমাকে দিও কিছু কাগজ। ইনকাম-ট্যাক্সের প্যাঁচে পড়ে যারা অফিসে গিয়ে উঠবে, তাদের ধরে ধরে 'উন্মেষ' গছাবো। তেমন তেমন পার্টি দেখলে আজীবন গ্রাহকও করে দেবো।'

কাজেই দাদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে সেই ঠাট্টার জের চলবে। তার চেয়ে মঞ্জু পায়ে পায়ে রাস্তার এপারে চলে এলো। রোদ নেই কিন্তু উত্তাপ রয়েছে। সামনের রেলিং ঘেরা ছোট্ট পার্কে একটি ঘাসের আঁচড়ও নেই। আশেপাশে গাছগুলোও হৃতপল্লব। দু' একটি সবুজ পাতা উঁকি দিচ্ছে। আশ্চর্য, 'উন্মেষ'এর বসন্ত সংখ্যা না বেরোলে শহরেও বুঝি বসন্ত আসবে না! প্রকৃতিও অপেক্ষায় রয়েছে।

গেট পার হয়ে মঞ্জু পার্কের মধ্যে ঢুকলো। বেঞ্চ খালি পাওয়া অসম্ভব। ছেলে বুড়োয় ঠাসবোঝাই। রোদ কমার সঙ্গে সঙ্গেই পার্কে আর তিলধারণের স্থান থাকে না। মানুষের পায়চারী করার জায়গাটুকুরও অভাব। দুপুরের দিকে পার্ক অবশ্য অনেকটা ফাঁকা। পরশু ওই বিলিতী সুপুরী গাছটার কাছাকাছিই সুরজিৎদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সেদিন সুরজিৎদা স্পষ্ট করে বলে দিলেই পারতেন—এমন লুকোচুরি না করে। মঞ্জুর যাওয়া আসা সুধাবৌদি যে মোটেই পছন্দ

করেন না, একথা সুরজিৎদা আগে থেকে বলে দিলে সাবধান হতে পারতো মঞ্জু। গাল বাড়িয়ে এমন চড় খেতে হতো না।

এমনও হতে পারে সুরজিৎদাও জানতেন না কিছু। সুধা বৌদির মনে তিল তিল করে বিদ্বেষের ধোঁয়া জমে উঠছে এ খবর মঞ্জুই কি জানতো! এগিয়ে এসে সুধাবৌদি অবশ্য কোনদিনই কথা বলেননি, কিন্তু বাধাও দেননি মঞ্জুকে। ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় মঞ্জু দেখেছে চোখ তুলে। সুধাবৌদি ছেলেমেয়েদের ছেঁড়া জামায় তালি দিচ্ছেন কিংবা সংসারের খুঁটিনাটি কাজ করছেন। চোখাচোখি হয়েছে মঞ্জুর সঙ্গে। মুচকি হেসেছেনও। কিন্তু সে হাসির জাত বোঝার চেষ্টা মঞ্জু করেনি। পরিশ্রান্ত গৃহস্থবধূর ম্লান হাসি এই মনে হয়েছিলো। চোখের কোণে, ঠোঁটের ভাঁজে বিদ্বেষের মিশেল ছিল কি না, তা দেখার খেয়াল হয়নি।

একটু এদিক ওদিক করে মঞ্জু আবার পার্কের বাইরে বেরিয়ে এলো। মনের এক বিশ্রী অবস্থা। কপালের দুটো পাশ দব দব করছে। কিছুতে সোয়াস্তি নেই।

* * * *

বরাত ভালো। সিঁড়ির কাছ বরাবর কেউ নেই। দরজা ভেজানোই ছিলো। আলতো হাত ছোঁয়াতেই খুলে গেলো। এদিক ওদিক চেয়ে মঞ্জু নিজের ছোট্ট ঘরে এসে ঢুকলো। উন্মেষের ফাইলের মধ্যে বসন্ত সংখ্যাটা সন্তর্পণে তুলে রাখলো। রাখবার আগে আর একবার দেখলো সুরজিৎদার আঁকা মলাটের অর্ধসমাপ্ত ছবিটা। আর ঘণ্টাখানেক! ঘণ্টাখানেক বসতে পারলেই রংয়ে রেখায় অপূর্ব হয়ে উঠতো ছবিটা। কিন্তু সময় পেলেই বুঝি সব সময় সব জিনিস পূর্ণ হয়ে ওঠে!

বিছানার ওপর মঞ্জু টান হয়ে শুয়ে পড়লো। আবছা অন্ধকার। হাত বাড়িয়ে বেড সুইচটা টিপতে গিয়েও কি ভেবে হাত গুটিয়ে নিলো।

থাক, অন্ধকারই ভালো। জানলার কালো কালো গরাদগুলো দেখা যাচ্ছে, অস্পষ্ট সেতারের কাঠামো, বইয়ের ছোট সেলফ। অনেকটা রঙ না দেওয়া সুরজিৎদার পেন্সিলের আঁচড়ের মতন।

একটু বোধ হয় তন্দ্রাই এসে থাকবে। হঠাৎ খুট করে আওয়াজ হতেই মঞ্জু ধড়মড় করে উঠে পড়লো, সুমিতা বৌদি সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিয়েছে।

'একি, তুমি কখন এলে?' বৌদি এগিয়ে এলো, 'অবেলায় শুয়ে যে? শরীর খারাপ হয়নি তো?'

মঞ্জু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। এখনি বৌদি এগিয়ে এসে গালে কপালে হাত রাখবে। শরীরের উত্তাপ অনুভব করবে, কিন্তু বুকের অশান্ত দাপাদাপি, মনের জ্বালার কোন খোঁজই পাবে না।

'ও কিছু নয়', মঞ্জু শাড়ি সামলে উঠে বসলো, 'রোদ্দুর লেগে মাথাটা টিপ টিপ করছে।'

'হুঁ' বৌদি এসে খাটের ওপর বসলো, 'বললে তো শুনবে না, এই রোদ্দুরে স্কুল থেকে এসেই আবার ছুটলে সুরজিৎবাবুর বাড়ি।'

একটু একটু করে গলা চড়াতেই মঞ্জু বৌদির দুটো হাত জড়িয়ে ধরলো, 'তোমার পায়ে পড়ি বৌদি, চেঁচিয়ো না। কিছু হয়নি আমার, আমি উঠে পড়ছি।'

সত্যি সত্যিই কথার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জু উঠে পড়লো। দু হাত দিয়ে ঘাড়ের ওপর ভেঙে পড়া খোঁপাটা ঠিক করে নিলো। আকাশ-নীল শাড়ির আঁচল দিয়ে কপালটা মুছলো। তারপর বৌদির দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বললো, 'কি ব্যাপার, চুপি চুপি আমার ঘরে যে?'

এবার সন্ত্রস্ত হওয়ার পালা বৌদির। খাট থেকে উঠে এসে মঞ্জুর দু কাঁধে হাত রেখে বললো, 'তোমার একটা জিনিস চুরি করতে

এসেছিলাম ভাই। কিন্তু মালিক সজাগ তা কি জানি। একেবারে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেলাম!'

'কি জিনিস বলো তো?'

বৌদি মুখে কিছু বললো না। চোখ দুটো কুঁচকে দেখালো ঘরের কোণে ঢেকে রাখা সেতারের ওপর।

বুঝতে মঞ্জুর দেরি হলো না। মাঝে মাঝে দাদার অবশ্য এমনি খেয়াল হয়। একটানা অফিসের পরে একটু অবসর বিনোদন।

দাদার ঘরের সংলগ্ন ছাদের বাড়তি অংশটা গোটা কয়েক টব দিয়ে ছাদের একটা ইশারা তৈরী করা হয়েছে। বেল, জুঁই, আর গোটা কয়েক পাতাবাহারের চারা। ফুলের সঙ্গে সম্বন্ধ নেই, অথচ জল ঢেলে ঢেলে দাদা বৌদির প্রাণান্ত। ছোট ঘরটা মঞ্জুর ভাগে পড়ার পর থেকেই দাদার এই খেয়াল।

মাঝে মাঝে খেয়ালের রকমফের হতো। মাঝখানে বেতের মোড়া নিয়ে দাদা বসতেন। বৌদির ওপর হুকুম হতো সেতার বাজাবার। প্রথম প্রথম ঘোমটা টেনে বৌদি ভুরু কুঁচকেছে, 'কি যেন হচ্ছো তুমি দিন দিন। মা বাবা ঘোরাঘুরি করছেন আশেপাশে, আর আমি বসে বসে সেতার শোনাবো।'

দাদা বেপরোয়া। আমলই দেননি। একটা পায়ের ওপর পা রেখে বলেছিলেন, 'কি আশ্চর্য, আমার মা বাবার সামনে প্রথম দিনই তো সেতার বাজিয়েছো তুমি! চোখজুড়ানো রূপই নয়, কানজুড়ানো সুরও তোমার করায়ত্ত তা তাঁদের অজানা নেই!'

'আহা', বৌদি মুখ ঝামটা দিয়েছে, 'সে তো যেদিন ওঁরা আমায় দেখতে গিয়েছিলেন।'

দাদা আরও গম্ভীর, 'দেখার পালা কি আজো শেষ হয়েছে মনে

করো। এখনো প্রবেশন পিরিয়ড চলেছে। একটু বেচাল দেখলেই ফেরৎ পাঠিয়ে দেবো।'

'বেঁচে যাই, যেতে পারলে।' বৌদি সরে গিয়েছিলো। কিন্তু চৌকাঠ পেরিয়ে বাপের বাড়ির দিকে নয়, এদিক ওদিক চেয়ে মঞ্জুর ঘরের মধ্যে। তারপর থেকে মাঝে মাঝে দাদার ছাদ থেকে বৌদির সেতারের আওয়াজ ভেসে আসতো। ভারি মিষ্টি হাত। আঙুলের আলতো ছোঁয়ায় আসন্ন সন্ধ্যার ছায়া-থমথম পূরবীর আলাপ অপূর্ব মনে হতো। কতদিন নিজের ঘরে খোলা বই সামনে রেখে মঞ্জু তন্ময় হয়ে শুনেছে। মঞ্জুর হাতও নিন্দার নয়, কিন্তু এখনও শিক্ষানবিশীর আড়ষ্টতা আছে, তার আর আঙুলের মাঝখানে সঙ্কোচের ব্যবধান।

মঞ্জু হাসল, 'তা হলে আর দেরী করো না বৌদি। নিয়ে যাও সেতার। দেরী হলে দাদার আবার মেজাজ বিগড়ে যাবে।'

সেতারটা সন্তর্পণে তুলতে তুলতে সুনেতা বৌদি বললো, 'তোমার দাদার মেজাজের ভারি তোয়াক্কা রাখি আমি। আমি বাজাবো না বল্লে কাউকে আর 'হাঁ' করতে হচ্ছে না।'

বৌদি আর দাঁড়ালো না। মঞ্জুও চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো। শাড়িটা বদলানো দরকার। কি গুমোট গরমই পড়েছে। দাদাকে বলে একটা পাখার বন্দোবস্ত করতে হবে। সবুজ হাল্কা ছোট্ট পাখা। সামান্য শব্দও নয়, কিন্তু অসামান্য শরীর জুড়োবার ক্ষমতা। ঠিক যেমনটি রত্নাদির ঘরে আছে।

আকাশ-নীল শাড়ি ছেড়ে ধূপছায়া রংয়ের একটি শাড়ি মঞ্জু জড়িয়ে নিলো। জানলার পর্দাগুলো তুলে বই খুলে চেয়ারে বসতে বসতেই শুনতে পেলো সেতারের আলাপ। খুব আস্তে কান পেতে থাকলে তবে শোনা যায়। ঠিক এমনিভাবেই বৌদি শুরু করে, তারপর আস্তে আস্তে উঁচু পর্দায় ওঠে। তারের ঝঙ্কারে সারা বাড়িটা গম গম করে ওঠে।

পড়ার বই খুলেই কিন্তু মঞ্জু মুশকিলে পড়ে গেলো। কানের পাশে অবিশ্রান্ত মৌমাছির গুঞ্জন। চোখের সামনে ঝাপসা বইয়ের প্রতিটি অক্ষর।

সেতারের ঝঙ্কার ডুবিয়ে কানে ভেসে এলো সুধাবৌদির কল-ঝঙ্কার।

'একাই বসে আছো? তিনি ছিলেন না? তিনি কোথায় গেলেন? আমার পায়ের সাড়া পেয়ে পালালেন নাকি?'...

টেবিলের ওপর মাথা রেখে মঞ্জু অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো। ওর মনে হলো চীৎকার করে কাঁদতে পারলে তবে সামলাতে পারবে কিছুটা। নয়তো জমাট বাঁধা কান্নাকুণ্ডলী পাকিয়ে ঠেলে উঠছে গলার কাছটায়। সারা শরীরে অবসাদের ভার।

চেয়ারটা টেনে দেওয়ালের কাছ বরাবর নিয়ে গেলো। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে জুতসই হয়ে বসলো। দু' হাতে মাথাটা ঝেঁকে নিয়ে সমস্ত চিন্তা দূর করার চেষ্টা যা কোনদিন করেনি মঞ্জু, আজ তাই করলো। গুণ গুণ করে পড়তে শুরু করলো। অশোকের সাম্রাজ্য-বিস্তারের কাহিনী, মৌর্যশক্তির বিজয় ইতিহাস।...কিন্তু অসম্ভব! সুধা বৌদির পর্দায় পর্দায় গলা চড়ানোর সঙ্গে সেতারের আওয়াজও চড়তে শুরু করলো।

চেয়ার ছেড়ে মঞ্জু উঠে পড়লো। বাথরুমে গিয়ে মুখে চোখে জল দিতে হবে ভালো করে। নয়তো এ ঘোর কাটবে না। আজ না হয় চোরের মতন মাথা নিচু করে পালিয়ে বাঁচলো, কিন্তু এরপর পথে-ঘাটে সুরজিৎদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে কি বলবে মঞ্জু! মুখ তুলে চাইবে কি করে? সুধাবৌদির এমন একটা অন্যায় সন্দেহের কথা মরে গেলেও মুখ ফুটে কাউকে বলতে পারবে না। নিজের বৌদিকেও নয়।

সুরজিৎদা হয়তো আগের মতনই হেসে বলবেন, 'তারপর সরস্বতী ঠাকরুণ, পরীক্ষার তো অনেক দেরী। আজকাল যে পাত্তাই পাওয়া যায় না, কি ব্যাপার? হরিশ চ্যাটার্জি লেনটা এমন কিছু দূরে নয় কিন্তু।'

তা হয়তো নয়, কিন্তু দূরে নয় বলেই বুঝি হুট হুট করে সব সময় সব জায়গায় যাওয়া চলে? পথের দূরত্বই বুঝি কেবল বাধা, আর কোন বাধা থাকতে পারে না উঠতি বয়সের মেয়ের!

কিংবা এমনও হতে পারে, কিছুই বলবেন না সুরজিৎদা। ওকে দেখলে ফুটপাথ বদল করবেন। সুধাবৌদির ঝড়ের ঝাপটা বুঝি মঞ্জুকে ঘায়েল করেই নিঃশেষিত হবে! তা কখনো হয়। সুরজিৎদাকেও সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দেবে। কে জানে হয়তো স্বামীকে সামনা-সামনি না পেয়ে সমস্ত চোট গিয়ে পড়েছিলো মঞ্জুর ওপর।

ঘাড়ে মুখে জল দিয়ে নিজের ঘরে ঢুকতে গিয়েই মঞ্জু দাঁড়িয়ে পড়লো।

বৌদি সাবধানে কোণ ঘেঁষে সেতারটা রেখে ঘুরে দাঁড়াতেই চোখা-চোখি হয়ে গেলো।

'কি বৌদি, আজ এর মধ্যেই দাদার অমৃতে অরুচি!'

'তোমার দাদার কথা আর বলো না ভাই, অমন খেয়ালী লোক আর দুটি নেই।'

'কেন, কি হলো?'

'আলাপ শেষ করার আগেই বাজনা থামিয়ে দিলেন। সিনেমার টিকেট কিনে এনেছেন মনেই ছিলো না।'

'তুমিই সুখী বৌদি, বেশ আছো। আর আমাকে এই গরমে বসে বসে পড়া মুখস্থ করতে হবে।'

যাওয়ার মুখে সুমিতা আলতো হাতে মঞ্জুর দুটো গাল টিপে দিলো, 'আফসোস করে কি হবে ভাই, আর কটা' বছর, তারপর তোমায় পায় কে। এমন উর্বশী-সরস্বতী পাঞ্চ করা মেয়ে লোকে লুফে নেবে।'

'যাও ভারি অসভ্য', বৌদির হাতটা মঞ্জু ঠেলে সরিয়ে দিলো। আজ আর ঠাট্টা রসিকতা মোটেই ভালো লাগছে না। তারছেঁড়া সেতারের মতন সব কেমন বেসুরো।

*　　*　　*　　*

স্কুলে পা দিতেই ক্লাসের মেয়েরা ঘিরে ধরলো মঞ্জুকে। সাহিত্যের উৎসাহ সকলের সমান নয়, কিন্তু হৈ-চৈয়ের উন্মাদনায় পিছপা নয় কেউ। 'উন্মেষ' বের হবার দিনটায় অন্তত বাঙলা পিরিয়ডটা হৈ হৈ করে কাটে। মিসেস মণিকা দত্তের চোখা চোখা প্রশ্ন থেকে অব্যাহতি। ধাতুরূপ করতে করতে দুনিয়ার রূপ বদলে যাওয়ার দাখিল।

প্রথমে কথা বললো রত্না দাস। অবশ্য সহ-সম্পাদিকা হিসাবে কথা বলার এক্তিয়ার তারই আছে।

'কই মঞ্জু, 'উন্মেষ' বের করো। মণিকাদিকে দেখিয়ে আনি একবার। বাবাঃ, ক'দিন ধরে যা তাড়া দিচ্ছেন, মানুষের নাওয়া খাওয়া বন্ধ।'

আর যার হোক, রত্নার যে নাওয়া খাওয়া বন্ধ নয়, এটা ওর দিকে একবার নজর বোলালেই বেশ বোঝা যায়। মা শিশুমঙ্গলে থাকায়, খাওয়া দাওয়ার যে বিশেষ অসুবিধা হয়েছে এমন মনে হয় না। পরিপাটি পোষাক। মিশমিশে কালো চুলের ডগায় রঙীন ফিতে থেকে শুরু করে বার্নিশ-চকচকে জুতোর স্ট্র্যাপটি পর্যন্ত কায়দা-দুরস্ত। 'উন্মেষ'এর জন্য যা কিছু ভয় ভাবনা সব সম্পাদিকা মঞ্জুশ্রী রায়ের। রত্না শুধু প্রতি সংখ্যায় একটা করে কবিতা দিয়েই খালাস।

মঞ্জু প্রথমে একটু ইতস্তত: করলো। দ্বিধা আর সংশয়ের ভাব। 'উন্মেষ' অবশ্য ব্যাগের মধ্যে সে এনেছে, কিন্তু মলাটের চেহারা দেখলে সামনে ভীড় করে দাঁড়ানো মেয়েদের চেহারাই যাবে বদলে। এতদিন আটকে রেখে এই বুঝি করেছেন সুরজিৎদা। চমৎকার!

সুরজিৎদাকে এরা কেউ অবশ্য চেনে না, কিন্তু অচেনাও নয় বিশেষ। মঞ্জুর কাছে এত শুনেছে সুরজিৎদার সম্বন্ধে, তাঁর কথা বলার কায়দা, তুলি ধরার ভঙ্গী। কিন্তু এত চেনা লোক হয়ে এই করলেন সুরজিৎদা! বসন্ত সংখ্যা 'উন্মেষ' বের হবে মৌসুমী মেঘের ধারা বর্ষণের মধ্যে!

মঞ্জু সামলে নিলো। ভীড় ঠেলে এগোতে এগোতে বললো, ‘একটা মানুষের মরণ বাঁচনের কাছে তোমাদের সময়মত পত্রিকা বের হওয়াটাই বড়ো হলো ?’

মরণ বাঁচন। মঞ্জুর থমথমে মুখ-চোখের দিকে চেয়ে মেয়ের দল পিছিয়ে গেলো।

সেই অবসরে নিজের ডেস্কের ওপর ব্যাগটা রাখতে রাখতে মঞ্জু রত্নার দিকে ফিরলো, ‘কাল গিয়েছিলাম সুরজিৎদার ওখানে। চৌকাঠ থেকে পালিয়ে এলাম রত্নাদি। দুজন বড়ো বড়ো ডাক্তার।’ দুচোখ অসম্ভব বড়ো করে মঞ্জু চারদিকে চাইলো।

‘তাই বুঝি’, রত্না মঞ্জুর গা ঘেঁষে বসে পড়লো, ‘তা হলে উপায় ? প্রশান্তদাকে একবার বলে দেখলে হয় !’

প্রশান্ত ! আবছা মঞ্জুর মনে পড়লো। রত্নাদির দূর সম্পর্কের আত্মীয়। রত্নাদির বাড়িতে তাকে দু’ একবার দেখেওছে মঞ্জু। এক মাথা চুলের রাশ। কালো শীর্ণ চেহারা, সারা মুখে ব্রণ আর মেছেতার দাগ। আশ্চর্য, আর্টিস্ট হলেই কি অসুন্দর হতে হয় ? তবু একটা বাঁচোয়া, প্রশান্তর জীবনে সুধাবৌদির এখনও আবির্ভাব হয়নি। সেদিক থেকে অনেকটা নিরঙ্কুশ। মঞ্জুর মতন এমন আচমকা আঘাত পেতে হবে না রত্নাদিকে।

‘দেরি তো হয়েই গেছে, দেখি না হয় কয়েকটা দিন, তারপর খাতাটা এনে প্রশান্ত বাবুকে দিলেই হবে।’

ঘণ্টা পড়ে যাওয়ায় কথাবার্তা আর এগোলো না। প্রথম পিরিয়ডে মিস্ অতসী রায়ের ক্লাস। মেয়েরা আড়ালে বলে বাঘিনী রায়। বিয়াল্লিশ বছর বয়সেও বাঘ জোটাতে না পেরে মেজাজ তিরিক্ষে। সমস্ত চোটটা যায় মেয়েদের ওপর দিয়ে। পান থেকে চুনটুকু খসলেই রক্ষা নেই। মঞ্জু ক্লাসের সেরা মেয়ে। তবুও এ পিরিয়ডটা সেও তটস্থ থাকে। এদিক

ওদিক চাওয়া নয়, খোঁপার কাটা খুলে পড়লেও হাত তোলার সাহস থাকে না। অমনি বিলাসিতা সম্বন্ধে দীর্ঘ প্রাণান্তকর বক্তৃতা শুনতে হবে। প্রাণ তো যাবেই, মনেরও বিশেষ কিছু অবশিষ্ট থাকবে না।

মণিকাদির সঙ্গে দেখা হলো ছুটির পর। লাইব্রেরী রুমে বই বদলাবার জন্যে ঢুকতেই একেবারে মুখোমুখি দেখা।

'রত্নার কাছে সব শুনলাম মঞ্জু। আর্টিস্ট ভদ্রলোক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তোমাদের ম্যাগাজিন বের হতে তো বড্ড দেরী হয়ে যাবে তা হলে। এর পর আবার পরীক্ষার হুড়োহুড়ি পড়বে। ম্যাগাজিনের ব্যাপারে তখন হয়তো কারুর তেমন উৎসাহ থাকবে না, এমন কি সম্পাদিকারও নয়।' কথার শেষে মণিকাদি মুখ টিপে হাসলেন।

'কি করি বলুন তো?' মঞ্জুর গলায় ডুবন্ত মানুষের কাকুতি। অসুস্থ একটা মানুষের কাছ থেকে ম্যাগাজিন উদ্ধারই নয়, নিজের সম্মান পুনরুদ্ধারের প্রশ্নও যেন জড়িত রয়েছে।

'আমি বলি কি', মণিকাদি উপদেশ দেওয়ার ভঙ্গীতে বললেন, 'আজকাল ছবিটবি আঁকা একেবারে উঠে গেছে। তা ছাড়া আবার কোন্ আর্টিস্টের কাছে ঘোরাঘুরি করবে। হাতে লেখা পত্রিকার মলাটের ছবি আঁকতে আর্টিস্টদের চিরকালের নিরুৎসাহতা। ওরা তো জানে ছবি বিশেষ একটা স্কুলের কয়েকটি ক্লাসের মেয়েদের হাতেই ঘোরাফেরা করবে শুধু, দু' রঙে ছাপা হয়ে প্রকাশকদের শো-কেসে সাজানো থাকবে না। তার চেয়ে এক কাজ করো। চাইনিজ ইঙ্ক দিয়ে পত্রিকার নামটা তোমরাই কেউ বড়ো বড়ো করে লিখে দাও মলাটে। তোমার হাতের লেখাও তো সুন্দর, কিংবা সুরভিকে দিয়েও লেখাতে পারো। সুরভি সিংহ।' .

মণিকাদির বলার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর চোখের সামনে জ্বল জ্বল করে উঠলো মলাটের ছবিটা। কালো কালিতে শুধু পত্রিকার নামটাই নয়, সম্পাদিকা হিসাবে ওর নামটাও থাকবে তলায়। গাঢ় কালো রংয়ের আঁচড়। অনেকটা ওর কলঙ্কের ইতিহাসের মতন। সুরভি কেন মঞ্জুই পারবে লিখতে। অপমানের জমানো কালি দু হাতে অঞ্জলি ভরে নিয়ে নিজের নামের ওপর লেপে দেবে। কম কালো হবে না তাতে।

কিন্তু এসব মঞ্জু কিছুই বললো না মণিকাদিকে। বই বাছতে বাছতে ঘাড় ফিরিয়ে কেবল বললো, 'দেখি তাই করতে হবে। সুরজিৎ-দার বাড়ি থেকে কালই ম্যাগাজিনটা ফেরৎ নিয়ে আসবো।'

*　　*　　*　　*

নিজের মনের সঙ্গে কতকটা বোঝাপড়া করতে হয়েছে সারাটা দিন, সেটা মঞ্জু বুঝতে পারলো স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময়। পরিশ্রান্ত দুটো পা টেনে টেনে শম্বুক গতিতে রাস্তা মাপতে মাপতে চললো। সঙ্গের মেয়েদের কথার উত্তর কি দিলো, আর কি দিলো না, নিজেরই খেয়াল নেই। সবাই যেন ষড়যন্ত্র করেছে ওর বিরুদ্ধে। মলাটের ছবিটা উপলক্ষ্য, আসল লক্ষ্য মঞ্জু নিজে। মানুষটার অসুখ তো ম্যাগাজিনটা ফিরিয়ে আনতে কি হয়েছিলো!···নাকি সুরজিৎদা ছাড়া আর কোন আর্টিস্টের ছবি পছন্দ নয় মঞ্জুর। শুধু ছবিটাই নয়, তুলি দিয়ে মঞ্জুর নামটাও তিনি আঁকেন, সেই জন্যই কি! তবে, তবে, সুধাবৌদির দোষটা কোথায়? বলবার ধরণটাই না হয় একটু উগ্র, কিন্তু বলার কথাগুলো তো একই। মণিকাদি, রত্নাদি, পাশে বসা আরতি সবাই তো বলেছে এক সুরে!

সময় বুঝে সদানন্দ রোডটাও যেন দূরে সরে গেছে। অন্য দিন এতক্ষণে কখন পৌঁছে যেতো বাড়িতে। আর কি উৎকট গরমই পড়েছে। ঘাড়ের খাঁজে, হাতের চেটোয়, কপালের দুপাশে চটচটে ভাব। বাড়ি

গিয়েই আগে গা ধুয়ে ফেলতে হবে।…শুধু শরীরের গ্লানিই নয়, মনেরও গ্লানি যদি মুছে ফেলা যায় সেই সঙ্গে।

সিঁড়িতে পা দিয়েই কথাটা মঞ্জুর মনে পড়ে গেলো। কাল রবিবার। পুরো একটা দিন নিশ্চিন্ত। ক্লাসের মেয়েদের মুখোমুখি দাঁড়াবার কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু মানুষের জীবনে সব দিনই তো আর রবিবার নয়। তারপরে সোমবারও আসে। মুখ লুকোনো অন্ধকার থেকে চোখ ঝলসানো আলোর মেলা। সুরজিৎদার আঁচড় কাটা অর্ধেক আঁকা ছবিটা নিয়ে সারা ক্লাসে হাসাহাসির অন্ত থাকবে না। পত্রিকার মলাটেই তো শুধু নয়, পেন্সিল দিয়ে সুরজিৎদা আঁকিবুকি কেটেছেন মঞ্জুর সারাটা মুখে।

*　　　*　　　*　　　*

রাত্রে শুয়ে শুয়ে কথাটা মঞ্জুর আচমকা মনে হলো। একি করেছে সে! সুধাবৌদির অভিযোগের কোন উত্তর না দিয়ে মাথা নিচু করে চলে আসা মানেই তো অভিযোগকে স্বীকার করা। সুরজিৎদার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার যে কুৎসিত অর্থ সুধাবৌদি করেছেন সেটাকেই তো মেনে নিয়েছে মঞ্জু। লজ্জায়, বেদনায় ওর মুখচোখের আরক্তিমভাব হাতেনাতে ধরা পড়ার জন্য—এটাই সুধাবৌদি মনে করবেন। আবার ফিরে যেতে হবে সুরজিৎদার কাছে। সুধাবৌদির সেদিনের প্রত্যেকটি কথার উত্তর দিতে হবে। দাদার বন্ধু, বয়সে দাদার চেয়েও বড়ো, ছেলেমেয়ের বাপ। ছি, ছি, এ বয়সের একটা মানুষকে জড়িয়ে অপবাদ দেওয়ার এ কি হীন প্রচেষ্টা।

মন ঠিক করে ফেললো মঞ্জু। যেন কিছুই হয়নি, ঠিক এমনিভাবে আবার যাবে হরিশ চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট ধরে। ম্যাগাজিনটা হাতে করে সুরজিৎদার ঘরে গিয়ে ঢুকবে। মাঝপথে যদি সুধাবৌদির সঙ্গে দেখ

হয়ে যায়, ক্ষতি কি! মঞ্জু আলতো হেসে বলবে, 'আঁপনি খাতা ফেরৎ দিলে হবে কি বৌদি, আমি আবার নিয়ে এসেছি ব'য়ে। মলাটের ছবি না এঁকে সুরজিৎদার নিস্তার নেই। বসন্তের ছবি। রঙীন লতাপাতা আর ফুলের স্তবকে ভরা।'

সুধাবৌদির চোয়াল উঁচু গাল, হাড়জিরজির কণ্ঠা, শিরাবহুল প্রকোষ্ঠে ক্ষয়ে যাওয়া শাঁখার দিকে নজর রেখে পরিপূর্ণ বসন্তের কথা বলতে ভারি ভালো লাগবে মঞ্জুর। ভাঁটার কম জলে পা গুটিয়ে বসে থাকা মাঝিকে যেন জোয়ারের আশ্বাস।

সুরজিৎদার সঙ্গে দেওয়া নেওয়া সম্পর্ক যদি কিছু গড়ে উঠেই থাকে তো সে কেবল এই ছবি দেওয়া নেওয়া, আর কিছু নয়। এই সহজ সত্যটা বোঝাতে মঞ্জুর একটুও দেরী হবে না।

পরিপূর্ণ শান্তিতে মঞ্জু চোখ বুজলো।

* * * *

ভোর ভোর উঠেই মঞ্জু স্নান সেরে নিলো। এই ভালো, নয়তো তেতে পুড়ে এসে গায়ে জল ঢালতেও যেন বিশ্রী লাগে। ঝিম ঝিম করে কপালের দুটো পাশ। দিন দিন রোদের তাপ বেড়ে উঠছে। বাইরে বেরোনোই দায়। আকাশনীল শাড়িটার ওপর হাত রেখে কিছুক্ষণ কি ভাবলো মঞ্জু। না থাক্, শাড়িটা বদলানোই ভালো, অনেকটা যাত্রাবদলের সামিল। বেছে বেছে ঘোর লাল রঙের শাড়ি পরে নিলো। লাল জমি, আর কালো পাড়। চড়া মনের পর্দার সঙ্গে মিলিয়ে চড়া রংয়ের শাড়ি। চিরুণি দিয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে কি ভেবে কপালের মাঝখানে ছোট্ট করে সিঁদুরের টিপ পরলো একটা। স্নো ঘষার পর, পাউডারের পাপটা আলতো বুলালো। সাজ-পোষাক শেষ, এবারে মনটাকে একটু তৈরী করে নিতে পারলেই হয়।

রবিবারের দিন সুধাবৌদির থাকার কথা। অফিসের বালাই নেই।

কাজেই এমন এক দিনেই মঞ্জুর যাওয়া ঠিক হবে। কথা আজ তো আর শুধু সুরজিৎদার সঙ্গেই নয়, সুধাবৌদির সঙ্গেও। সুরজিৎদাকে দিয়ে ছবিটা আঁকিয়ে নিতে হবে আর সুধাবৌদিকে দিয়ে ঘষে ঘষে মুছে ফেলতে হবে সেদিনের ছবিটা। আঁচলের খুঁট আঙুলে জড়িয়ে সেদিনের প্রত্যেকটি আঁচড় তুলে ফেলতে হবে। মঞ্জুর সারা গায়ে কোথাও একটু দাগও না লেগে থাকে। শরীরে তো নয়ই, মনেও নয়।

চৌকাঠ বরাবর যেতেই সরোজিনী এসে দাঁড়ালেন, 'ধন্যি মেয়ে তুই মঞ্জু। ছুটির দিনও কি তোর হাতপায়ের একটু কামাই নেই!'

'এই যাবো আর আসবো মা', স্যাণ্ডেলে পা গলাতে গলাতে মঞ্জু উত্তর দিলো।

'তোর কথা তো! একবার বাড়ি থেকে বেরোলে তোর বাড়ির কথা কি আর মনে থাকে।'

'রাস্তায় বেরোলেই বাড়ির কথা বড্ড মনে পড়ে মা।—সত্যি!' মঞ্জু ঠোঁট মুচকে হাসলো।

'যা ইচ্ছে করো বাছা, অসুখবিসুখ হলে আমায় বলতে এসো না।'

মার কথা শেষ হবার আগেই মঞ্জু রাস্তায় নেমে পড়েছে। হাতের পত্রিকাটা খবরের কাগজে মোড়া। পথচলতি লোকের নজর এড়াবার জন্য। একহাতে কাচবসানো জয়পুরী বটুয়াটা শক্ত হাতে চেপে ধরে মঞ্জু জোর পায়ে ট্রাম লাইনের সামনে এসে দাঁড়ালো।

* * * *

আজ আর কড়া নাড়বার দরকার হলো না। দরজা ভেজানোই ছিলো। হাত রাখতেই খুলে গেলো। এদিক ওদিক চেয়ে মঞ্জু ভিতরের উঠানে পা রাখলো। চৌবাচ্চার পাশ খালি। কালীর মারও দেখা নেই। সব নিস্তব্ধ। ছোট ছেলেমেয়েগুলোরও সাড়া শব্দ নেই। সেকি..

আচমকা সুরজিৎদারা বাসা-ই বদল করলেন নাকি! আর একটু এগিয়েই কালীর মার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। এদিকের ঘরটা ঝাঁট দেওয়া শেষ করে সবে শিকলটা তুলে দিচ্ছিলো, এমন সময় মঞ্জু এসে পিছনে দাঁড়ালো।

পায়ের শব্দে পিছন ফিরে চাইতেই মঞ্জু জিজ্ঞেস করলো, 'বাসায় কেউ নেই কালীর মা?'

কালীর মার গলার আওয়াজ বেশ ভার ভার। মাস মাস ঠিক মাইনে পায় কিনা কে জানে! ঘরদোরের ছিরি দেখেই গেরস্তর অবস্থা মালুম হয়।

'ওই যে ঐ ঘরে।' উত্তর দিয়ে কালীর মা আর দাঁড়ালো না। থর থর করে উঠানে গিয়ে নামলো।

দরজার কাছে গিয়েই মঞ্জু দাঁড়িয়ে পড়লো। ছড়ানো ছিটানো জিনিসপত্রের মাঝখানে টুল পেতে সুরজিৎদা একমনে ছবি এঁকে চলেছেন। ধারে কাছে কেউ নেই।

শাড়ির খসখসানিতে সম্বিত হলো না সুরজিৎদার, তাই হাত দুটো মুখের কাছে এনে মঞ্জু কাশির আওয়াজ করলো। কৃত্রিম বলেই শব্দটা বেশ জোর, আর তাতে কাজও হলো। সুরজিৎদা ফিরে চাইলেন।

'আরে এসো, এসো, তোমার কথাই ভাবছিলাম।'

মঞ্জু কোন উত্তর দিলো না। ওর কথা কতো যে সুরজিৎদা ভাবেন, তা জানা আছে। সামনাসামনি দেখা হলেই যত দরদ। নয়তো দিনের পর দিন ম্যাগাজিনটা ওই অবস্থায় পারতেন কিনা ফেলে রাখতে।

'বৌদি নেই?' মঞ্জু ঘরের ভিতর গিয়ে ঢুকলো।

'না, তাঁর অফিসের কোন্ বান্ধবীর বাড়ি বুঝি নিমন্ত্রণ। ছেলেমেয়ে নিয়ে ভোর ভোর রওনা হয়ে গেছেন। ভবানীপুর থেকে চন্দননগর

রাস্তাটাও অবশ্য কম নয়।' হাতলভাঙা একটা চেয়ার এগিয়ে দিতে দিতে সুরজিৎদা বললেন।

বৌদি নেই, সেকি! সাত তাড়াতাড়ি ছুটির দিন ছুটতে ছুটতে আসাই বৃথা হলো। দুজনকে একসঙ্গে না পেলে সেদিনের কথাগুলোর উত্তরই বা দেব কি করে!

'তারপর কি সংবাদ বলো?'

'সংবাদ আর কি! আমার 'উন্মেষ'এর মলাটটা আর এঁকে দিলেন না আপনি। গুমোট গরমে বসন্ত-সংখ্যা বের করার কোন মানে হয়?'

'উঁহু, কোন মানে হয় না', মঞ্জুর হাত থেকে ম্যাগাজিনটা টেনে নিতে নিতে সুরজিৎদা হাসতে হাসতেই বললেন কথাগুলো।

টেবিলের ওপর ম্যাগাজিনটা রাখবার সঙ্গে সঙ্গেই মঞ্জু মুখ খুললো এভাবে চুপচাপ থাকাটা ঠিক নয়। সুধা বৌদি নেই তো সুরজিৎদা রয়েছেন। একজনকে বললেই আর একজনের শোনা হবে। তা নয় তো অপমান হজম ক'রে চুপচাপ ব'সে থাকলে ওর সম্বন্ধে বিশ্রী ধারণাই একটা ক'রে বসবে। কথাটা যখন একবার উঠেছে, তখন তার একটা নিষ্পত্তি হওয়াই দরকার। চৌকির তলায় জীবন্ত সাপ রেখে শোয়ার কোন মানে হয় না।

'এবার থেকে আপনার কাছে আর ছবি আঁকাতে আসবো না সুরজিৎদা'—আশ্চর্য, গলায় কোন জড়তা নেই। প্রত্যেকটি অক্ষর স্পষ্ট। মঞ্জুর গলা একটুও কাঁপছে না।

আলাদা একটা বাটিতে সুরজিৎদা রং গুলছিলেন। ঠিক কতখানি গাঢ় সবুজ রং দিলে গাছের পাতায় বসন্তের ছোঁয়াচ লাগানো যায়, তারই পরীক্ষা। মুখ তুলে বললেন, 'কেন, আমার অপরাধ?'

অপরাধ? সুধা বৌদি স্বামীকে একটি কথাও বুঝি বলেন নি! না কি মঞ্জুর মুখ থেকেই সুরজিৎদা সবটুকু শুনতে চান!

অবশ্য বলবার জন্য মঞ্জু প্রস্তুত হয়েই এসেছে। কোন কথা লুকোবে না। সত্যিই যদি না-ই কিছু জেনে থাকেন সুরজিৎদা, তো জানা তাঁর একান্ত প্রয়োজন। ইজ্জৎ শুধু সুধাবৌদি আর তাঁর স্বামীর-ই নেই, মঞ্জুরও আছে।

সামান্য ইতস্ততঃ ভাব, কিন্তু সেটা মঞ্জু সহজেই কাটিয়ে উঠলো। দেরাজের পাল্লার দিকে চেয়ে সব কথা বললো। শুধু কথাই নয়, সেদিনের সুধা বৌদির গলার ঝাঁজটুকুও সঞ্চারিত করলো কথাগুলোর মধ্যে। আভাসে বুঝতে পারলো সব শুনে সুরজিৎদা তেতে লাল হয়ে উঠবেন। সুধাবৌদির রোজগারে সংসার চলছে তাই ব'লে এমন এলোপাথাড়ি কথা মানুষজনকে নির্বিচারে বলে যাবে কোন্ সাহসে! ছি ছি, মঞ্জুর দাদার কাছে সুরজিৎ মুখ দেখাবে কেমন করে।

সুরজিৎদার দিকে চোখ ফিরিয়েই কিন্তু মঞ্জুর ভুল ভাঙলো। রাগ নয়, সামান্য উত্তেজনা নয়, সুরজিৎদা একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন মঞ্জুর দিকে। দু'টি চোখে বিভোল দৃষ্টি।

'মঞ্জু', সুরজিৎদা অস্ফুট গলায় উচ্চারণ করলেন।

এতক্ষণ পরে সত্যি সত্যি ভয় পেলো মঞ্জু। সুরজিৎদার চোখে এমন দৃষ্টি সে এর আগে কোনদিন দেখেনি। এ দৃষ্টির অর্থ সহজাত বুদ্ধি দিয়ে ঠিক বুঝতে পারলো। এ দৃষ্টির একটা অর্থই হয়।

'তোমার সুধা বৌদি ঠিকই বলেছেন মঞ্জু।···তবে তুমি আমার অপেক্ষায় থাকো কিনা জানি না, কিন্তু আমি সত্যিই তোমার অপেক্ষায় থাকি। আমার চেয়ে অগোছালো আমার সংসার। সংসারের কর্ত্রী মুঠো ভরে অর্থ হয়তো আনছে কিন্তু তার চেয়েও বেশী করে আনছে অনর্থ আর অশান্তি।···তুমি বড় হয়েছ মঞ্জু, সব কিছুই বোঝ। যে কথা

কোনদিন মুখ ফুটে আমি তোমায় বলতে পারতাম না, সে কথাই সুধাবৌদি তোমায় বলে দিয়েছেন।···বলো মঞ্জু আমার এ আশা দুরাশা নয়!'

অনেক দূর থেকে ভেসে আসা অস্পষ্ট কোলাহলের মতন মনে হ'ল প্রথমে, দূরাগত সমুদ্র কল্লোলের সামিল, কথাগুলোর কিছুটা বুঝলো মঞ্জু, কিছুটা নয়, কিন্তু সুরজিৎদা হাত দিয়ে ওর একটা হাত চেপে ধরতেই মঞ্জু চমকে উঠলো।···হাত নয়, শঙ্খচূড় সাপ একটা পাক দিয়ে ধরেছে ওর সর্ব্বশরীর এমন মনে হ'ল, বেষ্টন ক'রে ক্রমে ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সর্ব্বনাশের অতলে।···আর একটু পরে যেন চেতনাও বিলুপ্ত হবে। তখন!···

কথাটা মনে হ'তেই মঞ্জু এক ঝাপ্‌টায় নিজেকে মুক্ত ক'রে নিলো। খুব আস্তে দুলছে ঘরটা। কাঁচভাঙ্গা দেরাজ, ইতস্ততঃ ছড়ানো ছবির রাশ, জানালার কবাট, এমন কি সুরজিৎদার শীর্ণ কুৎসিত মুখটাও।

মঞ্জুর ঝাপ্‌টায় সুরজিতের হাত থেকে তুলিটা ছিটকে পড়লো একেবারে মঞ্জুর গায়ের ওপর। আর তিলমাত্র দেরী নয়। মনে হচ্ছে, উঠে দাঁড়ালেই মঞ্জুও ঠিক অমনিভাবে ছিটকে পড়ে যাবে এক রাশ ধুলোর ওপরে।

দু'টো হাত মুঠো ক'রে মঞ্জু উঠে পড়লো। টেবিলের ওপর রাখা ম্যাগাজিনটা হাতে নিয়ে টলতে টলতে উঠানে নামলো। সামনের খোলা দরজাটাও কাঁপছে থর থর করে। অথচ কোথাও ছিটে ফোঁটা বাতাস নেই।

খেয়াল হলো মঞ্জুর হরিশ চ্যাটার্জির স্ট্রীটের মোড়ে এসে। চলন্ত একটা ট্যাক্সিকে হাত নেড়ে থামিয়ে দিলো।···ভীষণভাবে কাঁপছে সারা শরীর। এগোতে গেলে রাস্তার ওপরেই হয়তো পড়ে যাবে টাল খেয়ে।

মঞ্জুর চেতনা ফিরে এলো। বড় হওয়ার চেতনা। এতদিন ঘরের আয়নায় যার আভাসও পায়নি মঞ্জু, আজ সুরজিৎদার লালসা-মেদুর দু'টি চোখের দৃষ্টিতে বাড়ন্ত বয়সের সে রূপটা ধরা পড়ে গেছে।

ডান হাতে ধরা 'উন্মেষ' পত্রিকার দিকে মঞ্জু নজর ফেরালো প্রথমে, তারপর দৃষ্টি দিলো নিজের শরীরের দিকে।

হঠাৎ চমকে উঠলো। আশ্চর্য্য যে রঙ সুরজিৎদা ছবিতে কোথাও দেননি, সে রঙ তিনি ছড়িয়েছেন মঞ্জুর শাড়ীর ভাঁজে ভাঁজে, সুগৌর বাহুমূলে, কিছুটা আরক্তিম গণ্ডেও!…

চেতনা ত নয় জ্বর। কান, মাথা, চোখ যেন দুঃসহ উত্তাপে ঝাঁ ঝাঁ করছে। তার ওপর এই সবুজ কালির কলঙ্ক যেন মঞ্জুশ্রীকে দুনিয়ার সামনে বিপর্যস্ত করতে দৃঢ়সংকল্প। এ অবস্থায় মঞ্জু কি করে বাড়ি ঢুকবে? মা, বৌদি, দাদার সামনে দাঁড়িয়ে সব কথা খুলে বলবে? বলতে পারবে মঞ্জু! এ প্রশ্নের জবাব নিজেকে দিতে পারে না সে। মনে মনে বেশ বুঝতে পারে, সুরজিতের উন্মত্ত আচরণের পিছনে মঞ্জুর বিন্দুমাত্র সমর্থন ছিল না, বরং এখন সুরজিৎকে বিশ্রী ঘৃণ্য একটা কী যেন কি বলে মনে হচ্ছে। তবু এই লজ্জাকর ঘটনার কথাটা নিজে থেকে আর কারুর কাছে প্রকাশ করা মঞ্জুর পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়।

ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল ল্যান্সডাউন রোড ধরে চলতে। পদ্মপুকুরে রত্নার বাড়ি। রত্না দাসের মা এখন হাসপাতালে, বাড়িতে ছোট ছোট ভাইবোন আর ওর বাবা ছাড়া কেউ নেই। অতএব রত্না দাসের বাড়িতে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে, বেশবাস যথাসম্ভব ভব্য করে নিয়ে মঞ্জু বাড়ি ফিরবে। এ ছাড়া কোনো পন্থাই ওর মাথায় এলো না।

ট্যাক্সিখানা গলির মোড়ে ছেড়ে দিল মঞ্জু। সামান্য এই পথটুকু কোনোরকমে পার হয়ে যাবে, তা ছাড়া এ রাস্তায় লোকজন চলাচলও

কম। এইটুকু সময় ট্যাক্সিতে বসে বসে মঞ্জু অনেক কথাই ভেবেছে। কারণ ও জানে, লেখাপড়ার ব্যাপারে রত্না দাস ভোঁতা হলেও অন্যান্য দিকে তার নজর খুব তীক্ষ্ণ। রত্নার দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। প্রথম ত মঞ্জুকে দেখেই রত্না প্রশ্ন করবে—'হঠাৎ কি মনে করে ভাই খারাপ মেয়ের বাড়িতে!' তারপর মঞ্জুর চেহারার দিকে চোখ পড়লে আর রক্ষা থাকবে না—যা নয় তাই বলে রসিকতা করতে রত্নার এতটুকু বাধবে না। এইসব অনুমান করে নিয়েই মঞ্জু নিজের জবাব তৈরী করেছে।···সুরজিতের অসুখ কমেনি, দু-চারদিনের মধ্যে কমবার আশাও নেই। আজ সকালে সেখানে গিয়েছিল মঞ্জু। অসুস্থ শিল্পীর কি করে বিশ্বাস হয়েছিল যে মঞ্জু নিজেই একটু চেষ্টা করলে 'উন্মেষ'-এর কভারের ছবিটা এঁকে ফেলতে পারবে। রীতিমত তর্কযুদ্ধের অবতারণা হয় এই নিয়ে। ওদিকে সুরজিতের স্ত্রী মঞ্জুকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বোঝালেন,—'এখন তোমার দাদার মাথাটা ঠিক নেই। যা ঝোঁক ধরেন সবই মেনে নিচ্ছি আমরা, নইলে মাথাগরম হয়ে যায়, আর তারপরই অজ্ঞান হয়ে পড়েন।' অতএব মঞ্জুকে তুলি রং নিয়ে বসতেই হল। এমন সময়ে সুরজিতের ছেলে তোতা এসে—'আমা বাবা তুলি দে, লং দে—এঁ্যা-এঁ্যা!' ব্যস্, ছেলে ত নয়, গোরাপল্টন—মঞ্জুর হাত থেকে হ্যাঁচ্‌কা টানে তুলি কেড়ে নিল, আর সেই সঙ্গে এই কাণ্ড।···কাহিনীটা মন্দ দাঁড়ায় নি। বেশ বিশ্বাসযোগ্য চেহারা নিয়েছে।—অতএব আর 'উন্মেষ' ফেলে রাখা চলে না। আজই এর একটা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ওদিকে মণিকাদি কড়া তাগাদা দিয়েছেন। এখন রত্না ছাড়া গতি হবার উপায় অন্ততঃ মঞ্জু ত ভাবতে পারছে না। রত্নার সেই প্রশান্তদাকেই ধরতে হয় কভার আঁকার জন্য। মণিকাদি যে বলেছেন বিনা ছবির মলাট দিয়েই ম্যাগাজিন বেরুতে পারে, সেটা মঞ্জুর মনঃপুত নয়—কেমন যেন ধর্মপুস্তক গোছের গম্ভীর

চেহারা দাঁড়ায়,—তাতে আর যাই .াক ম্যাগাজিনের মাধুর্য থাকে না। এত কথার পর রত্না দাস কিছুতেই মঞ্জুশ্রী রায়ের কাহিনী-কুশলতাকে ভেদ করে আসল ঘটনায় দুরবীণ হানতে পারবে না, যতই কড়া ওর নজর হোক না কেন!

রত্নাদের বাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো মঞ্জু। রাস্তার ওপর একটুখানি রক, তারপরই ঘরের জান্‌লা, মেরুন রঙের পুরনো শাড়ীকে সেলাই করে পর্দা বানানো হয়েছে। আশ্চর্য, এই শাড়ীটা পরলে রত্নাকে কেমন মানাতো, হঠাৎ সে কথা মনে পড়ে গেল মঞ্জুর। কিন্তু পর্দা হিসেবেও বেমানান্ হয়নি ত! সামনের দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। মঞ্জু খুব অবাক করে দেবে রত্নাকে, কড়া নাড়বে না। আস্তে আস্তে রকের ওপর দিয়ে গিয়ে জানালার পর্দাটি সরিয়ে খুব জোরে হেসে উঠবে—নিশ্চয় রত্না এখন রেডিও খুলে 'সঙ্গীত শিক্ষার আসর' শুনছে আর গলা মেলাতে চেষ্টা করছে। আহা বেচারীর গান গাইবার এত শখ কিন্তু বিধাতা বিরূপ। তবুও রত্নার বিশ্বাস গান নাকি নেহাত খারাপ গায় না ও।

জানালার কাছে এসে আস্তে আস্তে পর্দাটি সরিয়ে যা দেখল তাতে মঞ্জু নিশ্চল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল। এ কী—স্বপ্ন দেখছে না ত! কিছুক্ষণ আগে ট্যাক্সিতে উঠবার পূর্বে ওর শরীরের যে অবস্থা হয়েছিল, ঠিক সেইরকম অস্থিমজ্জাসহ শিহরণ যেন ওকে অবশ করে ফেলেছে।

মঞ্জু যেন সম্বিত হারিয়েছে—ঘরের ভেতরে, জানালার দিকে পিছন ফিরে রত্না বসে আর তার হাতের মুঠোয় ধরা একটি শুভ্র লোমশ হাত—আলমারীর আড়াল পড়েছে বলে শুভ্র হাতের কনুই পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে—বাকীটা এখান থেকে অদৃশ্য।

রেডিওতে গান শেখানো চলেছে—উঁ হুঁ হোলো না—হোলো না—এইখানটা আবার আর একবার ধরুন।

নিজের কণ্ঠস্বরকে মঞ্জু জোর ক'রে রুদ্ধ রাখে। মঞ্জুর হাত-পা অবশ হয়ে আসছে—তার চেয়েও বেশি অবশ হয়ে পড়েছে ওর মন। নইলে এইভাবে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় চোখের সামনে আর কারুর প্রণয়াভিসার দেখবার বাসনা ওর স্বভাবে নেই। বিশেষ করে, সদ্য-সদ্য যে অপঘাতের সংকট কাটিয়ে এসেছে মঞ্জু তারপর জীবনে এমন কদর্য আবহাওয়াতে স্বেচ্ছায় পা বাড়াবে না, এ সংকল্প কতকটা নিজের অজ্ঞাতেই গড়ে উঠেছিল ওর অন্তরে।

তবু এক-একটা শূন্য ভবচেতনাহীন মুহূর্তে মানুষ কেমন যেন দেহ আর মনের সাযুজ্য হারিয়ে ফেলে—এই হতচকিত ক্ষণে তার কাছে ভালোয় মন্দে কিছুমাত্র প্রভেদবোধও থাকে না। মঞ্জুর এখন সেই অবস্থা।

ও দেখল রত্না দাসের পিঠের বেণী পাশে লুটিয়ে পড়ে দুলছে।

সহসা মুখ ঘুরিয়ে রত্না চমকে উঠল মঞ্জুকে দেখে।

—'কে, কে ওখানে?'

রত্নার প্রশ্নে মঞ্জুও কম চমকে ওঠে নি—হঠাৎ যেন ওর সমগ্র সচেতনতা ভিড় করে এসে ধাক্কা দিয়ে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইল। ছি ছি, এ কী করছিল মঞ্জু এখানে দাঁড়িয়ে! এখন মুখ দেখাবে কি ক'রে রত্নাকে। সংকোচে, লজ্জায় মরমে মরে গেল মঞ্জু।

—'ও, মঞ্জু! তবু ভালো, আমি ত খুব ভয় পেয়ে—আয়, আয় ভেতরে আয়।' রীতিমত সপ্রতিভ ভাবেই রত্না দাস উঠে এসে দরজা খুলে দিল। মঞ্জু তখনও জানালার সামনে থেকে দরজায় এসে পৌছয় নি, পা যেন ওর নড়তে ভুলে গেছে।…না, আর এখানে এক দণ্ডও থাকবে না মঞ্জু। সোজা বাড়ি চলে যাবে—তারপর নিজের ঘরে ঢুকে, দুনিয়ার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেবে। এ পৃথিবীর কোথাও

আর মুখ দেখাতে পারবে না মঞ্জু। ছি ছি ছি···মঞ্জুর চোখের সামনে অসংখ্য অজস্র তিরস্কার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ঘুরে মরছে।

রত্না তরল হাসিতে প্রভাতী রোদের জৌলুস ছড়িয়ে বলল—'ভেতরে আয়, অমন ঢঙ ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস কেন রে!'

মঞ্জুর ইচ্ছে করছে কোনো অলৌকিক উপায়ে নিজেকে এইক্ষণে এখান থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে। কিন্তু ততক্ষণে রত্না ওর হাত ধরেছে। সেই হাত! মঞ্জুর গা রী-রী করে, আস্তে আস্তে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে বলল—'এই ইয়ে,···ম্যাগাজিনের মলাট তোমার প্রশান্তদাকে দিয়ে যা হোক একটা করিয়ো, সেই জন্যেই ওটা সঙ্গে করে এসেছি। এটা আজই ব্যবস্থা করা দরকার, বুঝলে!"

রত্না দাস মঞ্জুকে জড়িয়ে ধরে ঘরে আনল—'আচ্ছা সে দেখা যাবে।'

মঞ্জু ঘাড় নীচু ক'রে টেবিলক্লথের সূচীশিল্প দেখতে লাগল।

রত্না উচ্ছলতার জীবন্ত প্রতীক। চট্ ক'রে মঞ্জুর মুখখানা তুলে ধরে বলল—'জানো ললিতদা, এই হচ্ছে আমাদের স্কুলের বেষ্ট জুয়েল মঞ্জুশ্রী রায়।' তারপর কপট তিরস্কারের ভঙ্গীতে মঞ্জুকে বললে—'ছিঃ অমন বেয়াড়াপনা করো না মঞ্জু। শোনো মঞ্জু, ইনি ললিত চৌধুরী—বলতে পারো আমাদের বাংলা দেশের, মানে, তোমার আমার সবারই শ্রদ্ধেয় ছাত্র নেতা।'

মঞ্জুশ্রী যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়ল রত্নার শেষের কথাতে—তারপর অর্ধোন্মীলিত কমলকলির মতো কুণ্ঠিতভাবে বলল—'ও, আপনি! মাপ করবেন, চিনতে পারি নি ব'লে।—এর আগেও দেখেছি আপনাকে, সেই সেবার যে বিদ্যার্থীমণ্ডলে ছাত্রজীবনের আদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলেন! সুন্দর বক্তৃতা।'

ললিত চৌধুরীর মুখে তেমন পরিতৃপ্তির হাসি ফুটল না প্রশংসা

শুনে, কি জানি তিনি যেন এখনও সঙ্কোচ কাটাতে পারেন নি। তবু একটু হাসলেন, বল্‌লেন—'আপনার ভালো লেগেছিল ?'

'হ্যাঁ!' বলে মঞ্জু টেবিলের ওপর ম্যাগাজিনের খাতাখানা রেখে ভেতরের বাথরুমে অন্তর্হিত হ'ল—সবেমাত্র আয়নার দিকে নজর পড়তেই ওর খেয়াল হয়েছে নিজের চেহারার বিচিত্র সজ্জার কথাটা।

রত্না বেশ চেঁচিয়ে বলল—'মঞ্জু ভাই, একটু জল থাকে যেন, জু-গার্ডেন থেকে ফিরে বাবা স্নান করবেন।'

ললিত বিদায় নেবার ভূমিকা করল।

রত্না বলল—'ধ্যেৎ, এখনই যাবে কী, বাবা ত আসবেন সেই সাড়ে বারোটা একটা, তিন-তিনটে ছেলেমেয়ের হরেক রকম কৈফিয়ৎ সামলে জু দেখানো ত ইয়ার্কি নয়! আর মঞ্জুর জন্যে কিচ্ছু ভেবো না, এখুনি তাড়াচ্ছি ওকে।'

ললিত বলল—'তুমি আচ্ছা ইয়ে হচ্ছ রত্ন। এসব ভালো না, এ সব ইয়ে—'

রত্নার চোখেমুখে অভিমানের মেঘ ঘনিয়ে এসেছে, ও বলল—'বেশ ত যাও না। আমি বারণ করলেই কি তুমি শুনবে? আসারই বা কি দরকার ছিল ?'

ললিত বলল—'তুমি ত জানো রত্না, আমার জীবনটা ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। এর ওপর আমার কোনোই অধিকার নেই। তবু কেন এভাবে তুমি নিজেকে আমার জীবনের সঙ্গে জড়াতে চাও ?—কতবার বলেছি আজও বলছি সামলে নাও, নইলে পাথরে মাথা ঠুকে চোটটুকুই লাভ হবে।'

'সামলাতে আমার বয়ে গেছে।' বেশ জোরে জোরেই বলল রত্না। মঞ্জু বাথরুম থেকে বেরিয়ে শেষ কথাটা শুনতে পেল। ওর মনে হ'ল রত্না যেন মঞ্জুকে শোনাবার জন্যই কথাগুলো বলছে।

ছাত্রনেতা ললিত চৌধুরীর নাম আর আজকের সন্ত পরিচিত এই ব্যক্তির প্রকৃতি—দুই-এ আকাশপাতাল তফাৎ! দূরের শোনা আর কাছের দেখাতে কি এতই পার্থক্য থাকে!

ঘৃণায় মঞ্জুর সর্বাঙ্গ ঘিন্ ঘিন্ করছিল। আশ্চর্য হয়ে ভাবছে মঞ্জু, বাইরের দুনিয়া সম্বন্ধে এতখানি ঔদাস্য রত্নার কি করে সম্ভব! যে কালির দাগ সম্বন্ধে এত আশঙ্কা মঞ্জুর, সেটা রত্নার নজরেই পড়ল না—ছিটোনো কালিরা কি তবে কালিমা নেই! না কি, রত্না নিজেকে নিয়ে এতই ব্যস্ত যে বাইরের কারুর কিছু দেখা ওর কাছে এখন অযথা বাজে কাজ।

এবার মঞ্জু বলল—'আচ্ছা এখন আসি রত্নাদি বেলা হয়ে গেল।'

—'আচ্ছা ভাই। আর একদিন তোকে নেমন্তন্ন করব,—সেদিন দুজনে গল্প করা যাবে এঁ্যা!'

রত্নার কণ্ঠে আশ্চর্য অন্তরঙ্গ সুর। কে জানে মঞ্জু চলে যাওয়ার উদ্যোগেই হয়তো রত্না বেশি খুশি হয়েছে! যাই হোক, তাতে মঞ্জুর এসে যায় না কিছু—আর কোন দিন ভুলেও মঞ্জু এখানে আসবে না। মুখে শুধু বলল—'তা হলে ম্যাগাজিনের ব্যবস্থাটা আজ ক'রো।'

—'আমি কখন কি করি বলো না মঞ্জু। এই ত দেখচো, একলা বাড়ী আগলে বসে আছি। কেবল কাজ আর কাজ—কতো পারি করতে! তাও ললিতদা আজ প্রায় পাঁচ-ছ দিন পরে এলেন, তবু দুটো কথা ক'য়ে বাঁচছি।'—

হঠাৎ ললিতকে খুঁজে না পেয়ে রত্না বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে বেরিয়ে গেল। তারপর ফিরে এসে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বিছানায় দেহ এলিয়ে দিল।—'হলো তো। ললিত চলে গেল। আশ্চর্য মানুষ ভাই! এই এত টান, কতো মিষ্টি কথা!—এমন ভাব দেখায়, যেন রত্নাকে না দেখে থাকতে পারে নি, তাই ছুটে চলে এসেছে। আবার, পলক

ফেলতে না ফেলতে উধাও হয়ে যাবে। আবার সাতদিন কি দশদিনের মধ্যে আমি মাথা খুঁড়ে মরলেও খোঁজ নেবে না। ডাকলে ফিরে তাকাবে না। বুঝতে পারি না ওকে। কী যে চায়! এখন পোড়ারমুখী তুমি জ্বলে পুড়ে মরো।' আপন মনেই বলল রত্না। বিচিত্র মেয়ে এই রত্না দাস। পরক্ষণে মঞ্জুর গলা জড়িয়ে ধরে অশ্রু ছল ছল চোখ মেলে বলল রত্না—'আচ্ছা মঞ্জু তুইই বল্, ভালোবাসা কি খুব খারাপ! খারাপই যদি হবে ত ভালো লাগে কেন। কেন আমি আমি ওকে দেখলে আর সব ভুলে যাই। বল্, বল্, বল্।'…কান্নায় ভেঙে পড়ল রত্না। ওকে দেখে মনে হচ্ছে, এ কান্নার বুঝি শেষ নেই। অথচ কেন এত কান্না—মঞ্জু বোঝে না, বুঝতে ইচ্ছেও হয় না ওর।

হতবাক মঞ্জুশ্রীকে কে যেন জোর ক'রে সমুদ্রের অথৈ জলে টেনে নিয়ে চলেছে। ওর নিজের এতটুকু শক্তি নেই অঙ্গুলি হেলনের। কোন্ অদৃশ্য শক্তি প্রচণ্ড বেগে ওকে নিয়ে চলেছে, থামতে দেবে না। সুধা বৌদি, সুরজিৎদা, রত্না দাস—সবাই এই দিকে ওকে কেন ঠেলে দিচ্ছে মঞ্জু কিছুতেই বুঝতে পারে না।

মঞ্জু কিছুতেই এই ধরণের অভব্যতাকে ভালোবাসা ব'লে ভাবতে পারে না। সুরজিৎদাকে মঞ্জু ভালোবাসতো, শ্রদ্ধা করতো কিন্তু কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল, এখন আর সেই মধ্যবয়স্ক লোলুপদৃষ্টি রূপহীন মানুষটার কথা ভাবতেও ইচ্ছে করে না।—কী আছে এই রকম গা মাথামাখির ভেতরে! এই যে রত্না দাস, এ-ও ত সেই প্রকৃতিরই আর একটি নমুনা। কি ক'রে এই ধরণের আকর্ষণ মানুষের শোভনতা, শালীনতা সব কিছু কেড়ে নিয়ে এক অন্ধ গহ্বরে টেনে নিয়ে যেতে পারে!…মঞ্জুশ্রী বুঝে উঠতে পারে না।

রত্নার বেষ্টনে যেন সাঁড়াশীর শক্তি—মঞ্জু রীতিমত জোর করেই

নিজেকে মুক্ত করে নিল। আস্তে আস্তে বলল—'এবার আমি যাই ভাই। তুই চোখের জল মুছে ফ্যাল।'

রত্না বলল—'তুই রাগ করেছিস মঞ্জু। আমি বড় বাজে হয়ে গেলাম তোর কাছে, তাই না! কিন্তু তা বলে রাগ করবি কেন, ভাই—মিথ্যে কিছু নেই এতে, সব সত্যি। যা সত্যি তাকে লুকিয়ে রেখে সব সময় চলা যায় না। আর তুই আমার বন্ধু, তোর কাছে খোলো হ'লে আর কি! ও যে আজ এমন ভাবে চলে যেতে পারল, এ কী কম দুঃখের!'

মঞ্জু নির্লিপ্তভাবে জবাব দিল—'কই না ত রাগ করি নি। তবে, এসব আমি পছন্দ করি না। অযথা একটা লোককে এতো আস্কারা দেওয়া ত নিজেকে ছোট করা!'

'বুঝেছি তুমি কাল ক্লাসে সবাইকে বলে দেবে! তাতে আমার ঘণ্টা হবে। আহা এমন ভাব দেখালি তুই যেন কিছুই জানিস না। স্যাকামী করিস কেন রে!' রত্না ভ্রূ বাঁকিয়ে আহত স্বরে বলল।

মঞ্জু বলল আস্তে আস্তে—'জানতাম না ঠিকই, কিন্তু এখন যেন বড্ড বেশি জানা হয়ে গেল! তবে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো আমি একথা কাউকে বলব না—এ ভারি নোংরা ব্যাপার।'

রত্না বেশ বিজ্ঞভাবেই বলল—'নোংরাই বলো আর যা-ই বলো এটাই পুরুষ আর মেয়েদের একমাত্র সম্পর্ক। তা বোঝবার বয়স আমাদের হয়েছে!'

—'আমি অন্ততঃ বিশ্বাস করি না তা।'

—'আজ করো না তবে করবে—দুদিন আগে নয় দুদিন পরে। আমিও জানতাম না এসব কিছু, কিন্তু একজন পুরুষই আমাকে শিখিয়েছে।'

মঞ্জু ব্যস্ত হয়ে বললে—'আমি বাড়ি যাই ভাই, মা হয়তো ভাবছেন। হ্যাঁ, তুমি তাহলে প্রশান্তবাবুকে দিয়ে কভারটা আজই করিয়ে ফেলো।'

—'যদি বিকেলের দিকে সময় পাই—কিম্বা যদি উনি এসে পড়েন তাহলে আজ দিয়ে দেবো, নইলে একটু দেরী হবে!'

যা হয় হোক। মঞ্জু আর ভাবতে পারে না। আজকের দিনটা যেন ওকে পাগল করে দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

কাজের কথা বলতে পেরে মঞ্জু একটু উৎসাহিত বোধ করে। 'যা পারো ক'রো। সহ-সম্পাদিকা হিসেবে ত তোমারও দায়িত্ব কিছু রয়েছে! আমি ভাবছি এসব ছেড়ে দেবো, আর ভালো লাগে না।" ব'লে মঞ্জু দরজার দিকে পা বাড়ালো।

রত্না বলল—'আমার সম্বন্ধে একটা মন্দ ধারণা নিয়ে যাচ্ছিস মঞ্জু, কিন্তু তুই বুঝবি না ভাই।—গরীবের ঘরে বড় মেয়ে হওয়ার কি যে জ্বালা—' ওর কণ্ঠস্বর অসহায় আকুলতায় গাঢ় হয়ে এল। মঞ্জু একবার ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা নত করল। হয়তো একটা উদ্যত দীর্ঘশ্বাস সামলালো, রত্নার অবস্থা ঠিক না বুঝলেও ওর জন্য বেদনা অনুভব করে মঞ্জুশ্রী।

বাস রাস্তার কাছাকাছি এসে মঞ্জু বুঝল রোদটা এর মধ্যে বেশ কড়া হয়ে উঠেছে। আসন্ন গ্রীষ্মের প্রখরতার প্রথম পর্ব।

—'মিস্ রায়!' পিছন দিক থেকে কে যেন ডাকল।

একটু অবাক হ'ল মঞ্জু, এ পাড়ায় কে আবার ওকে চিনে বসে আছে। হয়ত অন্য কাউকে হবে—। দাঁড়াল না ও। কিন্তু পরক্ষণে আবার শুনল মঞ্জুশ্রী!

এবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, একজন যুবক ওর দিকে এগিয়ে আসছে। কে? চিনতে একটু সময় লাগলো মঞ্জুর। সেই ললিত চৌধুরী।

মঞ্জুর ভ্রূ কুঞ্চিত হ'ল—নিজের অজ্ঞাতেই যেন ও বলল—আমাকে ডাকছেন? আপনি?

'—হ্যাঁ।'

'—কেন বলুন তো?'

'—একটু আগে যা ঘটেছে, বিশ্বাস করুন তার জন্য আমি আদৌ দায়ী নই।'

'—একটু আগে মানে? আমি ত আপনাকে চিনি না!'

'—চেনেন না? অবশ্য না চেনাই বোধ হয় ভালো ছিল।'

অকস্মাৎ একটা রূঢ়তায় মঞ্জুর কোমল সুগৌর মুখখানি কঠিন হয়ে উঠল—এরকম গায়ে পড়া আলাপের অর্থ কি?

ললিত চৌধুরী অপ্রভিত ভাবে থতিয়ে বলল—আমি, ললিত চৌধুরী ...মানে স্টুডেণ্ট লীডার। চিনতে পারছেন না?

মঞ্জু এবার গলা চড়িয়ে বলল—'আপনি কে তা চিনতে এতটুকু বাসনা নেই।'

'—অ! আচ্ছা, নমস্কার।' বলে ললিত চৌধুরী বিরস মুখে পথ চলতে লাগল।

এমনিভাবেই মঞ্জুশ্রীর মনটা হঠাৎ বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে গেল একটি রবিবারের প্রাতঃকালীন ঘটনা পরম্পরাতে।—আশ্চর্য! অথচ আর কেউ সে খবর জানল না। মঞ্জুর মনে জমে উঠল পুরুষ জাতির প্রতি বিদ্বেষ এবং সেই সঙ্গে মেয়েদের প্রতিও কম অশ্রদ্ধা জমল না। অকারণেই ললিত চৌধুরীকে অপদস্থ করে যেন খুব আনন্দ হ'ল মঞ্জুর। অথচ আগে হ'লে হয়তো একদিন চায়ের নেমন্তন্নই ক'রে বসত—কিন্তু আজ যেন ললিতকে দ্বিতীয়বার সামনাসামনি দেখেই ওর মাথাটা গরম হয়ে উঠল। পরম শত্রুর প্রতিও এতখানি রূঢ় আচরণ করতে দ্বিধা হত অন্য সময়ে ওর। কিন্তু রত্নার মুখখানা মনে পড়তেই মঞ্জু হঠাৎ জ্বলে উঠেছে!

ফিরতি পথে বাসে বসে বসে মঞ্জু আজকের সকালের সব কথা ভেবে

নিজেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। কোথায় 'উন্মেষ'-এর বসন্ত সংখ্যা আর কিভাবে তাকে কেন্দ্র ক'রে একটার পর একটা অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটে চলেছে। রত্না দাসের ওপর ঘৃণা হয়, কিন্তু শুধুই যেন ওকে দোষ দিতে ইচ্ছে করে না—কিছু একটা গভীর ইতিহাসের রহস্য রত্নাকে যেন ঘিরে রয়েছে।...থাক, যা আছে, তা জেনে আর মঞ্জুর কাজ নেই—ঢের হয়েছে।

বাড়ি ফিরে মঞ্জু যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌ল। বাড়ির এই ক'টি দেয়ালে যে এত প্রশান্তি পুঞ্জীভূত রয়েছে,—এতদিনের মধ্যে আজই যেন সেটা উপলব্ধি করল মঞ্জু।

মৃদু তিরস্কার করে মা বললেন—'ছুটির দিনেও দু-দণ্ড সোয়াস্তি নেই তোর? সেই সাত সকালে কোথায় টহল দিতে বেরিয়েছিলে শুনি!'

—'আর যাবো না মা, দেখো এবার কেমন লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে যাই।'

—'হুঁঃ, তবেই হয়েছে—সেদিন পুবের সূর্য পশ্চিমে উঠ্‌বে।'

বলতে বলতে সুমিতা বৌদি পাশে এসে দাঁড়ালো। তারপরই গালে হাত দিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়লেন যেন—'দেখুন মা, আপনার লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে পূজোর ব্যাংলোর শাড়ীখানাকে কিরকম বুটিদার ঢাকাই বানিয়েছে। খুব বড় আর্টিস্ট হয়ে উঠ্‌ল ব'লে!'

সরোজিনী মেয়ের মুখের পানে চেয়ে আর তিরস্কার করতে পারলেন না, বললেন—'এত লক্ষ্মী লক্ষ্মী ভাব দেখেই বুঝেছি কীর্ত্তি একটা কিছু করে বসে আছো। যাক বেশ হয়েছে এখন একটু থির বসো দেখি।'

—'আর একবার চান করতে হবে।'

—'জ্বর না বাধালে বুঝি শান্তি হচ্ছে না!'

—'চোখ মুখ খুব জ্বালা করছে কি না—'

—'দেখি—দেখি।' বলে সরোজিনী মেয়ের কপালে চিবুক স্পর্শ

ক'রেই গম্ভীর হয়ে গেলেন—'হ্যাঁ, বেশ জ্বর ভোগ করছিস যে রে মনু।
যাও বৌমা, থারমোমিটারটা আনো তো—'

মঞ্জু বলল—'ও কিছু না, এই সবে রোদ থেকে এলাম কি না।'

মুখে যাই বলুক মঞ্জু কিন্তু মনে মনে খুশিই হয়েছে। কি জানি কেন জ্বরটা এসে যেন ওকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। চুপচাপ নিশ্চিন্ত মনে নিজের ঘরে কাটাবার জন্য মনটা কি এতই তৃষিত হয়ে উঠেছিল! দুনিয়ার ওপর সত্যিই ও যেন বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে। তাই এই নির্জনতাপ্রীতি। অথবা সুরজিতের অশুচি স্পর্শে যে গ্লানি জমেছিল সেটা এই জ্বরের মধ্য দিয়ে মঞ্জুকে নির্মল মুক্তির পবিত্রতায় পৌছে দেবে! এ এক অভূতপূর্ব অনুভূতি, মঞ্জু নিজেও ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

একলা ঘরে শুয়ে মঞ্জু অনেকটা সুস্থ বোধ করল।

আহা জ্বরটা যেন আরও বেশি হয়। জ্বরের ঘোরে মঞ্জু যেন সমস্ত চেতনাকে ডুবিয়ে গভীর অতলে তলিয়ে দিতে পারে। তারপর যখন আবার জ্ঞান ফিরে আসবে তখন আর পুরনো স্মৃতির ছিটেফোঁটাও ওর মনে লেগে না থাকে!

হঠাৎ আসা জ্বর হঠাৎই ছেড়ে গেলো।

মা বললেন—রোদ-জ্বর! ওতে অমন হয়। বৌদি বললো—শ্রম-জ্বর! ওতেও অমন হয়।

জ্বর ছাড়ার পর কী অসম্ভব ক্লান্তি লাগছিলো - মঞ্জুর, মনে হচ্ছিল পাশ ফেরাটাও বুঝি খুব একটা খাটুনি, তবু বৌদির কথায় ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ জানালো—বাঃ, শ্রম আবার কিসের?

সুমিতা হেসে বললো—দৈহিক না হোক মানসিক শ্রম তো কম হচ্ছে না?

নির্দোষভাবেই কথাটা বললো সুমিতা, শুধু 'উন্মেষের' ওপর কটাক্ষপাত করে। 'উন্মেষ' নিয়ে মঞ্জুর আশা আনন্দ, দুশ্চিন্তা ছুটোছুটি, এটা তো বাড়ীতে একটা হাসির ব্যাপার। সুমিতাও এতে ভারি কৌতুক অনুভব করে। নিজে সে নেহাৎ বিজ্ঞ না হলেও। ভারি ত ব্যাপার! ছাপানো নয় কিছু নয়, হাতে লেখা একখানা খাতা। তা'কে ঘটা করে না হয় 'পত্রিকা'ই বললে, এই ত? তা'তে কোথায় একটু ফুল লতা কাটবে কি কোন পাতায় গঁদ দিয়ে একখানা ছবি শাঁটবে, এই নিয়ে এত মারামারি! বাবাঃ!

সুমিতার কাছে এটা সত্যিই হাস্যকর।

তাই সুবিধা পেলেই ঠাট্টা করে। ওটা ও সেই ভাবেই করেছে।

কিন্তু শোনার সঙ্গে সঙ্গে বুকটা ধড়াস করে উঠলো মঞ্জুর।

মানসিক শ্রমের খবর বৌদিকে জানালো কে? তবে কি তার জ্বরের অবসরে কেউ কিছু বলে গেছে? আচ্ছা কে কি বলবে? বলবার আছে কি?··· মঞ্জুর নামে অপবাদ রটিয়ে যাবার মতো, মঞ্জুর নামে অভিযোগ করবার মতো, কি করেছে মঞ্জু?

নাঃ কিছু করে নি সে!

ক্লান্তি বিস্মৃত হয়ে উঠে বসলো মঞ্জু। কাল থেকে কি যে এক মিথ্যে অশান্তিতে কাটছে!··· মঞ্জু ভালো, মঞ্জু সুন্দর, মঞ্জু পবিত্র!···

বৌদি বললো—ওকি হঠাৎ অমন ধড়মড় করে উঠে বসলে যে?

—দূর, শুয়ে থাকতে ভালো লাগছে না!

—উঃ কি চঞ্চল মেয়ে বাবা!··· 'শুয়ে থাকতে ভালো লাগছেনা', আমাকে যদি তিনদিন তিনরাত কেউ ঘুমতে বলে, আমি 'না' করিনা!

সুমিতা মঞ্জুর খাওয়া দুধের গেলাসটা নিয়ে হাসতে হাসতে চলে যায়।

মঞ্জু কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই শুয়ে পড়ে।

শুয়ে মনে মনে জপ করতে লাগলো—আমি সুন্দর আমি পবিত্র, আমি ছেলেমানুষ !

'আমি ছেলেমানুষ' ! এ আবার কেমন ধারা জপমন্ত্র ? একি একা মঞ্জুর-ই, না সকলের জীবনেই আসে এ মন্ত্র জপের প্রয়োজন ?

হয়তো আসে।

'আমি বড়ো হয়ে গেলাম' ! এ অনুভূতি বড়ো দুঃখের, এ চিন্তায যেন প্রিয়জন বিয়োগের ব্যথা।

প্রিয়জনের মৃত্যুকে মানুষ যেমন বুঝতে পেরেও অস্বীকার করতে চায়, তার স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে বিশ্বাস করতে চায় 'সে আছে... সে আছে'—মঞ্জু যেন তেমনি করে অস্বীকার করতে চাইছে আপন কৈশোরের মৃত্যুকে।...দু'হাতে আগলে রাখতে চাইছে প্রত্যূষের স্নিগ্ধ শান্তিটুকুকে !... যে সূর্য্যের উদয়-আভাসে আকাশে নানা বর্ণের খেলা, কত রক্তিমা, কত স্বর্ণাভা, সেই সূর্য্যই যখন সম্পূর্ণতা নিয়ে উদয় হয়, তখন আর থাকে না কোন রঙের মাধুর্য্য।

তখন শুধু প্রখর দীপ্তি !

শুধু প্রচণ্ড দাহ !

কিন্তু চোখ বুজে থেকে কি সূর্যকে অস্বীকার করা যায় ? ঘরের জানালা বন্ধ রেখে, ধরে রাখা যায় ভোরকে ?

রবিবারের দুপুর।

দুই ভাই বোন খেতে বসেছে। মা কাছে বসে।

দাদা মৃণাল হঠাৎ মুখ তুলে বলে ওঠে—মঞ্জুটা এত বিশ্রী রকমের শুকিয়ে গেছে কেন বলো ত মা ? সেই ত কি দু'দিন জ্বর হলো—

মা বললেন—হ্যাঁ আমিও লক্ষ্য করছি, ক'দিন হয়ে গেলো মোটে সারতে পারে নি। তবু ত—এ কদিন ইস্কুল যেতে দিইনি।

মৃণাল চমকে বলে—সেই থেকে ইস্কুল যায় নি নাকি ?—

না অনেক বারণ টারণ করে—

মৃণাল চিন্তান্বিত ভাবে বলে—মঞ্জু লক্ষ্মী মেয়ের মতো ইস্কুল যাওয়ার বারণ শুনেছে, এটা ত ভাবনার কথা ! হ্যাঁ রে এই, খুব বেশী টায়ার্ড ফিল্ করিস ?

নিজেকে নিয়ে এরকম আলোচনায় মঞ্জুর ঘোরতর আপত্তি, কিন্তু প্রতিবাদ করবার ঠিক সুযোগ পাচ্ছিল না, দাদার প্রশ্নে সুযোগ পেয়ে বলে ওঠে—টায়ার্ড ফিল্ করতে যাব কি দুঃখে ? সব্বাই বৌদির মত মোটা হ'তে সুরু করুক এই বুঝি তোমার ইচ্ছে ?

দাদাকে বৌদি তুলে ঠাট্টা এর আগে কোন দিন করেছে নাকি মঞ্জু ? কই মনে তো পড়ে না। দাদা তো অনেক বড়ো।... কিন্তু হঠাৎ যেন মঞ্জুর খেয়াল হয়েছে, বৌদি তার চাইতে 'মাত্র কয়েক বছরের বড় ! আর দাদা সেই বৌদির কাছে ? নাবালক মাত্র।

তবে এতে ভয় কিসের ?

মানে হয় না অতো বেশী সমীহ করবার।

দাদা বোনের দুষ্টুমি-মাখা হাসিভরা মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বলে—হুঁ, খুব ওস্তাদ হয়ে উঠছো যে ?

মা ইত্যবসরে মঞ্জুর কথার উত্তরে ধমকের সুরে বলেন—তোদের ভাই বোনের এক কথা ! বৌমা আবার মোটা কোথা ? মেয়েমানুষ ওরকম একটু 'শাঁসে জলে' গড়ন না হ'লে মানায় ?

মায়ের তুলনা শুনে দুই ভাই বোন হেসে ওঠে।

দাদা তৃপ্তিভরা মুখে মাছের তরকারির বাটিটি কাছে টেনে নেয়।

এই সময় বামুনঠাকুর আসে ভাতের পাত্র নিয়ে। মঞ্জু বলে—খবরদার ঠাকুর, আর একটাও নয়।

মৃণাল বিরক্ত স্বরে বললে—এক্ষুনি খাওয়া হয়ে গেলো তোর? কতটুকু খেলি?

—ওই রকম খাওয়ার ছিরিই তো হয়েছে আজকাল—মা বল্লেন।

—না না এটা ঠিক হচ্ছেনা। মৃণাল বল্লে—বাড়ের বয়সে খাওয়া দাওয়ার দিকে বরং বেশী নজর দেওয়া দরকার। একটা টনিক-ফনিক খেতে হবে।

বাড়ের বয়েস!

কথাটা যেন খট্ করে কানে বাজলো মঞ্জুর!

মৃণাল বলতে থাকে—রোসো আমার এক বন্ধুর ভাই নতুন ডাক্তার হয়ে বেরিয়েছে, তাকে ডেকে আনছি একদিন! ভালো করে দেখে শুনে কিছু ওষুধ বাৎলে দিক।

মঞ্জু প্রবল আপত্তি তুলে বলে ওঠে—ডাক্তার? ডাক্তার কেন? জ্বর নয় অসুখ নয়, ডাক্তার কি হবে? পাগল বলবে যে।

—পাগল বলবে? কে কাকে পাগল বলবে?

—ডাক্তারই বলবে। তোমাকেই বলবে। হয় ত বা তোমারই মাথার চিকিৎসা করতে চাইবে, বুঝলে দাদা!

—বুঝলাম! তুমি যে কত বাক্যবাগীশ হয়ে উঠছো তা'ও বুঝলাম।

খাওয়া হয়ে গেলে মঞ্জু নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লো। সেদিনের জ্বর থেকে এই পাঁচ ছ'দিন ধরে এই চলছে তার। খাওয়া আর শোওয়া।

নাঃ, ওসব ডাক্তার ফাক্তারের প্যাঁচে পড়লে চলবে না। কাল থেকে ইস্কুল যাবে মঞ্জু, ঠিক আগের মত নিয়মিত পড়াশুনো করবে। কদিন বড্ড ফাঁকি দেওয়া হয়ে গেছে।

তা বইপত্তরগুলো আজ পাড়া যাক না!

শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ ভাবলো, বৌদি যদি ঘরে আসে, ত সেলফ থেকে একটা বই পাড়িয়ে নেবে।···কিন্তু বৌদি আর এলোনা।

আশা করতে করতে হঠাৎ একসময় সূক্ষ্ম একটু হাসির রেখা ফুটে উঠলো মঞ্জুর মুখে।··· বৌদি আর এসেছে! আজ রবিবার না? সেটা ভাবা উচিত ছিলো মঞ্জুর।

হঠাৎ একসময় উঠে পড়লো।

সেল্‌ফের কাছে গিয়ে দেখলো—কেমন যেন অগোছালো হয়ে রয়েছে তাকগুলো।···গোছাবে? আচ্ছা এখন থাক, রাত্রে গোছাবে। রাত্রেই ভালো, কাল থেকেই তো তোড়জোড় করে ইস্কুল!

ইস্কুল! সেখানের কথা যেন ক'দিন ভুলেই গিয়েছিলো মঞ্জু। গ্রীষ্মের লম্বা ছুটিতেও তো এমন বিস্মৃতি আসে না। ···বাংলার টিচার মণিকা দি, ঠিক কি রকম মুখখানা তাঁর? ভাবতে গেলে কেমন আবছা আবছা লাগে।···

কিন্তু ভাবতে গেলে কারুর মুখই কি স্পষ্ট মনে আনা যায়? কোনদিন কাউকে ত ভেবে দেখেনি মঞ্জু! ধরো—দাদা, বৌদি, মা, বাবা! নাঃ কিছু স্পষ্ট হয় না।

কিন্তু নিজেকেই কি নিজে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়? এই যে—ইতিহাসের বই নিতে এসে, দাদার কাছে জন্মদিনে উপহার পাওয়া 'সঞ্চয়িতা'খানা টেনে নিলো কেন, এ সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন উত্তর দিতে পারবে মঞ্জু?

পাতার পর পাতা ইচ্ছে মতো উল্টে গেলেই হলো। কবিতার বইয়ের এই এক সুবিধে। গোড়া ধরবার বাধ্যবাধকতা নেই, শেষ করবার দায় নেই। যেখান থেকে খুশি, যতটুকু খুশি পড়লেই হলো।

কিন্তু এত কবিতা থাকতে—'সুরদাসের প্রার্থনা'ই বা পড়তে খুশি হলো কেন তার?

"ঢাকো ঢাকো মুখ টানিয়া বসন, আমি কবি সুরদাস,
দেবী, আসিয়াছি ভিক্ষা মাগিতে পুরাতে হইবে আশ।
অতি অসহন বহ্নিদহন্ মর্ম-মাঝারে করি যে বহন
কলঙ্করাহু প্রতি পলে পলে জীবন করিছে গ্রাস!
পবিত্র তুমি, নির্মল তুমি, তুমি দেবী তুমি সতী,
কুৎসিত দীন অধম পামর, পঙ্কিল আমি অতি।"

বই মুড়ে এলোমেলো চিন্তা করতে থাকে মঞ্জু।...

এ কী অদ্ভুত স্বীকারোক্তি!... এমন অনুতাপও তা'হলে আসতে পারে মানুষের? সুরদাস! সুরজিৎ! এই রকম নাম হলেই বুঝি মানুষ অমন লুব্ধ হয়? অথচ দুটো নামের মানে তো সম্পূর্ণ আলাদা!

তবু দুটো মানুষ যেন এক!

এক?...তাই কি?...সুরজিতের মনে কি কখনও এমন অনুতাপ আসবে?

মঞ্জু জানে না সুরজিৎ যে অসংযমটুকু প্রকাশ করে ফেলেছে জগতের দরবারে...সেটুকু কোনো অপরাধই নয়। অতএব অনুতাপের কথাই ওঠে না।

'তোমাকে আমার ভাল লাগে—' এই স্বীকারোক্তিটুকুকে যদি অপরাধ বলে ঘৃণার চক্ষে দেখতে চাও, সংসারী লোকে বলবে—'তা'হলে বাপু সরে পড়ো। এ জগৎটা তোমাদের উপযুক্ত জায়গা নয়। স্বর্গীয় কোন জগৎ থাকে ত—'

কিন্তু এও ত সত্যি, কৈশোর কালটুকু স্বর্গের সুষমা দিয়েই গড়া! যেমন গোধূলির সোনার বেলাখানি! সেই সোনালী মনের ওপর প্রথম অপরাধ-বোধের গ্লানি মৃত্যুর মতোই ভয়াবহ।

মঞ্জু ভাবে সুরদাস বলেছে—"এ আঁখি আমার শরীরে ত নাই, ফুটেছে মর্মতলে—"

সুরজিৎ হলে কি বলতো? তার সেই জলন্ত আঁখি দুটোও কি মর্মের মৃণালে ভর করে উঠেছে? না শুধুই শরীরের ওপর আগুনের অক্ষরে আঁকা আছে?

পাশের ঘরে মৃণাল বৌকে বলে—এখন আবার মঞ্জুর পড়া মুখস্থর ধুম পড়লো? খেয়ে উঠে খানিক বিশ্রাম করা দরকার। ওই জন্যেই তো স্বাস্থ্য টাস্থ্য—

সুমিতা দুষ্টু হাসি হেসে বলে—পড়া মুখস্থই করছে বটে! 'সঞ্চয়িতা' পড়া হচ্ছে!

—সঞ্চয়িতা!

—হ্যাঁ মশাই, ওই শুনুন—বলে সে নিজেই আবৃত্তি করে

"আজি এ প্রভাতে রবির কর;
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত পাখীর গান!"…বুঝেছ কিছু?

—এর আর বোঝা-বুঝির কি আছে?

—'ঘটে' কিছু থাকলে তো বুঝবে? আমার তো মনে হয়—ভগ্নিটি যখন একেলে কবিতা ছেড়ে সেকেলে কবিতা ধরেছে, বুদ্ধি ছেড়ে হৃদয়, তখন ভগ্নিপতি খোঁজা দরকার।‥'প্রাণের ওপর রবির কর' এসে পড়া?…উঁহু লক্ষণ ভালো নয়।

মৃণাল মৃদু ধমকের সুরে বলে—আচ্ছা তোমাদের মেয়েদের কাছে কি ঠাট্টার সময়ে বয়সের প্রশ্নটা অবান্তর? ঠাট্টার সম্পর্ক হলেই হলো?

—বয়স? সুমিতাও ধমকের সুর ধরে—বয়স মানে? তুমি কি ভাবো মঞ্জুকে বিয়ে দিলে দেওয়া যায় না? তোমাদের মা মাসীদের আমলে হতো না?

—সেটা হ'তো পুতুলের বিয়ে!

—এটি হচ্ছে তোমার একের নম্বর ভুল ধারণা, বুঝলে? মেয়েদের কথা মেয়েরাই জানে। আমি তো তেরো বছর বয়স থেকেই মনে মনে বরের মূর্ত্তি কল্পনা করেছি।

—বটে নাকি? এমন সাংঘাতিক খবরটা ত জানতাম না। তা' কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের কিছু মিল হয়েছে?

—একছটাকও না!

হেসে ওঠে সুমিতা।

এর পর দু'জনের আলোচনার ধারা যে খাতে বয়ে যায়, তা'তে অন্ততঃ মঞ্জুর কোনো স্থান থাকে না!

সঞ্চয়িতার পাতা উল্টোতে উল্টোতে মঞ্জু একবার থমকে চুপ করে।··· হঠাৎ ওর মনে হয় বৌদি যেন বড় বেশী বাচাল। ওর হাসিটা বড় বেশী নির্লজ্জ!···দাদার সঙ্গে যে ওর খুব ভাব, এটা যেন ঘটা করে জানিয়ে বেড়ায়।

এরপর আর পড়তে ভালো লাগে না।

কেন লাগে না কে জানে।

অথচ এতক্ষণ খুব ভালো লাগছিলো। নিজেকে যেন ভাসিয়ে দিয়েছিলো অর্থহীন শব্দ-স্রোতে! · তা' অর্থহীন বৈ কি! কবিতা পড়তে যখন ভালো লাগে, কবিতা না পড়ে যখন থাকা যায় না, তখন কি অর্থ বুঝে বুঝে পড়া হয়? তখন শুধু শব্দের তরঙ্গে ওঠা পড়া, শুধু শব্দের স্রোতে ভেসে যাওয়া!

মৃণাল-মঞ্জুর মা সরোজিনী রবিবার দুপুরের অবসরে কর্তার সঙ্গে দুটো ঘর-সংসারী কথা কইবার বাসনায় তাড়াতাড়ি নিচের তলার কর্তব্য সেরে ওপরে উঠে আসেন, এই বেলা ধরতে না পারলে এক্ষুনি

নিচের তলায় ডাক পড়বে, দাবা খেলার বন্ধুরা এসে হাজির হবে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এসেও দেখলেন কর্তা ঘরে নেই, ইত্যবসরে হাওয়া !

রোষে ক্ষোভে সরোজিনীর চোখে প্রায় জল এসে পড়ল। আপন-মনে গর্জন করতে থাকেন তিনি—দাবা তো নয়, আমার যম ! চিরদিনের শত্রু আমার !·· সে মুখপোড়াদেরও বলিহারী দিই, এই দুপুর রোদ্দুরে মরতে মরতে এসেছিস ? নেশা, একেবারে মদের নেশার বাড়া !··· ওই মুখপোড়াগুলোর জন্যেই ত আরো গোল্লায় গেলো মানুষটা !

মুখপোড়াগুলোর মধ্যে একজন নাকি জ্ঞাতি সম্পর্কে ভাসুর, আর একজন জনৈক অবসরপ্রাপ্ত সবজজ, অপর ব্যক্তি এক খ্যাতনামা প্রবীণ কবিরাজ, কিন্তু কাউকেই কিছু রেখে ঢেকে বলেন না সরোজিনী। কর্তার সামনেও বলেন !

বড় মেজ দুই মেয়ে কতদিন বাপের বাড়ি আসেনি, সেই সম্বন্ধে পরামর্শ করতে এসেছিলেন সরোজিনী। অনেকগুলি করে ছেলে মেয়ের মা হয়ে গিয়েছে তারা, আনার আনন্দর চাইতে আতঙ্ক বেশী, তাই সহজে আর আনার কথা ওঠে না। কিন্তু মন কেমন করে বৈ কি ! মায়ের প্রাণ, মনে পড়লেই মনটা ধড়ফড় করে ওঠে ! আহা, ছেলেপুলের ঝক্কিতে একটু স্বস্তি পায় না বাছারা। তাছাড়া—অনেকদিন উদ্দিশ না করলে চক্ষু লজ্জাও তো হয় ? 'মন কেমন'কে বরং মনের মধ্যে দাবিয়ে রাখা যায়, কিন্তু চক্ষুলজ্জার শাসন মানতে হয় বৈ কি !

কিন্তু কোন পরামর্শই হলো না !···ওই কর্মনাশা দাবা !

মৃণাল যখন দু'বছরের ছেলে, প্রথম দাবা খেলে রাত্তির এগারোটায় বাড়ি ফিরেছিলেন নিবারণবাবু, সেদিনও রোষে ক্ষোভে চোখে জল এসেছিলো সরোজিনীর !

মৃণাল আজ বত্রিশ বছরের ! কিন্তু আজকের চোখের জলটা কি সেদিনের চেয়ে কিছু কম উত্তপ্ত ?

পরামর্শের প্রয়োজনই তো সব নয়? সঙ্গর লোভও কিছুটা আছে বৈ কি। গল্পের বিষয়বস্তু আজ যেখানে এসেই ঠেকুক, সঙ্গের আকর্ষণ তো সমানই আছে!

কিন্তু নিবারণবাবুর?

তিনি বরাবরই ওই রকম। প্রত্যেকটি বিষয়ে তিনি সরোজিনীর একান্ত বাধ্য, শুধু এই একটি বিষয়ে—এই একটি ব্যাপারে তিনি একেবারে অবারণ। সহস্র নিবারণেও কিছু করে উঠতে পারেননি সরোজিনী।

—মুখপোড়াদের আপন আপন সংসারেও কি কোনো কাজ থাকে না গো—!...আর একবার আপন মনে ঝঙ্কার দিয়ে, হতাশচিত্তে শুয়ে পড়েন সরোজিনী।

সুমিতা এক সময় উঠে দালান পার হতে গিয়ে আড় চোখে দেখতে পেলো শাশুড়ীর শোয়ার ভঙ্গীটুকু। মনে মনে বললো—এটা কিন্তু বাবার ভারি অন্যায়! মায়ের তো রাগ হতেই পারে। তবে এক্ষেত্রে মেয়েদের মন মেয়েরাই বোঝে—ব'লে গল্প করতে সাহস করলো না মৃণালের সঙ্গে।

সন্ধ্যাবেলা মৃণাল এসে হাঁক পাড়লো—মা, এই আমার বন্ধু অমিতের ভাই সুস্মিত। যার কথা বলছিলাম কাল, নতুন ডাক্তার হয়ে বেরিয়েছে, খুব ভালো ছেলে। সুন্দর রেজাল্ট করেছে!...ধরে নিয়ে এলাম! নাও—ডাক ত মঞ্জুকে, একটু দেখা শোনা করে, কিছু চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিক।...কই—মঞ্জু! মঞ্জু!

মঞ্জুর সাড়া পাওয়া গেল না!

মা বললেন—এই ত ঘরে ছিলো, এক্ষুনি গেলো কোথায়!

—না বলে তো বেরোবে না!

মৃণাল বলে—যাননি কোথাও, ঘরের মধ্যে কানে তুলো দিয়ে বসে

আছেন !...এসো হে স্থস্মিত, ভয় নেই, সে এখনো সমীহ করবার মতো মহিলা হয়ে ওঠে নি, এসো...চলে এসো !

অগত্যা স্থস্মিত মৃণালের পিছন পিছন মঞ্জুর ঘরে এসে ঢুকে পড়ে।

মৃণাল বলে—এই যে আছো ? শ্রীযুক্ত ডাক্তারবাবু তো প্রথম নম্বরেই তোমার কানের চিকিৎসা করতে চাইছেন ?.. রাজী আছো ?

মঞ্জু প্রথমটা থতমত খেয়ে যায়, তারপর ব'লে ওঠে—আমার কোনো চিকিৎসা করবার দরকার নেই, আমি বেশ আছি।

দাদা একটু চটে।

বাইরের লোকের সামনে এতটা স্মার্ট হবার কি দরকার রে বাপু ? যাই হোক বাইরের লোকের সামনে ত ঠিক বকাও যায় না ! তাই বোনের বেণীটায় একটা টান দিয়ে বলে—বেশ আছো ত, গালের হাড় দিন দিন উঁচু হয়ে উঠছে কেন ?...বোসো স্থস্মিত।

হঠাৎ ভারি হাসি পেয়ে যায় মঞ্জুর !

যে রকম লাজুক লাজুক মুখে অপ্রতিভের মতো বসলো ছেলেটা, যেন নিজের বিয়ের 'কনে' দেখতে এসেছে !...ও নাকি আবার ডাক্তারী পাশ ?...কি ছেলেমানুষ ছেলেমানুষ মুখ রে বাবা, মনে হচ্ছে ফার্স্ট ইয়ারের স্টুডেণ্ট !

এই ক'দিন আগে নিজেই মঞ্জু জপ করেছে—'আমি ছেলেমানুষ... আমি ছেলেমানুষ' !...আর আজ ওর আস্ত একটা তৈরি ডাক্তারকে শুধু মুখের লাজুক ভাবের জন্য নেহাৎ নাবালক মনে হচ্ছে।

লাজুকরাই প্রবীণের অভিনয় করে। তাই—স্থস্মিত অমন গম্ভীর গম্ভীর গলায় মৃদু প্রশ্ন করে—রাত্রে ঘুম হয় ?...ঘুম থেকে ওঠবার সময় বেশী ক্লান্তি অনুভব করেন ?...আগের চাইতে খাওয়া কমে গেছে ? না খাওয়াই কম ? মাথা ধরে ?...চোখের কিছু ডিফেক্ট হচ্ছে বলে আশঙ্কা হয় ? সন্ধ্যার দিকে ঘাড় ব্যথা করে ? জ্বর ভাব হয় ?...

স্পষ্ট কোনো অসুখ নেই, দিব্যি চটপটে একটা মেয়ে, একে হঠাৎ রোগী বলে ধরে নিতে হলে যা যা প্রশ্ন করবার সবই করতে থাকে সুস্মিত। কোনোটার উত্তর মৃণালই দিয়ে বসে, কোনটার মঞ্জু দেয়।

সরোজিনী ঘরে এসে দাঁড়িয়ে আছেন মাথায় কাপড় দিয়ে। অনাত্মীয় পুরুষ, তা সে যতোই ছেলেমানুষ হোক, তাকে দেখে মাথায় কাপড় দিয়ে একটু নীরব নীরব হয়ে থাকাই সরোজিনীর চিরদিনের অভ্যাস।... শুধু সরোজিনী নয়, বোধ হয় সরোজিনীদের আমলের সকলেরই অভ্যাস!

সব দেখে শুনে—ডাক্তার একটা সর্ব্বাধুনিক পেটেণ্ট টনিকের ব্যবস্থা দিল। বললো—আর কিছু লাগবে না,...ঠিক হয়ে যাবে।

নতুন বাড়ের বয়সে, চটকরে একটু লম্বা হয়ে গেলে, কি ছেলে, কি মেয়ে, হঠাৎ একটু রোগা হয়ে যায় এটা স্বাভাবিক, এ কথাটুকু বলতে গিয়ে থেমে গেলো নবীন ডাক্তার।

মৃণাল বললো—খাওয়া-দাওয়াগুলো? মানে স্বভাবতই খাওয়া ওর বয়সের পক্ষে একটু কম, তা' ছাড়া—

মুখচোরা ডাক্তার এ কথায় হঠাৎ একটু হেসে ফেলে বলে—ওটা ফ্যাসান! আধুনিক হতে গেলে বেশী খাওয়া নিষিদ্ধ!

গলা ছেড়ে হেসে ওঠে মৃণাল, সরোজিনীও হাসেন। বেশ লাগে তাঁর ছেলেটিকে।

মঞ্জু কিন্তু মোটেই হাসে না। উচিত মতো একটা উত্তর দেবার জন্যে মুখ নিসপিস করে তার। কিন্তু নেহাৎ দাদার সামনে তাই। সকলের অলক্ষ্যে ওর মুখটা দেখে নেয়, দেখে ভাবে—যত ছেলেমানুষ মনে করছিলাম তা নয় দেখছি!

এর পর আপ্যায়নের পালা।

ভিজিট দেবার নয়, এমন ডাক্তারকে আপ্যায়ন দিয়ে পুষিয়ে দিতে হয়।

ডাক্তার চলে যেতে যেতেই, সুমিতা এসে সহসা বেদম হাসি জুড়ে দেয়!

মঞ্জু একটু অপেক্ষা করে বলে—কি হলো বৌদি, হঠাৎ সিদ্ধি-টিদ্ধি খেলে নাকি?

সুমিতা হাসি থামিয়ে বলে—বাবাঃ ডাক্তার এসে রোগ দেখলো না কনে দেখলো? আমার বিশ্বাস তোর দাদার তলে তলে অন্য মতলব আছে!

বৌদি চলে গেলে মঞ্জু জানালার বাইরে চেয়ে অবাক হয়ে ভাবতে থাকে,—বৌদিই বা হঠাৎ এমন সব ঠাট্টা সুরু করেছে কেন? কই আগে তো করতো না? কেউ মঞ্জুর কথা এতো করে ভাবতোই না।

মঞ্জু ত নিজে জানে না, হঠাৎই তার মুখে চোখে লেগেছে নব তারুণ্যের স্পর্শ। ···সেটা অন্যের চোখে ধরা পড়ে গেছে! তাই সকলেরই তার ওপর চোখ পড়েছে!

সুরজিতের ব্যবহার তার মনে জ্বালা এনে দিয়েছে, ঘৃণা এনে দিয়েছে, এনেছে গ্লানি বহন করে। তবু সেই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারই মুহূর্তকালের মধ্যে বালিকাকে করে তুলেছে নারী।

লেখাপড়ার চিন্তা ছিল, ক্লাসের মেয়েদের প্রতি বিরাগ অনুরাগের ভিত্তি নিয়ে চিন্তা ছিল, 'উন্মেষের' শ্রীবৃদ্ধি নিয়ে দুঃসহ প্রতীক্ষার চিন্তা ছিল, কে দিল লেখা, কে দিল না ছবি এই সব ভেবে অস্থির হওয়া ছিল, ছিল না শুধু—আত্মচিন্তা। ছিল না আত্মসচেতনতা!···একসময় সব ঝেড়ে ফেলে 'উন্মেষের' কথা ভাবতে গেল, মোটেই মন বসাতে পারলো না।···

মনে হলো—দূর আর দরকার নেই। কি হবে ওসব ছেলেমানুষীতে, আর কেউ ভার নেয় তো নিক।···'উন্মেষের' একটু মলাটের জন্যে এত কাণ্ড মনে করে অবাক লাগলো!

এত জোলো জিনিস নিয়ে এমন অদ্ভুত মাতামাতি করেছে কেন, ভেবে যেন কোনো মানে পেলো না।

ডাক্তারটাকে দু'কথা শুনিয়ে দেওয়া হলো না!

রোসো, এবার যেদিন আসবে, বুঝিয়ে দেবে, মঞ্জু একটা বোকা হাবা বাজে মেয়ে নয়। ঠাট্টা করে যে পার পেয়ে গিয়েছিল, সে শুধু মা আর দাদার উপস্থিতির অসুবিধেয়।...

কিন্তু ডাক্তার আবার আসবেই বা কেন? শুধু শুধু কে কবে ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আসে? এই যে এ ভদ্রলোক তো দাদার বন্ধুর ভাই, কোনোদিন ত তাকে নিজের গাড়ীতে তুলে নিয়ে বাড়ী চেনাবার গরজ পড়েনি দাদার?

আজ দরকার পড়েছে তাই।

আর কি সূত্রেই বা দরকার পড়তে পারে?

রক্ষে কর—আর কারুর জন্যেই যেন ডাক্তারের দরকার না হয়। এক যদি মঞ্জুরই—

হঠাৎ সেদিনের মত বেদম জ্বর, কি··· কি—নাঃ আর কোনো অসুখই তেমন সভ্য নয়। মনঃপূত হলো না। আচ্ছা দৈবাৎ যদি পড়ে যায় মঞ্জু? সিঁড়ি থেকে কি গাড়ী থেকে? না বাবা, কপালে টপালে কোথায় দাগ হয়ে থাকবে কে জানে।··· এক যদি দুর্দান্তভাবে মাথা ধরে! মাথার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে যায়? নাঃ তেমন কিছু হলে, বাড়ীর বরাবরের ডাক্তার নৃসিংহ চাটুয্যেকেই ডাকা হবে।

কিছু নয়, অথচ কিছু, এমন কি অসুখ আছে? যাতে, নতুন পাশ করে বেরোনো ডাক্তারকে দিয়েই কাজ চলে যায়? তেমন রোগ তো একমাত্র ওই রোগা হওয়া!

সবাই মিলে যেমন উঠে পড়ে লেগেছে—মঞ্জুর স্বাস্থ্যোন্নতির জন্যে, তা'তে সে রোগের আশা সুদূরপরাহত।

ঘর অন্ধকার ছিলো।

দাদা হুট করে ঢুকে আলোটা জ্বাললো। পিছনে বৌদিও আছে।

দাদা বললো—ঘর অন্ধকার কেন রে? মাথা-ফাতা ধরেছে নাকি?

—হ্যাঁ দাদা! ভীষণ!

—তাই ত! তা'হলে নয় নৃসিংহ বাবুকেই একবার কল্ দিই। বাবা ত কিছু দেখবেন না।

অসুখে ছুঁলো কি না ছুঁলো, ডাক্তার ডাক্তার এক বাতিক মৃণালের।

মঞ্জু তাড়াতাড়ি বলে—হাঃ! অমনি নৃসিংহ বাবুকে! কেন তোমার সুন্দর রেজাল্ট করা ভালো ছেলের ওষুধ কই?

—ইস্! অমনি হিংসে হয়েছে? কেউ রেজাল্ট ভালো করেছে এটুকুও বলা চলবে না? মেয়ে জাতটাই এমনি হিংসুটে বটে!

অবোধ বালিকার দৃষ্টি ডিঙিয়ে সুমিতার সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে যায় এক সেকেণ্ডের জন্য। তারপর আবার বলে—হ্যাঁ সেই ওষুধ! সে কথা আর বলিস না! নতুন ডাক্তারদের এই একটা বাহাদুরীর লোভ আছে! এমন ওষুধের প্রেস্ক্রিপশন্ করবে যে ভারতবর্ষের বাজারে পাওয়া যাবে না। শুনলাম—ও ওষুধ এখনো এদেশে এসে পৌঁছয়নি, আসার কথা চলছে!

সুমিতা বলে ওঠে—ডাক্তাররা না শুনেছি আগে স্যাম্পল্ পায়?

—সে কি আর ওই আনকোরা ডাক্তার? যাক ওকে একবার ওষুধ অভিযানের রেজাল্টটা দেবো। দেখি কি বলে! ছেলেটার এদিকে অনেক গুণ আছে। চমৎকার ফটো তুলতে পারে। ইংরিজি কাগজে প্রবন্ধও লেখে।…বলছিলো—অমিত।

সুমিতা দুষ্টুমির হাসি হেসে বলে—ভালো ফটো তুলতে পারে? তাই নাকি? তবে একদিন নেমন্তন্ন করে ফেলো না? বলবে যে, 'তোমার বৌদির বড়ো সাধ একদিন মাংসের কারি রেঁধে তোমাকে খাওয়ান, চমৎকার রাঁধেন কি না।··· খেতে যেও, আর অমনি ক্যামেরাটাও নিয়ে যেও!'

মৃণাল হেসে উঠলো।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত প্রস্তাবটা পাশ হয়েও গেলো।—যেখানে সুমিতার ইচ্ছে!

ক্যামেরা!···

মঞ্জুরও এ জিনিসটার খুব সখ আছে, না? শুধু শেখাবার লোকের অভাবেই সখটা ব্যক্ত করে নি এতদিন! ভদ্রতার দায়ে এটুকু উপকার মানুষ মানুষের করে না?

সাধারণ ছবির কামেরায় একসঙ্গে একটি ছবিই ওঠে। কিন্তু, জীবনের স্রোত বহুমুখী।—কিশোর চেতনায় যে যৌবন-উন্মেষ, তার স্তরবিন্যাস বিচিত্র। উন্মীলিত মন বিভিন্ন সম্পদ নিজের মধ্যে আত্মসাৎ করতে চায়। জীবনের বহুবিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রেম, কামনা, গৃহ—সঙ্গে সঙ্গে মন চায় ঐশ্বর্য্য, চায় স্বপ্ন, চায় আদর্শ।

কিশোরী মঞ্জুর জীবনে ডাক্তার সুস্মিতের আগমন গতানুগতিকের ইঙ্গিত মাত্র। সুরজিতের প্রেম নিবেদন পঞ্চদশীর মনে বিতৃষ্ণার সঙ্গে নব উপলব্ধি জাগিয়েছিল। সে নূতন জগতের সীমান্তে পদার্পণ করেছে। তারপরেই 'রত্না-ললিত'।···বাসনার রহস্যাকুল সেই ক্ষণটি। দুইটি অভিজ্ঞতা অপাপবিদ্ধার কাছে মধুর লাগেনি—তিক্ততার স্বাদে তার দিনরাত্রি বিরস হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু, পুরুষাবন্ধের প্রথম সোপানে পা দিয়ে যে-মঞ্জু ললিতকে অপমানের মধ্যে তৃপ্তি পেয়েছিল—হোক না কেন সে মৌখিক অপমান—সেই মঞ্জুর জীবনের পরবর্তী অধ্যায় কি অতি সহজে ক্যামেরাধারীর লেন্স্ কবলিত হয়ে যাবে?—এত সহজে তার দিনযাত্রায় আগন্তুক যে-কোন তরুণের পদচিহ্ন পড়বে?

হ'লে ভাল হ'ত। জটিলতা বর্জনের একমাত্র উপায় গতানুগতিকে আত্মসমর্পণ। মাথায় গুণ্ঠন টেনে শঙ্খবিভূষিত পাণি অন্যের হাতে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত আলস্যে যে-পথচলা, তাই তো আজন্ম বাঙালী-কন্যার বিধিলিপি। সুতরাং একটি মধুর কাহিনীর অবতারণার সঙ্গে সঙ্গে ইতরজনের পাতে মিষ্টান্ন বিতরণ করে আমরা মঞ্জুর জীবনে ছেদ টানতে পারতাম। গতানুগতিকের গহ্বরে আকাশনীল শাড়ি-পরা মঞ্জু ডুবে যেত, জীবনে যে বক্র ও জটিল রহস্যের ছাপ পড়েছিল তার, তা-ও শেষ হয়ে যেত নিত্যকার সংসার সীমায়। মঞ্জু বিশেষ একজন হয়ে উঠেছিল যৌবনের প্রথম দাক্ষিণ্যে।—মঞ্জু হয়ে যেত সাধারণ।

কিন্তু, আমরা জানি মঞ্জুর ললাটলিপি এই নয়। আকাশনীল শাড়ি-পরা মঞ্জুর হাতে যে 'উন্মেষ'—সাহিত্যিকের প্রথম স্বপ্ন! মঞ্জু বসন্তকে অভিনন্দন জানাতে পারে শব্দের সূত্রে, মঞ্জু ছবির রং-এ মন রাঙাতে চায়। মঞ্জুর হাতে সেতারের ঝঙ্কার ওঠে।…মঞ্জু তো সাধারণের গণ্ডির একটু ঊর্ধ্বে—মঞ্জু শিল্পী।

প্রেম-বাসনা অনিবার্যভাবে মঞ্জুর চোখের সম্মুখে উদিত হয়েছে। বালিকা তরুণী হয়ে গেছে নিসংশয়ে। এখন গৃহে তার গতিসীমিত হয়ে যাওয়াটা সম্ভব ছিল হয়তো। বাইরের জগতের প্রতিঘাতে গৃহগত জীবন মঞ্জুর বিক্ষিপ্ত হয়েছিল। সহজেই আবার গৃহের গণ্ডির মধ্যে তাকে টেনে আনায় ভাগ্যবিধাতা সন্তুষ্ট নয়।…জীবনে অনেক বাঁক।…যার মনে সুর বেজেছে, সে কখনও বাঁকের আড়ালে জটিলতায় পথ হারায়!

বহু উপাদান আসে তার জীবনে। ব্যগ্রমন বহু উপকরণ সংগ্রহে তৎপর হয়। সব কিছুর সমন্বয় অবশ্যই হয়, কোন এক বিশেষ পথে চলে যায় মানুষ-মানুষী।…কিন্তু সমন্বয়ের পূর্ব-মুহূর্তগুলো!

সুমিতা সেদিন মাংসের কারি পরিবেশনের ফাঁকে ফাঁকে মধুর রস ও পরিহাসে সুস্মিতকে আপন করে নিয়েছিল। সন্থ পাশকরা ডাক্তার, এখনও পেশাদার হয়ে যেতে পারে নি। ক্যামেরা নিয়ে ছবি তোলাতে প্রচুর সময় দিতে বাধে নি তার। পঞ্চদশী থেকে ষোড়শীতে সবে উত্তীর্ণা হয়েছে মঞ্জু,…সুন্দর মুখে লজ্জার লাবণ্য সবে দেখা দিয়েছে। এমন একটি মুখ ক্যামেরায় বারবার আবদ্ধ করা ডাক্তারের পক্ষে লোভনীয় ব্যাপার বলেই মনে হচ্ছিল। সুমিতার আদর যত্নের মধ্যেও আন্তরিকতার স্পর্শ…দিনটি সুস্মিতের চমৎকার কাটলো।

ছবি তোলা শিক্ষার ইচ্ছা লজ্জায় শেষ পর্যন্ত মঞ্জু বলতে পারে নি। কি জানি, সুস্মিত যদি তাকে গায়ে-পড়া মেয়ে বলে মনে করে? যদি সুস্মিত ভাবে, ছবি তোলার ইচ্ছা কেবল সুস্মিতের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হ'বার ইচ্ছা?

আগে এ রকম দ্বিধা মঞ্জুর মনে কখনই উদয় হয়নি। কিন্তু, সুরজিতের লোভ, রত্না-ললিতের অসংযম তাকে পুরুষ ও নারীর গূঢ়তম সম্পর্ক বিষয়ে অবহিত করেছে। সে-মনের ওপর অভিজ্ঞতার ছাপ পড়ে গেছে, সে-মন আর সহজ সরল নয়।

দিনগুলো মন্থর কোন্ আশায়? আকাশ যেন একটু বেশী নীল, বাতাস অধিকতর সুখস্পর্শ।…তেতলার সিঁড়ির বুকে হয়তো পদধ্বনি এখনি বেজে উঠবে।…পাঁচনম্বর ফ্ল্যাটের কড়া নেড়ে যাবে অধীর আগ্রহে কারুর হাত…আস্তে দরজা খুলে যাবে। সদানন্দ রোডের লাল বাড়ির কোন এক গৃহে মূর্তিমান্ বসন্তের আবির্ভাব হ'বে।…সে কে?

লাজুক—অপ্রতিভ মুখ। হাসির আলোয় অপ্রতিভ ভাব কেটে গেছে। লজ্জাও ধুয়ে গেছে বিদ্যুতের মত বাসনা-শিখায়। বৌদির হাসি, মায়ের যত্ন, সব কিছুর পিছনেই যেন কোন পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা।

আজকাল মঞ্জু লক্ষ্য করে মা যেন তাকে একটু বেশী বেশী যত্ন করছেন। আগের যত্ন এখনকার যত্ন অনেকটা পৃথক। আগে রৌদ্রে বার হ'লে শোনা যেত: শরীর খারাপ হ'বে। এখন শোনা যায়: রং কালো হয়ে যাবে।...একটা দু'টো ছোটখাটো গয়না গড়ানোর মধ্যে, বিশেষ ধরণের শাড়ি কেনার মধ্যে কিসের আশা মায়ের প্রচ্ছন্ন থাকে? দাদা-বৌদি দু'জনেই যেন মঞ্জুর বিষয়ে সজাগ অনেকটা বেশী। বাবাও আগের মত সমাদরমিশ্রিত তাচ্ছিল্যে মঞ্জুকে ছোট করে রাখছেন না।

ডাক্তার সুস্মিত এখন রোগী দেখতে না এলেও মাঝে মাঝে কদাচিৎ আপনি আসে। এম. ডি. পরীক্ষা দেবার ইচ্ছা আছে তার। পরীক্ষার পড়া নিয়ে বিশেষ ব্যস্ত সে। মঞ্জুও প্রবেশিকা দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। বুড়ো একজন শিক্ষক তাকে পড়িয়ে যাচ্ছেন। 'উন্মেষের' কাজকর্ম এখন স্থগিতপ্রায়। সকলেই সাময়িকভাবে লেখাপড়ায় মত্ত।

কিন্তু, পরীক্ষার পরে? তখনও কি সুস্মিতের এম. ডি. পরীক্ষা শেষ হ'বে না?...হ'লেই বা কি?...কি ভাবছে মঞ্জু নিজের মনে? সরলতার মোহে সে কি ধরা দেবে সাধারণ বিবাহের গণ্ডিতে?...এত আগেই? ওই 'উন্মেষ' তার শেষ হয়ে যাবে মাত্র হস্তলিখিত খাতার শেষ পৃষ্ঠায়! মঞ্জু কি সেতার ছেড়ে হাঁড়ি ধরবে?...এত তাড়াতাড়ি!

এমনি ক'রে কিশোর মনের আলোছায়া-দিয়ে-গড়া একটি বছর কেটে গেল।

কলেজের বেঞ্চে মঞ্জুর পাশে যে বসেছে, নাম তার অচলা। প্রখর সজ্জা, অঙ্গের আভরণ ও আবরণ জন্ম তার সূচিত করে ধনীগৃহে। নীল

রং মঞ্জুর প্রিয়। কলেজের প্রথম দিনে সে একখানি নীল শাড়ি পরেছে, লাল পাড় তার। নীল মেঘের বুকে বিদ্যুৎ যেন,—এমনি একটি উপমা মঞ্জুর মাথায় উদিত হয়েছিল। কিন্তু, অচলার শাড়িও তো নীল। সে নীল রংএর নীলিমা আলাদা। অত্যন্ত উৎকৃষ্ট রেশম ভিন্ন নীলের এমন শেড্ খোলেনা। কাছে বসে দেখল মঞ্জু একই রংয়ের শাড়ির পার্থক্য কত! সেই মসৃণ সুকোমল নীলিমার কাছে মঞ্জুর শাড়ি কত কর্কশ, কত দীন। অথচ বাড়ি থেকে বা'র হবার আগে নিজের শাড়িখানা কত সৌখিন মনে হয়েছিল মঞ্জুর।

অচলা হাল্কা গোলাপী সিল্কের রুমালে মুখ মুছলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা উগ্র সৌরভ চারিদিকের বায়ুস্তর উতলা করে তুললো। উৎসবের দিনে মঞ্জুও সুমিতা বৌদির ঘর থেকে ছিটেফোঁটা পুষ্পসারে নিজের অঙ্গরাগ চর্চ্চিত করে থাকে। সেই মৃদু ভীরু সৌরভ, আর এই প্রগল্ভ আতর! নিত্যকার প্রসাধনে সুরভি ব্যবহৃত অচলার হাতে অনেকগুলো চুড়ির স্বর্ণদীপ্তি মঞ্জুর একটি মাত্র মটর-প্যাঁচ বালাকে ব্যঙ্গ করে। মঞ্জুর ঈষৎ কৃশ গৌরবর্ণ দেহে রংয়ের উজ্জ্বলতা মাতৃদত্ত এক কাপ দুধ বা কদাচিৎ সন্দেশ যতটা এনেছে, তার চেয়ে বহুগুণ উজ্জ্বলতা আনতে পেরেছে অচলার গাত্রে পিতৃগৃহের আপেল-আঙুরের থোকা। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, অপরূপ সুন্দর বেশভূষায় অচলা মঞ্জুর জগতের থেকে ভিন্ন স্তরের লোক নিঃসন্দেহে।—হঠাৎ একটা কেমন ব্যর্থতার অনুভূতিতে মলিন হয়ে গেল মঞ্জু।

সাগ্রহে প্রথম আলাপ কিন্তু করলো অচলা-ই—'তুমি কি ভাই মঞ্জুশ্রী রায়?'

'হ্যাঁ'।

'বীণাপাণি বিদ্যাপাঠ থেকে তুমিই তো মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছ!'

সপ্রশংস দৃষ্টিতে অচলা মঞ্জুর দিকে চাইলো। দ্বিতীয় বিভাগে অচলার স্থান হয়েছে, তাই মঞ্জু অচলার কাছে বিস্ময়ের বস্তু।

উভয়পক্ষের এই বিস্ময়বোধ বন্ধুত্বের সূচনা করলো সম্পূর্ণ ভিন্ন পর্যায়ের দুটি কিশোরীর মধ্যে। কলেজের অবকাশপ্রহরে মাঠের প্রাচীন জামরুল গাছের ছায়া সাক্ষী রইল প্রীতি বিনিময়ের। অচলার লেখা-পড়ায় সাহায্য করেছে মঞ্জু। অচলা নূতন জগতের স্বাদ দিয়েছে মঞ্জুকে।

একদিন অচলা মঞ্জুর হাত চেপে ধরলো, 'কাল ভাই, আমার বাড়ি তোমার চায়ের নেমন্তন্ন। মা-রা তোমার কথা শুনে তোমাকে দেখতে চান। তুমি আজ-না-কাল করে কাটিয়ে দাও। এবারে আমি ছাড়ব না। কাল কলেজের পরেই আমার সঙ্গে যেতে হবে। বাড়িতে বলে আসবে।'

অপরিচিত জগতের সীমানায় পদক্ষেপে কৌতূহল প্রচুর থাকলেও একটু ভীতিও তো আছে। অচলা সাগ্রহে যতবার নিমন্ত্রণ করেছে, ততবারই মঞ্জু ইতস্তত করেছে। অথচ আগ্রহের সীমা নেই। সেবারেও অবশ্য মঞ্জু ক্ষীণ আপত্তি জানালো,—'কলেজে সারাদিনের পর কি নেমন্তন্ন খাওয়া যায়!—থাক্‌না।'

হাঁ, 'তা তো থাকবেই! আমি টেনে নিয়ে যাবই।'

অগত্যা মঞ্জু মাকে বলে রাজী করালো। অচলার গাড়ীতে কয়েকদিন বাড়ি এসেছে মঞ্জু। মা অচলাকে বেশ চিনে ফেলেছেন। সহজেই রাজী হ'লেন উনি। বরঞ্চ বললেন সাগ্রহে, 'বেশ তো যাবি বৈকি। অচলাকে ফিরতি নেমন্তন্ন একদিন অবশ্য করতে হ'বে।'

মঞ্জু আনন্দে হাততালি দিয়ে বলে উঠল, 'কি মজা! সেদিন কিন্তু বৌদির সেতার শোনাতে হ'বে।'

বৌদি তার ছাদের বেল-জুঁইএর টবে নিষ্ফল জল ঢালছিল। ফুল তারা কথনই দিতে জানেনা। রথের মেলায় সস্তা দামের চারা গাছ বেঁচে যে আছে, তাই ঢের।

সুমিতা হেসে উঠলো, 'শোন কথা! আমার সেতার তোমার দাদার কানেই মধু ঢালে শুধু। তোমার বড় লোক বন্ধুর ভাল লাগবে না। কত ভাল বাজনা ও নিশ্চয় শুনেছে।'

মা শোবার ঘর থেকে মঞ্জুর তুলে-রাখা পোষাকী পেন্‌ডেণ্ট হার হাতে করে বেরিয়ে এলেন,—'কাল সকালে উঠলেই তো অফিস কলেজ এক সঙ্গে, গয়না বা'র করার সময় পাব না। এই হারছড়া আজই পরে রাখ।'

মঞ্জু বিনা বাক্যব্যয়ে আটপৌরে ক্ষয়ে-যাওয়া বিছে হার খুলে মায়ের হাতে দিল। গোটের সঙ্গে গাঁথা ঝক্‌ঝকে নূতন পেন্‌ডেণ্ট। দার্জিলিংএর লাল পাথর বসানো। অনাগত শুভদিনের আশায় মা বানিয়ে তুলে রেখেছেন। ধনী বন্ধুর বাড়ি যাওয়ার আগে নিজে শ্রীযুক্তা হওয়া সমীচীন। বৌদি সুযোগ বুঝে বললেন, 'আমার কঙ্কণ জোড়া পরে নাও মঞ্জু। বালাটার পালিশ বলে কিছু নেই আর।'

'ইস্, তোমার ওই মোটা-মোটা হাতের কঙ্কণ আমার হাতে লাগলে তো।'

সুমিতা হাসিমুখে জবাব দিল, 'ওগো সপ্তদশী আজ আর তোমার হাত, আমার হাত আলাদা নয়। পরেই দেখনা।'

বৌদির কঙ্কণ হাতে উঠল মঞ্জুর। একটু ঢল্‌ঢলে হ'লেও নেহাৎ বেমানান দেখাল না।

এখন সমস্যা পোষাক নিয়ে। সারাদিন থাকতে হবে কলেজে বিকেল চারটা পর্যন্ত। ততক্ষণে বেশভূষা শ্রীহীন হয়ে যাবে। তাছাড়া, সারাদিন কলেজে প'রে থাকার পক্ষে জমাকলো শাড়িও অশোভন

দেখাবে। মা বললেন, 'কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে মুখহাত ধুয়ে পরে গেলেই পারতিস।'

মঞ্জু বললো, 'না মা, অচলা তা'হলে আবার ওর গাড়ী দেরী করাতো। আমার ভারি লজ্জা করে।'

সুতরাং, দুইকূল বজায় রাখার চেষ্টা করাই ভাল। মা বাক্স খুলে নিজের একখানি জরিপাড় টাঙ্গাইল বা'র করে দিলেন। নূতন নীল রেশমের জামাটার সঙ্গে বেশ মানাবে। চাঁপাফুলের রং শাড়িখানার। মা রঙীন শাড়ি পরা ছেড়ে দিয়েছিলেন। বধূ ও কন্যাই তাঁর রঙীন শাড়ির মালিক। তবে বিশেষ কোন স্মৃতির জন্য আদৃত শাড়িখানি আজ পর্যন্ত তোলা ছিল। তাই তার জরি একটুও মলিন হয়নি, রং উজ্জ্বল আছে।

আসন্ন আনন্দ যেন শাড়ির পাটে পাটে ছড়ানো। মঞ্জুর আনন্দের পাত্র পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

কলেজ যাবার আগে সুসজ্জিতা মঞ্জুর দিকে চেয়ে চেয়ে সুমিতা বাঁকা হাসির সঙ্গে রসিকতা করলো,—'মহারাণী, মালঞ্চের মালাকর যদি এই রূপে দেখত!…আহা, ডাক্তার মানুষ, তায় পরীক্ষার পড়া।…সময় পান না।'

মঞ্জুর মুখ লাল হ'য়ে উঠলো। আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে হয়তো এতক্ষণ তার অবচেতন মন এই কামনাই করছিল। বৌদির রসনায় সেই কামনাই ভাষা পেয়েছে।

'কি যে বল, বৌদি।'

'ঠিক কথাই বলি।' সুমিতা এক লাইন গান গেয়ে উঠলো,—

"এপারে মুখর হ'ল কেকা ঐ
ওপারে নীরব কেন কুহু হায়।"

'আরে ছি ছি, বৌদি। তোমার হ'ল কি!'

'আচ্ছা তা'হলে আবার রবীন্দ্রনাথ—'

"কোন সে ভিখারী হায়রে,
এল আমারি এ অঙ্গন দ্বারে,
তাই সব মম ধনজন মাগিল রে,
আজি মর্মর ধ্বনি কেন জাগিল রে।"

কই, এমন বাসর ঘরের রসিকতা বৌদি আগে তো কখনও করেনি? কিন্তু,—লজ্জা পেলেও অপ্রভিত হচ্ছেনা তো মঞ্জু? ভালো লাগছে তার।...সামনের আয়নার বুকে ছায়া পড়েছে যার, সে আর কিশোরী নয়, সে তরুণী।

অচলার বাড়ি কখনও দেখেনি মঞ্জু। গেটের মধ্য দিয়ে প্রাচীরঘেরা বাঁধানো উঠানে গাড়ী থেকে নামলো দু'জনে। সরু রাস্তার বুকে বনেদী সেকালের বাড়ি। একপাশে সারিসারি মোটরের আস্তাবল। ঝক্‌ঝকে গাড়ীর বনেট দেখা যাচ্ছে বন্ধ দরজার ফাঁকে ফাঁকে। অন্যপাশে চাকরদের আলাদা একতলা সরু বাড়ি চলে গেছে। মধ্যে নানারকম ফুলের গোল কেয়ারীর চূড়ায় তীর-ধনুক হাতে মর্মরের বিলিতি কিউপিড মূর্তি। সামনের সিঁড়ি দিয়ে উঠে সাদা-কালো মার্বেলের বারান্দা কেটে দোতালার সিঁড়ি গেছে সাদা পাথরের। অচলার পায়ের শব্দে নীচের বারান্দার পাশ থেকে বেয়ারা ছুটে এলো বইএর বোঝা হাত থেকে নিতে। মঞ্জুর বইখাতা অচলা তারই হাতে তুলে দিল—অচলার পড়ার ঘরে চালান হয়ে গেল।

সিঁড়ি বেয়ে উঠল তারা প্রকাণ্ড চাতালে, অয়েলপেন্টিং আর দেয়ালগিরি দিয়ে সাজানো। চাতাল দিয়ে অনেকগুলো ঘর টানাটানি ভাবে চলে গেছে। বড় বড় মেহগিনি দরজার ফাঁকে ফাঁকে সোফা-চেয়ার

সাজানো। একটা দরজার কারুকার্যখচিত পরদা তুলে অচলা তাকে বসালো সাজানো বসবার ঘরে।

'এখানে একটু বোস মঞ্জু, মাকে ডাকি।'

অচলা বড়লোক সত্য—জানতো মঞ্জু। কিন্তু, বড়লোকীর রূপটা এমন জানতো না। এতটা সে তো আশা করেনি, এতটা সে ভাবতে পারে নি।

সিনেমায় দেখা ছাড়া জীবনে ঐশ্বর্যের এমন রূপ মঞ্জুর কিশোর মনের ধারণায় ছিল না। প্রকাণ্ড চেষ্টারফিল্ডের গদিতে ডুবে যেতে অস্বস্তি বোধ হ'ল মঞ্জুর। এত নরম আসনে সে আগে বসেনি। স্প্রিঙের আরামে ডুবন্ত শরীর, পা উঠে এসেছে পারসিক গালিচা থেকে। কেমন যেন অসুবিধা হয়।

নকল অগ্নিকুণ্ডের ওপরে ম্যাণ্টল্‌প্লেসে ড্রেসডেন চায়নার কৃষাণী সাজানো, রাক্ষুসে শামুক, রূপোর ফ্রেমে আলোকচিত্র। দুইপাশে দুটো মার্বেলের প্রতিমূর্তি আলো হাতে। দেওয়ালে তিব্বতী ওয়ালপ্লেট। মার্বেলের টেবিলে রূপোর ফুলদানী। একপাশে পিয়ানো। ড্যামাস্ক-পরদা, আলোর বাহার।...ঘরটি যেন মঞ্জুর জীবনে আকস্মিক আবির্ভাব এমন ঘরও জগতে আছে!

মঞ্জুর জীবনের সমস্ত সুর আচ্ছন্ন করে অচলার ঐশ্বর্যময় পটভূমিকা বিনিদ্র রাহুর মত জেগে উঠলো।...'উন্মেষের' পাতার পাতায় নববসন্তের ছবি,...সুরজিতের রং...প্রশান্তর রেখা,...বৌদির সেতার,—কিছুই যেন এত মনোহর নয়! তারা সকলেই সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পরাস্ত হ'ল।...আধো-অন্ধকারের শীতলতার মধ্যে মঞ্জুর জীবনে নবীন সুর যোজিত হয়ে গেল।

অচলা মায়ের সঙ্গে প্রবেশ করলো। এই সাদা মর্মরমূর্তির মতই গাত্রবর্ণ তাঁর। প্রৌঢ়ত্ব ও মাতৃত্ব যৌবনের শাণিত দীপ্তি কোমল করেছে। স্বভাবরক্ত অধরে হাসি বাৎসল্যের রসসিক্ত।

'এই, তোদের সেরা মেয়ে? বেশ।...থাক, থাক মা।' পায়ের কাছে লুণ্ঠিত মঞ্জুকে তুলে ধরলেন তিনি।

'অনেকদিন থেকেই সাধ ছিল খুকুর, তোমাকে বাড়ি আনে। তা খুকু, তোরা কলেজ থেকে ফিরেছিস। চা-টা খেতে খেতেই গল্প করা যাক। মঞ্জু নিশ্চয় মুখহাত ধোবে।'

'হ্যাঁ, ওকে বরঞ্চ আমার বাথরুমে নিয়ে যাই। এস মঞ্জু।'

অচলা মঞ্জুর হাত ধরে টেনে বারান্দার অপরপ্রান্তের ঘরে ঢুকলো। প্রকাণ্ড বড় ঘর, খাটে সাদা সূক্ষ্ম মশারী এখনই ফেলা আছে। ওপরে পাখা। নীচে কার্পেট বিছানো। এপাশে আর একটি পাখার নীচে একখানি বিশাল কাউচ, পাশে ফুল সাজানো। লম্বা ড্রয়ারের মাথায়ও ফুলের পুনরাবৃত্তি হয়েছে।

একজোড়া নরম চটি মঞ্জুর পায়ের কাছে ধরে দিয়ে অচলা মঞ্জুকে ঘরের সঙ্গে লাগাও বাথরুম দেখিয়ে দিল, পাশে ছোট ড্রেসিংরুম। প্রত্যেকের জন্য আলাদা বাথরুম। মঞ্জুর তিনখানি ফ্লাটের সম্পূর্ণটা অচলার শোবার ঘরের পরিধিতে ধরানো যায়।

বাথরুমে বাথটাবের পাশে আলনা থেকে একখানা তোয়ালে নিয়ে কোনমতে ঝক্‌ঝকে বেসিনে হাতমুখ ধুয়ে ফেললো মঞ্জু। আয়নার সামনে সরু কাঁচের তাকে কতরকম তেল, সাবান, বাথসল্ট ইত্যাদি। এই অচলাকে প্রতি-নিমন্ত্রণে নিজের ফ্লাটবাড়ির তিনখানা ঘরে নিয়ে যাবে ভেবেছিল মঞ্জু! কি করে সে অচলাকে সমকক্ষ ভাবতে পেরেছিল?

নিজের ঘরকে আজ সকালেও কত সুন্দর মনে হয়েছিল মঞ্জুর। শান্তিনিকেতনী পর্দায় আবৃত সাজানো ছোট ঘর। 'উন্মেষ' সম্পাদিকার দপ্তর—টেবিল, চেয়ার, বইখাতা কত ভাল লেগেছিল ওর নিজের চোখে। সে চোখ তখনও অচলার ঘরখানি দেখেনি কি না!

আস্তে তোয়ালেটি গুছিয়ে রাখলো মঞ্জু। ছোট একটি পাখাও

আছে সিলিংএ আঁটা। কাঁচের জানালার অর্ধেক ঢাকা ফুলতোলা পর্দায়। ওজন নেবার যন্ত্র একটা রাখা আছে।…যদি বাথরুমের এত বাহার, শোবার বা বসবার ঘর তো অমন হবেই।

ড্রেসিংরুমে ড্রেসিংটেবিলের সামনে টুলে বসে পড়লো মঞ্জু। এত সব প্রসাধনের দরকার আছে কি ছাত্রীজীবনে? তবু কি সুন্দর পাত্রগুলো, হাতের তেলোয় পাউডার ঢেলে সন্তর্পণে একটু মুখে ছোঁয়ালো।…এই আয়নায় মঞ্জু যেন বেমানান। কেমন নিষ্প্রভ-দীন লাগছে ওকে। সকালে কলেজে আসবার আগে মঞ্জুর আয়নার তরুণী যেন হারিয়ে গেল এ-বাড়ির আয়নায়।

মঞ্জু কাপড়খানা ঝেড়ে পড়লো। মায়ের বুদ্ধি নিয়ে কলেজের পর বাড়ি হয়ে সুসজ্জিত অবস্থায় আসাই উচিত ছিল। যত বাঁচিয়ে চলুক না কেন, কাপড়খানা অগোছালো হয়ে গেছে। এই সাজ মঞ্জুর বাড়ির পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু এ বাড়ির পক্ষে যথেষ্ট নয়।

বসবার ঘরে চায়ের সামনে বসবামাত্র মঞ্জুর আবার এ ধারণা স্বীকৃত হ'ল। বাসন্তী রংয়ের শাড়ির জরিপাড় মায়ের হাতে যতটা উজ্জ্বল দেখিয়েছিল, এখানে ততটাই মলিন দেখালো। অচলার কাকীমা একখানা সাদা শান্তিপুরী শাড়ি পরে এসেছেন। তার জরির দিকে তাকিয়ে চোখ ঝলসে যায়। অচলার খুড়তুতো বিবাহিত বোন এখন এখানে আছে। তার আটপৌরে শাড়ির মত পোষাকী শাড়িও মঞ্জুর একখানা নেই। অচলা ভাল ভাল শাড়ি প'রে কলেজে যেত। কিন্তু, তাদের বাড়ির সাজটাও কি এত জমকালো?

অচলার মা প্রকাণ্ড গোল টেবিলের ধারে চায়ের পাত্র বিতরণ করতে লাগলেন। রূপোর চায়ের পট, চিনিদানী, দুধের জাগ, চিনি তোলার চামচ ইত্যাদি। নীলাভ ছবি আঁকা চায়ের পাত্র পাতলা ডিমের খোলার মত। ঘরে তৈরি সন্দেশ, কেক, মাংসের কাবাব, কড়াইশুঁটির কচুরী,

মাছের সিঙারা।—খাবারগুলো মঞ্জুর জিহ্বায় অপরিচয়ের স্বাদ বহন করে আনলো। এই ধরণের রান্না-খাবার মঞ্জু আগে কখনও আস্বাদ করেনি। বড়লোকের বাড়ির খাদ্য আর মধ্যবিত্ত ঘরের খাদ্য বাইরে একজাতীয় হলেও জাত-ই আলাদা।

বৌদির নূতন কঙ্কণপরা নিজের হাত দু'খানিকে কত সজ্জিত মনে হয়েছিল মঞ্জুর। অচলার মায়ের বিশ ভরির চুড়ি-বালা পরা হাত চায়ের কাপ ধরে এগিয়ে এল। হাত বাড়িয়ে চায়ের পাত্র নিতে যেয়ে মঞ্জু দেখলো বৌদির কঙ্কন কত ক্ষীণজীবী, কত কম সোনায় কত কষ্টে গড়া। অচলার খুড়তুতো বোন উশ্রীর হাতেও অবশ্য একজোড়া কঙ্কন আছে, তার কারুকার্য ও গঠনই আলাদা। অচলাকে এই দলে যেন কেমন অপরিচিত বোধ হচ্ছে। অচলাও এদের-ই একজন।···কিন্তু, অচলাকে যে সহ্য হয়ে গেছে মঞ্জুর।···অচলা যে বন্ধু হয়ে গেছে। এদের সঙ্গে দূরত্বের ব্যবধানে কোন্ সেতু মঞ্জু বাঁধবে ?

উশ্রী কেমন যেন কটাক্ষ করে মঞ্জুকে দেখছে।—মঞ্জুর যে সাজ মা বৌদির কাছে যথেষ্ট মনে হয়েছিল, সে সাজ এখানে কত সাধারণ। পুরণো বাসন্তী রং শাড়ির খোল কি এত জ্যাল্‌জেলেই ছিল ? না, এখানকার বস্ত্র-উৎকর্ষের কাছে এমনি দেখাচ্ছে ?

অচলার কাকীমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় থাক তুমি ?'

মঞ্জু সদানন্দ রোডের নাম করলে তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, 'কলেজ তো দূরে। যাতায়াতের অসুবিধা হয় না ?'

মঞ্জু সাগ্রহে উত্তর দিল, 'না, আমাদের রাস্তা থেকে একটু দূরেই বাস। উঠে বসলেই কলেজের সামনেই নামা যায়। আবার ছুটি হলেই ইচ্ছামত ফিরে আসতে পারি। বাড়ির কাছে বাস থাকায় খুব সুবিধা হয়েছে।'

এতক্ষণে এই বনেদী বাড়ির পরিবারের কাছে একটা কোন কথা

বলতে পেরে মঞ্জু স্বচ্ছন্দে কথা বলে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা নীরবতা অনুভব করে সচকিত হয়ে পরমুহূর্তে বুঝতে পারল।

মেয়েদের সাধারণ বাসে চলাফেরা এঁদের কাছে হীনতাজনক। 'তায় একা-একা। সুতরাং এঁরা অস্বস্তি বোধ করছেন। মঞ্জুর কাছে এঁরা অপরিচিতের ভীতি নিয়ে যতটা দুর্বোধ্য, মঞ্জুও এঁদের কাছে ততটাই অপরিচিত।

ঊশ্রী নীরবতা ভঙ্গ করলো,—'শুনেছিলাম মঞ্জু ভাল গান গায়, একটা গান হোক না। তুমি কোন্ ওস্তাদের কাছে শেখ, ভাই?' এবারে মঞ্জু মাথা নামিয়ে বললো, 'ওস্তাদ আমার নেই। আমি সপ্তাহে দু'দিন একটা গানের স্কুলে গান শিখি।'

ঊশ্রীর ভদ্রতাসূচক হাসি ঢেকে অচলার মা বললেন, 'একটা গান গাওনা, মঞ্জু। তুমি বোধ হয় পিয়ানো বাজাও না। ওই যে অর্গান।'

বিরাট বৃহৎ অর্গান। মঞ্জুর অর্গান বাজানো অভ্যাস নেই। বীণাপাণি বিদ্যাপাঠের চৌহদ্দির মধ্যে অর্গানের স্থান ছিলনা। সুতরাং ভয়ে ভয়ে মঞ্জুকে বলতে হ'ল, 'আমি অর্গানে গান গাই না।'

অচলা বলে উঠলো, 'তুমি একহাত দিয়ে বক্স্-হারমোনিয়ামের মত করে বাজাও না। নইলে, কাকার মহাল থেকে বক্স্ আনাতে হয়।' কাকীমা বললেন, 'আমাদের স্বাওরের সব রকম যন্ত্রের সখ আছে। গানবাজনা নিয়ে দিনরাত কাটে ওর।—তা অচলা যা বলছে, তাই করনা, মঞ্জু।'

অগত্যা সেই বিরাট অর্গানের সামনে চক্রাকার চামড়ার আসনে বসে বিপদগ্রস্ত হ'ল মঞ্জু। বন্ধুদের বাড়ি কখনও অর্গান দেখা ও সখ করে বাজানো ঘটলেও এমন অর্গানের চেহারা মঞ্জু আগে দেখেনি। দু'ধারে বাতিদান, মন্দিরের মত আকার। অতিকষ্টে কেবল মাথা খাটিয়ে

মঞ্জু কোন মতে একহাতে কাজ চালানো সুরের ঠেকা দিয়ে একখানা রবীন্দ্রসংগীত গাইলো।

মঞ্জুর আনাড়িপনায় এ বাড়ির লোকেদের মনোভাব যাই হোক, মৌখিক ভদ্রতা ও সমাদরে তাঁদের আভিজাত্যের ত্রুটি তাঁরা রাখলেন না। অচলা বাড়ির ছোট মেয়ে। তার বন্ধুকে তাঁরা যতই অপাংক্তেয় ভাবেন, প্রকাশ না করে ভাবনাকে চাপা দেবার জন্য তাঁরা সমাদরের আতিশয্য দেখালেন।

অচলা গীটার বাজায়। সে গীটারে ইংরেজি বাংলা দুই সুরই শোনাল। তারপরেই লাফিয়ে উঠে মঞ্জুর হাত ধরে টানলো, 'এখন আমরা একটু নিজের ঘরে গল্প করতে যাচ্ছি। আইসক্রীম ওখানেই পাঠিও।'

ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে। কাউচে মঞ্জুকে বসিয়ে অচলা মস্ত অ্যালবাম খুললো।

'ভাই মঞ্জু, এসো আমার পরিবারের সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ধরে নাও এঁরা ছবি নন, সত্যি মানুষ।...এই যে বাবা। এই উশ্রীদির বাবা, বড় কাকা আমার। উশ্রীদির স্বামী আই. সি. এস—এই তাঁর ছবি। আমার ছোটকাকা আর ঠাকুরদা, ঠাকুরমা। ওঁরা দুজনে কাশীতে গেছেন—সঙ্গে গেছেন আমার বড়দা-বৌদি। এই ওঁদের ছবি। বৌদি ভাল গান গাইতে পারেন। উশ্রীদির ছোট ভাই মণ্টু এই। ভারি দুষ্টু।...এই আমার ছোড়দা, ঘোড়সওয়ারের পোষাকে। অক্সফোর্ডে আছেন। সামনের মাসে রওনা হয়ে এখানে পৌছবেন। কি মজা, না? আমি সবচেয়ে ছোড়দাকে ভালবাসি, জান মঞ্জু। ছোড়দা ফিরে এলে তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।...দেখো আমার ছোড়দা কত ভালো।'

কথার জাল আচ্ছন্ন করে একটা ক্ষীণ সুরের রেশ ভেসে এল। বড় পাকা হাতের, বড় গুণী হাতের ঝঙ্কার। মুগ্ধ মঞ্জু অ্যালবাম সরিয়ে বলে উঠলো,···'বাঃ! কি চমৎকার!'

'আমার ছোটকাকা সেতার বাজাচ্ছেন। কোন গানের সাড়া পেলেই তারপরে ওঁর সেতার বেজে ওঠে। নিশ্চয় তোমার গান উনি শুনতে পেয়েছেন।···এস না, শুনবে কাছে যেয়ে।'

বারান্দা ও থাম দিয়ে পৃথক করা কয়েকটি ঘরের সমষ্টি। আলাদা 'মহল' বললেও কাছের পাল্লা। একখানি ঘরে প্রবেশ করালো মঞ্জুকে অচলা। ঘরে কেবল মাত্র গালিচা পাতা। সারা মেঝে ঢাকা তাতেই। ওপরে মখমলের তাকিয়া। নানারূপ বাদ্যযন্ত্রে ঘর পরিপূর্ণ। আলোর দিকে পেছন ফিরে জানালার দিকে মুখ রেখে একজন সেতার বাজিয়ে চলেছেন।···অতি মৃদু নীলাভ আলোয় তাঁকে রূপকথার রাজপুত্র বলে মনে হ'ল।

দীপ্ত গৌর সৌম্যমূর্ত্তি।···তরুণ না হলেও প্রৌঢ় নন। অপরূপ রূপময় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, মুখের প্রতিটি রেখা। পাশে মুসলমান ওস্তাদের হাতে তবলায় সঙ্গত চলেছে।

স্তব্ধ মুগ্ধ মঞ্জু শুনে গেল নিখুঁত জয়জয়ন্তীর আলাপ।···এই কাকার ভাইঝিকে সে বৌদির সেতার শোনাতে চেয়েছিল!

সেই সুর সারা গৃহের নিথর রাত্রিকে বারবার আবেশে আবেগে দুলিয়ে দুলিয়ে অবশেষে নিস্তব্ধ হ'ল। অচলা ধীরে ডাকলো, 'কাকামণি!'

'কে, খুকু? এসো।'

'কাকামণি, আমার বন্ধু তোমার সেতার শুনে খুব খুশী হয়েছে। এ হচ্ছে আমাদের মঞ্জু। এর কথা তো তুমি শুনেছ।'

হাতের সেতার রেখে যন্ত্রী এদিকে মুখ ঘোরালেন। নীল আলোয়

তাঁর নীলাভ চশমায় ঢাকা আকর্ণ চোখ দু'টি কত সুন্দর, মঞ্জু দেখতে পেল না। তবু মনে হ'ল জীবনে এত সুন্দর পুরুষ সে দেখেনি।...একেই সুন্দর বলে। সুন্দরের হাতে সুরসৃষ্টি।

অনেকদিনের চেনার মত তিনি বললেন, 'মঞ্জু বোস। তোমাকে তুমিই বলছি। খুকুর বন্ধু তো।...হ্যাঁ, তোমার কথা আমি ঢের শুনেছি। এত শুনেছি যে তোমাকে আমি চিনে রেখেছি। তুমিও তো সেতারী, মঞ্জু।.. একটু শোনাবে।'

লজ্জায় মঞ্জুর গালিচার বুকে মিশে যেতে ইচ্ছা হ'ল। এঁর কাছে সেতার ধরবে সে?

'কি চুপচাপ যে? একটু আগে তো মুখর ছিলে বেশ। গান শুনেছি।'

অচলা বললো, 'বাজাও না, ভাই। কাকামণির মত সমঝদার তুমি পাবে না।'

'না, না আজ থাক। আমি তো ভাল বাজাই না। আপনার কাছে বাজাতে হ'লে অভ্যাস করে আসতে হবে।'

মৃগাঙ্কমৌলির বঙ্কিম অধরে মধুর হাসি দেখা দিল,—'বেশ, কয়েকদিন পরেই দোলপূর্ণিমা। সেদিন তবে আমার আসরে তোমার নিমন্ত্রণ রইলো।'

সারাদিন রাত্রি এমন মধুর হয়ে ওঠে কেন।.. যন্ত্র শুনে, না দেখার মত রূপ দেখে? সেই ঐশ্বর্যের পটভূমিকা মঞ্জুর অনাড়ম্বর দিনে ক্রমাগত ছায়া ফেলে। সহজে তৃপ্তি, অল্পে প্রীতি চিরদিনের মত মঞ্জুর জীবন থেকে চলে যেতে চায়। ঐশ্বর্যের রূপস্বপ্ন মঞ্জুকে উদাস করে,

বিমনা করে তোলে। সুরজিতের স্থূল কামনা মিলিয়ে যায়, মিলিয়ে যায় রত্না-ললিত একটি মাধুর্যের পারাবারে।

মা বলা সত্ত্বেও অচলাকে ফিরতি নিমন্ত্রণে ডাকতে আর পারলো না মঞ্জু। রাজার দুলালীকে তার অতি সাধারণ, বিশেষত্ববর্জিত দিনযাত্রায় ডাকে সে কেমন করে? জ্ঞানবৃক্ষের ফল সে খেয়েছে ইভের মত। সঙ্কোচ এসে গেছে তার।···শুধু সে দোলপূর্ণিমার দিন গণনা করে, মনে মনে জয়জয়ন্তীর আলাপ আবার শোনে,···বারবার।

শুধু কি সেতার সমঝদারকে শোনানো, অথবা শোনা? ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু নয় শুধু,—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর রূপস্বপ্নে তরুণী তন্ময়। সুস্থ, শ্যামবর্ণ ডাক্তারের এম, ডি'র প্রস্তুতি শেষ হোক না হোক, আর কিছুই যেন এসে যায় না।···মৃগাঙ্কমৌলির ব্যক্তিত্ব ক্ষণকালের মধ্যেই কুমারীসত্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে কি? অথবা জীবনে যে ঐশ্বর্য চোখে দেখেনি মঞ্জু, সেই ঐশ্বর্য্য তাকে গ্রাস করে ফেলেছে!

নূতন সুর এই যে জীবনে বাজে, এ সুর শেষ হবে কোথায়? নিজের বাড়ির পরিবেশ ছেড়ে তরুণীর আত্মা সেই একদিনের দেখা মর্মর-প্রাসাদে পারসিক গালিচার ওপর পদক্ষেপ করতে চায়।···হাতে তার বাজে একবোঝা চুড়ি-বালা।···ঝক্‌ঝকে জড়িপাড় শাড়ির আঁচল সে কি মাথায় টেনে দিল? কার কল্যাণকামনায়?

ঘোড়সওয়ারের বেশে একজন রাজকুমার ফিরে আসছেন। হয়তো তাঁর সঙ্গেও দেখা হ'বে। কিন্তু ওই পটভূমিকায় যে কোন ব্যক্তিই ঈপ্সিত কি?···না, মৃগাঙ্কমৌলির সেতার মঞ্জুকে পাগল করেছে!

ডাক্তারের বিদেশী পোষাক, হাতের যন্ত্র বড় স্থূল, বড় সাধারণ। 'উন্মেষ'এর সম্পাদিকার মন নিত্যকার মণ্ডলী ছেড়ে আরও একটু চায়। সে ওই রূপবান পুরুষের হাতে যন্ত্রের মত বাজতে চায়। দেবতার মত

মানুষের দেখা সে পেয়েছে।—নারীর জন্মসত্ত্বের সন্ধান বুঝি এতদিনে পেল মঞ্জু!

মায়ের অকথিত আশা, বৌদির পরিহাস, নিজের আধো বিহ্বলতা একজনকে ঘিরে ধীরে ধীরে উন্মেষিত হচ্ছিল। সে স্রোতের টানে অন্যপথে চলে গেল। এখন উন্মেষ অন্যজনকে বেষ্টন করে। এই উন্মেষ সার্থক কি ব্যর্থ, মঞ্জু জানে না।

দোলপূর্ণিমা এসে গেল। সারাদিন আবীরের রংএর মাতামাতি মনকেও রাঙিয়ে গেছে। সুস্মিত পরীক্ষার পড়া ছেড়ে আসতে পারেনি, তবু সুমিতার রসালো পরিহাস বারকয়েক ননদিনীকে লক্ষ্য করে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

হাসিমুখে মঞ্জু পরিহাস সহ্য করেছে, কিন্তু মন তার পল গুণেছে। কখন সন্ধ্যা আসবে, কখন নীল আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠবে। আজকের চাঁদ নিশ্চয়ই অনেক মনোহর, অনেক স্নিগ্ধ হয়ে উঠবে। মঞ্জুর জীবনের প্রথম চন্দ্রোদয়।

সন্ধ্যায় সাজ করল মঞ্জু বহুক্ষণ ধরে যত্ন করে।···আজ নিশ্চয় ঘরে উজ্জ্বল আলো জ্বলবে।···আজ নিশ্চয় চশমার আড়ালে দুইটি চোখের দৃষ্টি সে দেখবে।···সেই চোখ দেখবে তাকে, সে দেখবে সেই চোখকে। আবক্ষ আয়নায় প্রতিফলিত হবে উভয়ের দৃষ্টি বিনিময়।

সুনীলবসনপ্রিয়া আজ কিন্তু পরলো উৎসবের রং—তার সবচেয়ে জমকালো শাড়িখানা রক্তগোলাপের মত লাল, জরির পাড় গাঁথা। দাদার বিয়েতে ননদ-পুঁটুলির শাড়ি। আবীরের লালে-লাল দিনে লালশাড়ি।

আয়নায় নিজের মুখ ভাল করে নানা ভঙ্গিতে দেখলো মঞ্জু। মৃগাঙ্কমৌলির চোখ দিয়ে নানাভাবে দেখলো নিজেকে।···না, আর কিছু

নয়। অমন গুণী, অমন ঐশ্বর্যবান, অমন সুপুরুষের সম্মুখে যাবার মত যোগ্যতা চাই তার।

আজ গাড়ী নিয়ে অচলা এসেছে। রুক্ষচুলে তার সাবান লেপনে রং-মোচনের চিহ্ন।

'বাঃ, তোমাকে আজ ভারি ভাল দেখাচ্ছে, মঞ্জু।' অচলা সপ্রশংস ভাবে বললো।

শাড়ির মত মঞ্জুর মুখে রক্তিমা। গাড়ী এগিয়ে চলেছে অচলার বাড়ির দিকে। মঞ্জু একটু লজ্জিত ভাবে বললো, 'আজ দোলের দিন, তাই—'

'ভাল করেছ। আমরা সবাই সন্ধ্যায় আজ লাল শাড়ি পরবো।'

মঞ্জু ভীতভাবে বললো,—'খুব বড় পার্টি না কি ?'

'না, ভাই। আজ শুধু ছোটকাকার মহলে গান-বাজনা হয়। আমরা শুনি সবাই।'

'তোমার ছোটকাকা বুঝি লাল রং পছন্দ করেন ?'

অচলা মঞ্জুর দিকে তাকালো, 'রং পছন্দ ? না।...তোমাকে ছোট-কাকার সম্বন্ধে একটা কথা বলা হয়নি, মঞ্জু।'

'কি ? কি কথা ?' মঞ্জু রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলো।

'—আমার ছোটকাকা অন্ধ !'

অচলাদের বাড়ি থেকে ফিরে আসার পর মঞ্জু কী রকম আলাদা ধরণের মেয়ে হয়ে গেল যেন। একটা দিনের মধ্যে তার বয়স যেন বেড়ে গেছে পাঁচ-সাত বছর। অনেক সে যেন বুঝতে শিখে গেছে। অনেক কিছু জেনে ফেলেছে যেন মঞ্জুশ্রী।

তার জীবন আরম্ভ হয়েছিল কী ভাবে, সে কথা তার মনে নেই।

শৈশবের এমন কোনো ঘটনার কথা মনে পড়ে না তার যা স্মরণ করলে আনন্দ পাওয়া যেতে পারে, কিংবা ব্যথায় বুক ভার হয়ে উঠতে পারে। বলতে গেলে, তার জীবনের স্মরণীয় প্রথম ঘটনা 'উন্মেষ'এর সম্পাদিকা হওয়াটাই।

কিন্তু কোন্ খাদে এখন বয়ে চলেছে তার জীবন? কেবল চমকের পর চমক? তার জীবন কি তবে উপন্যাসের কোনো উপকরণ দিয়ে তৈরি নয়? তার জীবন কি রোমাঞ্চকর নাটকের এক-একটা অঙ্ক দিয়ে তৈরি?

কোথায় ছিল সে, সেখান থেকে কোন্‌খানে গড়িয়ে এসে আজ তার জীবন দাঁড়াল কোন্ মোহানায়?…দুঃখই হয় তার, হাসিই পায়। কোন্‌খান থেকে উড়ে এল ললিত, কোথা থেকে এসে হাজির হল অন্ধ মৃগাঙ্কমৌলি। তারা তো এল, কিন্তু এতে লাভ হল কী মঞ্জুশ্রীর? তার জীবনের সঙ্গে এদের যোগ কতটুকু? পৃথিবীতে কত অঘটন আর কত দুর্ঘটনা ঘটছে, মঞ্জুর জীবনের সঙ্গে সেই সব ঘটনা জুড়ে দিলে কি তার জীবন আরো জীবন্ত হয়ে উঠবে?…কী জানি!

অন্ধকার ঘরে চুপচাপ শুয়ে মঞ্জু ঠোঁট ওলটাল, নিজের প্রশ্নেরই নিজে জবাব দিল যেন,…কী জানি!

বৌদি ঘরে ঢুকে সুইচ টিপতেই মঞ্জু ব'লে উঠল, 'উঃ, আলো জ্বাললে কেন?'

—'কেন? হয়েছে কি?'

—'চোখ জ্বালা করছে। ফাগ গেছে চোখে।'

সুমিতা হেসে উঠল, বলল, 'বলতে হয়।…কে দিল ভাই ফাগ এই পদ্ম-পলাশ-চোখে—'

—'যাও বৌদি। ইয়ার্কি ক'রো না।' মঞ্জু পাশ ফিরে শুল।

আরো অনেক রসিকতা করার ইচ্ছে ছিল সুমিতার, কিন্তু সুবিধে

হল না। বৌদি বললেন, 'বন্ধুর বাড়িতে কি রকম আমোদ-আহ্লাদ হল, একটু শুনব না?'

—'এখন না বৌদি। পরে শুনো। আমার চোখ জ্বলে যাচ্ছে।'

বৌদি বললেন, 'বটে। আমাদেরও পেটে যে ফায়ার জ্বলছে ভাই। তুমি খাবে কি না ভাই বল, আমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে নিতে পারি তাহলে।'

—'সেরে নাও। আমি খেয়ে এসেছি, অনেক খেয়েছি। কাল সব বলব।'

আলোটা নিবিয়ে দিয়ে বৌদি চলে গেলেন।

মা বাবা কিংবা দাদা কেউ আর বিরক্ত করতে এল না মঞ্জুকে।

গুণে মোহিত হতে মঞ্জু রাজি আছে, কিন্তু রূপে মুগ্ধ হওয়া তো তার জীবনের আকাঙ্ক্ষা নয়, উদ্দেশ্যও নয়। অথচ, হঠাৎ যেন মন তার অজ্ঞাতেই কেমন ভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিল—মৃগাঙ্কমৌলির কথা চিন্তা ক'রে সে পড়েছিল একটা রক্তরাঙা শাড়ি। মনের এই অধঃপতনের পুরস্কার পেয়েছে মঞ্জুশ্রী। শাড়ি দিয়ে আর সাজ দিয়ে পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গেলে এইভাবে আঘাতই পেতে হয়। ইতিমধ্যে মঞ্জু নিজেকে শুধরে নিয়েছে। দেহের লাবণ্য কিংবা মনের কমনীয়তা যদি না থাকে তাহলে স্থূলভাবে নিজেকে সাজিয়ে তুললেই পুরুষকে হাত করা যায় না। ওভাবে নিজেকে বিজ্ঞাপিত করতে গেলে পদে পদে অবহেলাই কুড়িয়ে বেড়াতে হয়। মঞ্জু কী করে যেন বুঝে ফেলেছে হঠাৎ। হঠাৎ-ই তার বয়স যেন বেড়ে গেছে পাঁচ-সাত বছর,…দু-চারটি ঘটনাতেই তার জীবনের অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে বুঝি অনেক!

নিজের জীবনের উপর মঞ্জুর মমতাও বেড়ে গেছে অনেক। জীবনকে

চারদিকে এভাবে ছড়িয়ে দিলে জীবনের রং ফিকে হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে তার।···না, নিজের জীবনকে সে খোলামকুচির মত নগণ্য বলে মানতে রাজি নয়। জীবনের তার দাম আছে। 'উন্মেষ' নিয়ে কত স্বপ্নসৌধ নির্মাণ করেছে সে মনে মনে। সে-সব স্বপ্ন মিথ্যে হোক, ক্ষতি নেই। কিন্তু সে-সব সৌধ যেন গগনস্পর্শী হয়ে উঠতে পারে, এই তার আকাঙ্ক্ষা।

রাত বেড়ে চলেছে। নানা কথা ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে উঠেছে তার। তার উপর ফাগ খেলে, মাথায় সাবান দিয়ে শরীরও বড় রুক্ষ হয়েছে।···ঘুম আসছে না মঞ্জুশ্রীর।

পাশ ফিরে শুল মঞ্জু—আচ্ছা, এমন কোনো লেখক নেই, যে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে বলবে, 'মঞ্জুদেবী, তোমার জীবন-কথা লিখব আমি। এই কাগজ-কলম নিয়ে বসলাম, বলো তোমার জীবনের স্মরণীয় ঘটনা।'···মঞ্জু বলবে। সব বলবে, সব বলবে, সব বলবে। কেবল তার জীবনকে ক্লেদ আর কৃত্রিমতার ছোঁয়াচ থেকে বাঁচাবার জন্যে বাদ দেবে দুটি কথা। ললিতের কাহিনী ও অচলাদের বাড়ির ঐশ্বর্যের বর্ণনা। কী হবে ওসব কথা তার জীবনের সঙ্গে জুড়ে নিয়ে? সেই লেখক যদি আরো বলেন,—'মঞ্জুদেবী, তোমার 'উন্মেষ' তোমার জীবনের কাহিনী বুনে বুনেই এগিয়ে চলুক। সেই জীবনোপন্যাসের তুমি হবে নায়িকা, ধারাবাহিক ভাবে চলবে সেই কাহিনী 'উন্মেষ'এর পাতা ভরে ভরে। তোমার জীবনের উপকরণ পেলাম। তুমি তো নায়িকা, কিন্তু নায়ক কে জান?'—মঞ্জু জিজ্ঞাসার চোখে তাকাতেই লেখক বললেন, 'এর নায়কের নাম সুরজিৎ।···কি, পছন্দ তো নামটা?'

সারা মাথা ঝিমঝিম ক'রে উঠল মঞ্জুর, উঠে বসল সে। শরীর ভীষণ অস্থির-অস্থির করছে তার। জানলা থেকে পর্দা সরিয়ে দিল, তবু যেন হাওয়া যথেষ্ট বলে বোধ হল না। কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে

ঢকঢক করে পান করল আকণ্ঠ। চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিল। মাথায় জল দিল।

শরীর থেকে শাড়ি নামিয়ে দিয়ে মঞ্জু শুল আবার। না, আর কোনো কথা ভাবতে চায় না সে। সে চায় ঘুমতে। কিন্তু যতই কথাগুলো সরিয়ে দিতে চায় ততই তারা তার মাথার মধ্যে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে কলরব করতে আরম্ভ করে দেয়। মঞ্জু মনে মনে বলতে লাগল, 'দরকার নেই। দরকার নেই। দরকার নেই। আমার জীবনোপন্যাস লিখো না কেউ। এ জীবন আমার কাছে বড় দুঃসহ। সেই অসহ্য কথা পাঁচজনের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে সকলের জীবন দুঃসহ ক'রে তুলতে চাই নে আমি।'

আশ্চর্য। এই কচি মেয়ের জীবনে এত সহজেই এমন ক্লান্তি এসে গেল? কেন আসবে না? এর মধ্যে তার যে মনে পড়ে গেছে আর একজনের কথা। জীবন তার ছোট হতে পারে, সাধারণ হতে পারে, কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত জীবনের মধ্যেই হঠাৎ এ সঙ্গে দুঃখের অনেকগুলি উপলক্ষ্য এসে গেছে তার জীবনে। যার কথা মঞ্জুর মনে পড়েছে এখন, কই, তার জীবনোপন্যাসের সেই উৎসাহী লেখক তো একবারও তার নাম উল্লেখ করলেন না!

সুস্মিতের কথা ভাবছিল মঞ্জুশ্রী। নাঃ…আজ রাত্রে ঘুমনোর আশা সে ত্যাগ করেছে।…অনেক রাত্রিই তো ঘুমিয়ে কাটিয়েছে সে, একটা রাত্রি না হয় নির্ঘুমই কেটে যাক। ঘুমের সব চেষ্টা বর্জন ক'রে নানা কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কখন মঞ্জু ঘুমিয়ে পড়ল।

পুব দিকের জানলা দিয়ে, পাশের তেতলা বাড়ির ছাদ ডিঙিয়ে রোদ এসে পড়ল মঞ্জুর চুলে, চুল থেকে গালে। সেই তাপে ঘুম ভেঙে গেল মঞ্জুশ্রীর।

চোখ খুলেই মঞ্জুর আশ্চর্য লাগল। বৌদি চেয়ারে বসে কিসের পাতা ওল্টাচ্ছেন।

ননদিনীর ঘুম ভেঙেছে দেখে বৌদি হাসলেন, বললেন,—'মজা দেখছিলাম।'

উঠে বসল মঞ্জু, বলল,—'কি ?'

—'তোমার উন্মেষ।···কী সুন্দর লাগছিল যে তোমাকে দেখতে। জানলার পর্দা তোলা। ওদিকের বাড়ি থেকে কতজন যে দেখে গেল কে জানে!'

—ছি-ছি। মঞ্জু তাড়াতাড়ি পর্দা নামিয়ে দিয়ে বলল, 'উঃ, কী গরম গেছে কাল রাত্রে। ঘুমই আসছিল না।'

বৌদি হেসে বললেন,—'তোমার জীবনে কোকিল ডেকেছে মঞ্জু, তোমার জীবনে বসন্ত এসেছে। তোমাকে দেখে, আর তোমার পত্রিকার এই বসন্তসংখ্যা দেখে মনে হচ্ছিল—তোমাদের দুজনের কী আশ্চর্য মিল।'

মঞ্জু কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বলল, 'দাদার বুঝি আপিস নেই ? তুমি এখানে ব'সে যে আড্ডা মারছ ?'

হেসে উঠল সুমিতা, বলল, 'তারা সব কখন বেরিয়ে গেছে। বেলা কি ব'সে আছে ?'

—'এখন ক'টা ?'

—'সাড়ে ন'টা। মা-বাবা দুজনে বারণ করলেন, তাই আর সুড়সুড়ি দিয়ে জাগাই নি তোমাকে।'

—'জানলার পর্দাটাও নামিয়ে দিতে পার নি ? আশ্চর্য।'

সুমিতা হাসতে লাগল।

—'তামাশা রাখ বৌদি। তুমি ভীষণ ফাজিল হচ্ছ।—ইশ, এত বেলা হয়ে গেছে। আমার কলেজ নেই বুঝি ?'

—'সে দেখা আছে। রুটিন দেখলাম—ক্লাস সেই বেলা একটায়।

আহা হা, কাল বাসন্তী পূর্ণিমা গেছে, উৎসবে আর আহারে কী ক্লান্তটাই না তুমি হয়েছ !···একটু মায়া হবে না আমাদের ? বল কি ?'

বৌদির আর কী ! তার জীবনের বারোটা তো বেজে গেছে। আর কোনও স্বপ্নও নেই, সাধও নেই, চিন্তাও নেই, ভাবনাও নেই। কোনো জটিলতারও ধার ধারে না। কিন্তু মঞ্জু যে কী দারুণ এক মানসিক উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার মধ্যে কাল সারাটা রাত কাটিয়েছে তা যদি বৌদি জানত, তাহলে কৃত্রিম মায়া না, সত্যিকারের মায়াই হত তার। কি হবে সে আক্ষেপ ক'রে। মনের এ-কথা তো চীৎকার করে ব'লে ঘোষণা করা যায় না।

কলেজের জন্যে তৈরী হয়ে নিল মঞ্জু। সদানন্দ রোড থেকে আধা-চওড়া গলিটা পার হলেই বাস্-রুট।

রাস্তায় নেমে মঞ্জু দিক ঠিক করতে পারল না, কোন্ দিকে যাবে। গতকালের ফাগের নেশায় তার মাথা এখনো বিভোর। বৌদির ভাষায় তার জীবনে শুধু কোকিলই ডাকে নি, তার মনে বুঝি রংও ধরেছে। এ কোন্ রং ? হঠাৎ মঞ্জুর মনে পড়ে গেল সেই রঙের কথা। 'উন্মেষ'এর মলাট-চিত্রণের জন্য বাছাই করা সেই রং—যে রং একদিন লেগে গিয়েছিল তার শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে, বাহুমূলে, লেগে ছিল তার গালে।

সদানন্দ রোডের ফুটপাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে মঞ্জু ভাবতে লাগল—সে যে আজ অনেক দিনের কথা। বসন্তসংখ্যা বার করার জন্যে সেই উদ্যোগ, আর আজকের এই বসন্তকাল,···মাঝখানে কেটে গেছে আর একটা বসন্ত। প্রায় দু বছরের কথা যে হল। সত্যি, দিনগুলো বড় নির্দয়, বড় নিষ্ঠুর। এমন নির্মম ভাবে তারা কেটে যায় !

কিন্তু কোন্ দিকে যাবার জন্যে রওনা হয়ে, এ কোন্ দিকে এসে পড়ল মঞ্জুশ্রী রায় ? মাথা তুলে দেখে, মোড়ের একটা বাড়ির গায়ে রাস্তার নাম-পত্র গাঁথা—হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রীট।

সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল মঞ্জুর। কাল রাত্রের সেই উৎসাহী জীবনোপন্যাস-লেখকের।কথাটা বেজে উঠল তার কানের মধ্যে—'কি, পছন্দ তো নামটা ?'

থাক্। দ্বিধায় আর দ্বন্দ্বে কোনো দরকার নেই। মঞ্জু পা চালাল।

সেই বাড়ি।…অনেক দিন বাদে এখানে এসেছে মঞ্জু। বাড়িটার চেহারা একটু বদলেছে। অবস্থা তাহলে ইতিমধ্যে ফিরিয়ে নিয়েছে এরা।…সুধাবৌদি নিশ্চয় এখন বাড়ি নেই।…তুলি আর রং নিয়ে বিব্রত হয়ে বসে আছেন হয়তো—

মঞ্জু একটু থমকে দাঁড়ালো। কী কথা বলে আজ সে তার সম্ভাষণ জানাবে ? বাচ্চাদেরই-বা আশীর্বাদ করবে কী ব'লে। বছর দুই বাদে সে এখানে এসেছে।—কিন্তু এর মধ্যে শুধু দু' বছর নয়, পাঁচ-সাত বা তারও কিছু বেশি বয়স বেড়ে গেছে মঞ্জুর।…বড়-হওয়ার প্রথম ধাক্কায় প্রথম দিন সে কাবু হয়ে পড়েছিল, কিন্তু এখন সে অনেক বড় বড় ধাক্কা সহ্য করার শক্তিতে শক্তিমতী।

মঞ্জু কড়া নাড়ল, একবার দুবার তিনবার। কোন সাড়া পেল না। এবার মঞ্জু জোরে কড়া নাড়ল।

দরজা খুলে দাঁড়ালো একটা কচি বৌ। একে দেখেই মঞ্জুর বুকের ভিতর প্রচণ্ড একটা ধাক্কা লাগল।…কে এ ? সুধাবৌদির জায়গায় কি এ নতুন এসেছে ?

—'কাকে চাই ? বৌটি জিজ্ঞাসা করল।'

—'উনি বাসায় নেই ?'

বৌটি বলল, 'কার কথা বলছেন ?'

মঞ্জু একটা ঢোঁক গিলে বলল,—'উনি। সুরজিৎ-দা।'

—'সে আবার কে ?' বৌটি ভিতর দিকে মুখ ফিরিয়ে চাইতেই

বুড়িগোছের এক মহিলা এসে দাঁড়াল তার পাশে, জিজ্ঞাসা করল, 'কি নাম বললে?'

—'সুরজিৎ।'

—'কি জানি বাছা। ও-নামে তো আমাদের কেউ নেই।'

মঞ্জু একটু থেমে বলল, 'আপনারা বুঝি নতুন এসেছেন?'

—'তা, নতুন আর কই। এই বোশেখে এক বছর হবে।'

মঞ্জু বলল, 'তবে আমারই ভুল হয়েছে। উনি তবে উঠে গেছেন। এইখানেই থাকতেন আগে।'

—'তোমার কে হয় সে?'

মঞ্জু বলল, 'আমার ইয়ে—দাদা।'

—'আচ্ছা বোন যা হোক।' বুড়িটা শ্লেষ দিয়ে বলল, 'দাদার খোঁজ নিতে এলে এক বছর বাদে?'

মনে মনে হাসল মঞ্জু, বলল না যে, এক বছর নয়, প্রায় দু' বছর বাদে সে এসেছিল খোঁজে।

করজোড়ে নমস্কার জানিয়ে মঞ্জু ফিরতে গিয়েই আবার দাঁড়াল, বলল, 'কোথায় উঠে গেছেন তাঁরা জানেন?'

—'উঁহুঁ।'

মঞ্জু আর দাঁড়ালো না। হাতের বই-খাতা দিয়ে সূর্য আড়াল ক'রে পীচ ঢালা পথ ধরে হাঁটা দিল।

দরজা বন্ধ করতে করতে বুড়িটা মন্তব্য করল, 'ইস্কুলকলেজ কামাই করে টা টা রোদে দাদার খোঁজ করা হচ্ছে। পরিচয় জিজ্ঞেস করলে বলে—ইয়ে। ইয়েটা আবার কোন্ সম্পর্কের দাদা, কে জানে।'

কচি বৌটা শাশুড়ির মন্তব্য শুনে মুচকে হাসে।

দিন কেটে যায়। কিন্তু সুরজিতের কোনো খোঁজ মেলে না। শহর থেকে যদিই-বা সে উধাও হয়েই গিয়ে থাকে, কিন্তু মন থেকে তাকে উধাও করে দেওয়া বড় মুশকিল।

ক্লাসে অচলা পড়ার কথার চেয়ে তার কাকার কথা বলে বেশি। তার কাকার অন্ধজীবনে আলোর মশাল হাতে নিয়ে দাঁড়াতে পারে এমন একটি মেয়ে যদি পাওয়া যেত তাহলে অচলারা নাকি বাড়িসুদ্ধ সকলে খুশি হত।—একথা মন্ত্রের মত জপ করে মঞ্জুর কানের কাছে বলার মানে কি, মঞ্জু বুঝেও যেন বুঝতে চায় না। ঐশ্বর্যের প্রলোভন দেখিয়ে যদি একটা সহজ সরল অথচ বুদ্ধিমতী মেয়ে পাওয়া যায়—কে জানে, হয়তো অচলার মনের ইচ্ছে এই। কিন্তু মানুষের সব ইচ্ছা কি পূরণ হয়?

এদিকে সুস্মিতও আসে প্রায়ই। এখন সে সাধারণ একজন ডাক্তার নয়, সে একজন এম. ডি.। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সংকেত হাতে নিয়ে সে যেন মঞ্জুর দৃষ্টি আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে।

কাউকেই উপেক্ষা করার অভিলাষ নেই মঞ্জুর। কিন্তু কাউকে প্রশ্রয় দিতেও সে রাজি না।

কোথায় গেছে তারা?···হয়তো সেই অজানা নেপথ্যে ব'সে নিদারুণ দুঃখ আর দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই ক'রে চলেছে। হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রীটের ওই জীর্ণ বাড়ি যাদের ছেড়ে যেতে হয়, তাদের ভাগ্যে কোনো প্রাসাদের প্রকোষ্ঠ যে বরাদ্দ থাকে না—এটা জানা কথা। জীবনধারণের মর্মান্তিক করুণ দৃশ্য ভেসে ওঠে মঞ্জুশ্রীর চোখে।

দাদাকে সে জিজ্ঞাসা করে না। সুরজিৎ সম্বন্ধে তার মন এখন পরিষ্কার নয়, তাই এতদিন বাদে হঠাৎ এখন তার প্রসঙ্গ তুলি তুলি ক'রেও কিছুতে তুলতে পারল না।

সুধা বৌদির আপিসের নামটা মনে করার চেষ্টা করে মঞ্জু। একদিন

যেন সে শুনেছিল নামটা। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারে না। কি ক'রে আর খোঁজ নেবে মঞ্জু। অভিমানও হয় তার।...এতগুলো দিন কেটে গেছে।...সুরজিতের সেই চরম দুর্বল মুহূর্তের নাগপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে চলে এসেছিল।মঞ্জু—তার পর তার কী হ'ল, কোনো দুর্ঘটনা ঘটল কি না, একবার খোঁজও তো নিতে হ'ত সুরজিতের! খোঁজ নেওয়া কি কেবল মঞ্জুরই দায়িত্ব?

কয়েক দিন ধরে মঞ্জু নানা রকম গবেষণা করে ঠিক করল—অনেক মাসিক আর সাপ্তাহিক কাগজে সুরজিতের ছবি তো বের হ'ত, ইদানীং অবশ্য কোনো ছবি মঞ্জুর চোখে পড়েনি, সেই সব পত্রিকায় চিঠি দিলে যদি তার ঠিকানা পাওয়া যায়।

মঞ্জু এই রকম একটা চিঠি ছেড়ে কয়েকদিন ধ'রে উত্তরের প্রতীক্ষা করতে লাগল। কিন্তু কোনো জবাবই এল না। আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল মঞ্জু, এমন সময় একদিন হঠাৎ তার নামে মস্ত একটা খাম এল।

খামটা খুলেই মঞ্জু অবাক। তিন রঙা একটা অপূর্ব ছবি। ফুটন্ত ফুলের উপর এসে বসেছে একটা ঘোরকৃষ্ণ ভ্রমর। ছবির নীচে ক্যাপশন লেখা—'মঞ্জুর ছবি'।

তার মানে?·· সঙ্গের চিঠিটা পড়ল মঞ্জু। সুরজিৎ লিখেছে—'উন্মেষ'এর মলাট চিত্র পাঠালাম। আশা করি, না-মঞ্জুর হবে না। এই জন্যে ছবির ঐ নাম দিলাম। তাছাড়া, ছবিটা তোমারও বটে। যে মানেই ধর, উন্মেষের মলাটে ব্যবহার করা চাই। তোমার পত্রিকার খবর ভালো আশা করি। আমার ঠিকানা দিলাম না। মৃণালের কাছেও নিশ্চয় আমার খবর পাওনি। না পাবারই কথা, আমি এখন পলাতক।' পুনশ্চ দিয়ে লিখেছে, 'তোমার রাগ তাহলে কমেছে, একদিন দেখা হবে আশা করি।'

সুমিতা ঘরে ঢুকে বলল, 'অতবড় একটা খাম এল কিসের ?'

—'সুরজিৎদা ছবি পাঠিয়েছেন বৌদ, আমার উন্মেষের মলাটের।'

সুমিতা ছবিটা দেখল। ছবির নীচের নামটা আর পড়তে দিল না মঞ্জু।

সুমিতা বলল, 'এতদিন ডুব দিয়ে থেকে হঠাৎ তাঁর এই আবির্ভাব ? তোমার দাদা দিন-কয়েক আগে বলছিলেন এঁর কথা।'

—'কি বলছিলেন ?'

—'বলছিলেন, লোকটা বড় নাচারে পড়েছে। গা-ঢাকা দিয়েছে একেবারে। ছবির হাত বড় পাকা। কিন্তু উদ্যোগ নেই। পাঁচজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ক'রে একটা সুবিধে ক'রে নিতেও জানে না। সত্যিকারের শিল্পী হলে যা হয় আর কি !'

রাত্রে দাদা এসে খোঁজ করলেন ছবিটা, দেখে বললেন, 'ফার্ষ্ট ক্লাস। অপূর্ব ছবি।···কিন্তু আছে কোথায় ও আজকাল ?'

মঞ্জু বলল, 'কী জানি। কোনো ঠিকানা দেন নি।'

ওদের উৎসাহ এখানেই শেষ হ'য়ে গেল। কিন্তু মঞ্জুর উৎসাহে কোনো ভাঁটা নেই। তার মনের মধ্যে নতুন আলোড়ন উপস্থিত হল। দেখা হবে,···কিন্তু কবে···তার কোনো আভাস দেয় নি সুরজিৎ।

কী করে সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনা যায়, ভাবতে লাগল মঞ্জুশ্রী। 'উন্মেষ' বের করতে হবে। হাতে-লিখে বের করার কথা ভাবছে না মঞ্জু—এ কাগজ ছেপে আর পাঁচটা কাগজের পাশাপাশি দাঁড়াবার যোগ্য হতে হবে। কেবল পাশাপাশি দাঁড়ানো নয়, উন্নত শিরে দাঁড়ানো। ছেপে বের করতে হলে প্রচুর অর্থের দরকার। এবং তা যদি সম্ভব হয়, তাহলে সেই সঙ্গে একজন শিল্পীকে যাতে সেই কাগজ মানুষের মত করে বাঁচিয়ে রাখতে পারে তারও ব্যবস্থা করতে হবে।

কলেজে অচলার সঙ্গে আলাপ করতে করতে মঞ্জু কথা তুলল, বলল,

'তোমার কাকা তো একজন উঁচুদরের গাইয়ে। সাহিত্যের দিকে তাঁর টান আছে নিশ্চয়।'

—'আছে।' অচলা বলল, 'চোখ দুটো গেছে আজ বছর পাঁচ। বসন্তে। তার আগে খুব পড়াশুনা করতেন। ছোটকাকার লাইব্রেরীটা তো দেখনি! দেখার জিনিস। পড়ে পড়ে শোনাবে, এমন বৌ পেলে তো ছোটকাকা আহ্লাদে—'

মঞ্জু বলল, 'একদিন যাব দেখতে লাইব্রেরিটা।'

আশার ক্ষীণ আলো দেখতে পেল যেন মঞ্জু। তার স্বপ্ন সার্থক হবার সম্ভাবনা আছে যেন।

—'ছোটকাকা তোর গান শুনে মুগ্ধ। প্রায়ই বলে তোর কথা।' অচলা আড়চোখে চাইল মঞ্জুর দিকে।···অচলার যেন মনে হচ্ছে, মঞ্জু একটু নরম হয়েছে।

কলেজের গেট দিয়ে বেরিয়ে মঞ্জু চলেছে বাস্ ধরতে, এমন সময় অস্ফুটে কে যেন তাকে ডাকল, নাম ধরে ডাকল। মঞ্জু ফিরে চেয়েই থেমে গেল, বলল, 'কে? কে আপনি?'

—'আমি—সুরজিৎ।'

মঞ্জু বলল, 'আপনি? এ কি চেহারা হয়েছে সুরজিৎদা।···এমন হল কেন?'

—'যে জন্যে চেহারা খারাপ হয়। অসুখে আর অভাবে।'

মঞ্জু জিজ্ঞাসা করল,—'কোথায় আছেন এখন?'

—'আছি।···কলকাতাতেই আছি।'

—'চলুন। আপনার বাড়িতে আমি যাব।···না না :না, ওসব চলবে না। যেতেই হবে আমাকে।'

সুরজিৎ বলল,···'আমার সে ডেরা দেখে ভালো লাগবে না তোমার।···কষ্ট পাবে।'

—'তা হোক। চলুন।'

—'চল। কিন্তু, সুরজিৎ ধীরে ধীরে বলল, 'আমাকে—ক্ষমা করেছ তো?'

—'কিসের ক্ষমা? কেন?—কোনো অন্যায় আপনি করেন নি। আপনার ভালো লেগেছে আমাকে, তাই আমাকে জানিয়েছেন—এতে দোষ নেই। দোষ-ত্রুটির বিচার হবে এখন আমার। আমার আচরণ দিয়ে।'

বাস্-এ উঠল দুজন উল্টো রাস্তায়। শ্যামবাজারের দিকে। হাতি-বাগানের মোড়ে নেমে গ্রে স্ট্রীট ধ'রে এগিয়ে ঢুকল এক বস্তীতে। একটি স্যাৎসেঁতে ছোট ঘর।—বাচ্চা দুটো জরাজীর্ণ।

—'এখানে থেকে ছবির কাজ হবে না সুরজিৎদা। তোমার দায়িত্ব তুমি ছেড়ে দাও আমার উপর। আমার 'উন্মেষ' বেরবে, আমি হব সম্পাদিকা, তুমি হবে তার শিল্পী। সচিত্র মাসিকপত্র হয়ে বেরবে। তৈরি হয়ে নাও শিগ্‌গির।…তোমাকে বাঁচতে হবে সুরজিৎদা।…তা না হলে আমার উন্মেষেরও মৃত্যু, আমারও মৃত্যু।'

দুই চোখ ছল ছল ক'রে উঠল মঞ্জুশ্রীর। ধীরে ধীরে বলল, 'আমার কাছে আর কিছু চেয়ো না,…কিন্তু তোমার ছবি আঁকার প্রেরণা যেভাবেই চাও, তা তুমি পাবে। বৌদি আসুক। আজই মোকাবিলা ক'রে যাব।

স্থাণুর মত বসে রইল সুরজিৎ। সে যেন পেয়ে গেছে আজ সহায় সম্বল উৎসাহ উদ্দীপনা প্রেরণা—একাধারে সব।

সুধা বৌদি ফিরে ঘরের মধ্যে এই অতিথিকে দেখেই তপ্ত হয়ে উঠল, বলল,—'আবার?'

মঞ্জু উঠে এসে সুধার হাত ধ'রে বলল, 'হ্যাঁ আবার। তোমার কোনো চিন্তা নেই, ভাবনা নেই, উদ্বেগ নেই, অশান্তি নেই। নিশ্চিন্ত

হ'য়ে সুরজিৎদাকে তুমি আমার হাতে দাও···কথা দিচ্ছি—কোনো ক্ষতি হবে না তোমার।'

—'কি করতে চাও ওকে নিয়ে?'

—'বাঁচাতে চাই। শিল্পীর উন্মেষ হোক এই চাই।' মঞ্জু সুধা বৌদির হাত চেপে ধ'রে তার কাণে কাণে বলল,—'মস্ত বড়লোককে বিয়ে করছি। অগাধ টাকা। প্রচুর শখ। আমার ইচ্ছা পূরণ হবে কি, না হবে—বল বৌদি।

সেদিন মঞ্জুর হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তার এই দরমা-ঘেরা ধোঁয়া-লেগে-কালো-হ'য়ে যাওয়া ছোট্ট রান্নাঘরটিতে এসে যেন পালিয়ে বেঁচেছিল সুধা,—এইটুকু বেশ স্পষ্টই মনে আছে তার। এই সাতদিন যথারীতি সব কাজ সে করেছে। ঘরের কাজ ক'রেছে, ক্ষীণ স্বাস্থ্য ছেলে দু'টির পরিচর্যা করেছে, সুরজিৎ যখন নতুন রঙ্ গুলে নতুন কোনো ছবি আঁকার পরিকল্পনার চিন্তায় নিমগ্ন, হাতল-ভাঙা পেয়ালায় ধূমায়িত চা নীরবেই হাতের ওপর তুলে দিয়ে এসেছে সে। তারপর ক্ষ'য়ে-আসা সাবান আর ধুঁধুলের ছেঁড়া খোসাটা দিয়ে ঘ'সে ঘ'সে করতল থেকে হলুদের ছাপ যতটা তুলতে পারা যায়, তুলে ফেলে সাদা একটা ব্লাউসের ওপর সবুজ রঙের শাড়িটা প'রে অফিসে বেরিয়ে এসেছে সুধা।

টাইপ্‌রাইটারে খটাখট্ শব্দের ঝড় তুলে চিঠির পর চিঠি টাইপ্ ক'রে ক'রে নিজেকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছে অনুক্ষণ,··· আর কিছু ভাববার অবসর সে রাখতে চায় নি।—সারা দিনমান ধ'রে অফিসের টেবিলে শক্ত হ'য়ে ব'সে টাইপ মেসিনটার 'কী-

বোর্ডে' দ্রুত হাত চালিয়েছে সুধা। অবশেষে পরিশ্রান্ত চোখ দুটিতে নেমে এসেছে অন্ধকার··· দুই হাতের আঙুলগুলো আড়ষ্ট, সেই আসন্ন সন্ধ্যার মুহূর্তটিতে ট্রামের পা-দানীতে উঠে হাতলের অবলম্বন-টাকে পর্যন্ত শক্ত ক'রে ধরবার সামর্থ তার থাকৃত না!

এই বিবর্ণ বিশীর্ণ ক্লান্ত জীবন দিয়ে সে নতুন কোন্ সৃষ্টির জন্য তপস্যা করতে পারে!—তাইত সেদিন যখন মঞ্জুশ্রী ওর হাত দুটো চেপে ধ'রে সুরজিৎকে দেখিয়ে আকুল আবেগে বলেছিল 'ও শিল্পী ওকে বাঁচাতে হবে বৌদি, আমি এক বড়লোককে বিয়ে করছি, প্রচুর টাকা তার—সুরজিৎদাকে তুমি আমার হাতে দাও!···তোমার কোন ভয় নেই'!—অপরাধীর মত অস্ফুট স্বরে ব'লেছিল সুধা,··· 'হ্যাঁ, নাও, তাই নাও'!

কিন্তু পরমুহূর্তেই হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দ্রুতপায়ে ধোঁয়ায়-ধোঁয়ায় কালি-হ'য়ে যাওয়া রান্নাঘরটির মধ্যে নিঃশব্দে আত্মগোপন করল!—ঘরে ব'সে ওরা দুজনে কী কথা বলছিল, সুধার কাণে যায়নি, জানবার চেষ্টাও করেনি। ছেলেদুটিকে জলখাবার খাওয়াতে-খাওয়াতে বারে বারে অন্যমনস্ক হ'য়ে যাচ্ছিল সুধা, বারে বারে বুকের ভেতরটা যেন মোচড় দিয়ে উঠ্‌ছিল,—বারে বারেই চোখের পাতা তার উঠেছিল ভিজে···

ছোট ছেলেটা অবিকল বাপের মতোই দেখতে, বাটি থেকে চিনি-মাখা ভিজে চিঁড়ে সাগ্রহে মুখে তুলতে তুলতে এক-একবার থমকে থেমে মায়ের মুখের দিকে তাকায়! কোঁকড়ান একরাশ নরম চুল আর ঠিক সেইরকম বড় বড় চোখ! বিশ্বের বিস্ময়-জড়িত সেই দুটি চোখে যেন এই কথাই বলতে চেয়েছিল,—'কাঁদছ কেন মা অমন ক'রে?'

'এই কান্নার কথা বিশ্ব সংসারে কেউ ত বুঝবে না বাবা!'

একি, কি ভাবছে সুধা—ট্রামের পা-দানী থেকে নেমে বস্তির সেই

স্যাঁত্‌সেতে ঘরের দিকে আসতে আসতে সুধার আবার মনে জাগলো এই কথা! ভুল!···মনে বাসা বেঁধে রয়েছে সর্বক্ষণই,—এই চিন্তা তার ভেতরটাকে কুরে কুরে নিঃশেষ করছে যেন! শুধু বাইরে থেকে সেই চিন্তার বহ্নি নেভাতে চেয়েছে ব্যস্ততার চাপ দিয়ে, ভুলিয়ে রাখতে চেয়েছে নিজেকে! তবু অফিসের পরে বাড়ি ফেরার পথে রাস্তার আলোগুলো যখন একে একে জ্বলে ওঠে, ট্রাম-লাইনের মাথার ওপরের আকাশ ভ'রে যায় তারায় তারায়, অপরিসর ক্ষীণ গলিগুলো থেকে ধোঁয়ার গ্লানি উঠে দৃষ্টিপথ ঢেকে দিলেও উজ্জ্বল নক্ষত্র দুটি-একটি দেখা যায়—জ্বল জ্বল ক'রে জ্বলে।···সুধা এগিয়ে চলে···বস্তির দরজার সামনে এলেই তার তন্দ্রা যেন ছুটে যায়! ···বেদনার তরঙ্গ আবার উঠে আছ্‌ড়ে পড়তে থাকে অন্তরের তটভূমিতে!

ছেলেদুটিকে পাশের ঘরের নিঃসন্তান বউটির কাছ থেকে নিয়ে এসে আবার যথারীতি গৃহকাজে মন দেয় সুধা। ক্লান্ত অবসন্ন দেহ—মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করছে—চোখের দৃষ্টি হয়ে আসে ঝাপ্‌সা! তবু, তবুও সংসারের চাকা নিয়ম মতই ঘুরিয়ে যেতে হবে তাকে!

এখনো আসেনি সুরজিৎ ফিরে। সারাটা দিন কোথায়-কোথায় টো-টো ক'রে ঘুরে বেড়ায় কে জানে!···কাৎ-করে-রাখা ইজিচেয়ারটার পাশে ছেঁড়া কয়েকটা কাগজের টুক্‌রো, আর তার ওপর নীল-রঙ্‌-গোলা বাটিটা উল্‌টে পড়ে গিয়ে কাগজের টুক্‌রো আর ঘরের মেঝের কিছুটা জুড়ে নীল হয়ে আছে! একখানা বড়ো কাগজের প্রান্ত তাকের ওপর থেকে ঝুলছে--মোটা বইটা ওপরে চাপা না থাকলে ওটিও নিচে পড়ে গিয়ে নীলে-নীল হয়ে যেত! এগিয়ে গিয়ে কাগজটা হাতে তুলে নিলো সুধা,—কয়েকটা নীল রঙের আঁচড়, কোথাও ফিকে—কোথাও গাঢ়,—কোথাও রেখা

সমান্তরাল, কোথাও ঢেউ খেলানো !···কী-একটা ছবি আঁকতে গিয়ে যেন আর আঁকে নি।···কীসের ছবি ?

মনে হচ্ছে—সমুদ্র। দিগন্তবিশারী সমুদ্রের ক্রন্দন! বেদনায় নীল হয়ে যাওয়া আর্ত আকুতি যেন কার!···সেই যে একবার তরুণী বয়সে রেলের পাশ পেয়ে বাবা তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন পুরীতে,—সেই পুরীর সমুদ্রই কি আজ তবে সুরজিতের তুলিতে সজীব হয়ে উঠছিল ?···

বাবার কথা আজ খুব বেশী করেই মনে পড়ছে সুধার। আশ্চর্য, বাবাও ত বেঁচে থাকতে পারতেন কিছুদিন! কি-ই-বা এমন বয়স হয়েছিল তাঁর! মা-হারা একমাত্র মেয়েকে বুকে-পিঠে করে মানুষ করে হঠাৎ একদিন স'রে গেলেন, একেবারে নিঃশব্দে বলা যায়। চির-দরিদ্র রেলের কেরাণী, কিন্তু ভিতরে ভিতরে লেখাপড়ার সখ ছিল খুব বেশী—আর সখ ছিল বেড়াবার। পাশ পেয়ে দূরে যাওয়া ত ছিলই, ছুটির দিনেও কাছে-পিঠে না ঘুরে বেড়ালে স্বস্তিই যেন পেতেন না বাবা। আর্থিক দৈন্য খুব বেশী-ই ছিল তবু মেয়েকে তৈরি করতে চেয়েছিলেন মনের মতো করে, পড়িয়ে ছিলেন কলেজ পর্যন্ত। আর দুটো বছর প'ড়ে বি-এটা পাশ করতে পারলে আজ হয়ত অফিসে প্রমোশন পাবার একটা সুবিধাই তার হয়ে যেতো, কিন্তু আই-এ পরীক্ষার পর বাবার সংগে পুরীতে বেড়াতে যাওয়াই হলো তার কাল!

প্রথম তিনদিন কাটলো ধর্মশালায়, তারপরে এক পাণ্ডার বাড়ির ঘর ভাড়া করে। সকালে আর বিকেলে সমুদ্রের তীরে বেড়ানো বাবার সংগে। সে কি অনাস্বাদিত আনন্দ!

বেশ মনে পড়ছে সেই দিনটির কথা, বাবা যেদিন প্রথম নিয়ে এলেন সুরজিৎকে বাড়িতে ধরে। চায়ের দোকানে বসে ক্ষণিক আলাপেই বাবা মুগ্ধ হয়েছিলেন। কেউ কোথাও নেই, বাউণ্ডুলে বলা চলে—অন্যমনস্ক প্রকৃতির যেন। আহার ও শয়নের নির্দিষ্ট কোন আস্তানা নেই। বাবা পাণ্ডা ঠাকুরকে অনেক বলে ছোট্ট একটা ঘর সামান্য ভাড়ায় ঠিক করে দিলেন ওর থাকবার জন্য। বাড়ির অবস্থা নাকি মন্দ নয়, কলকাতায় বেহালা-অঞ্চলে নিজস্ব বাড়ি। মা নেই। মায়ের প্রসঙ্গ উঠলেই ওর চোখের পাতা ভারি হয়ে আসত।···বনিবনা হয়নি বাপের সংগে মায়ের। শেষ পর্যন্ত উন্মাদ হয়ে যান মা। সেই অবস্থাতেই মারা গেলেন জলে ডুবে। সুধা তন্ময় হয়ে যেত ওর মায়ের কাহিনী শুনতে শুনতে। বড়ো-বড়ো চোখ দুটি যেন কোন্ সুদূর স্বপ্নলোকে বিচরণ করত!

মায়ের প্রসঙ্গ উঠলে থামতে চায় না সুরজিৎ, বলে, 'মা বল্‌তেন খোকা, তুই শিল্পী হবি, যা কিছু দেখবি এঁকে রাখিস···তুলিতে তোর ধরে রাখিস সংসারে যা কিছু ঘটছে···জীবনের চলার পথে হারিয়ে না যায়, এমনি আরো কত কি।' সুধা নিবিড় বিস্ময়ে শোনে, চোখের তার পলক পড়েনা! কেমন এক করুণায় দুটি বিন্দু জলও চিক্ চিক্ করে চোখের কোণে!

বালুবেলায় সুধা একা-ই বসে ছিল সেদিন। উন্মত্ত নীল জলরাশি বিপুল বেগে ফণা তুলে আছ্‌ড়ে এসে পড়ছে তটপ্রান্তে, অগাধ অসীম জলরাশি! সুধা অনিমেষ তাকিয়ে ছিল ঐ নীল জল-প্রান্তরের দিকে। মন তার যেন মিশে গিয়েছিল সেই অসীমের মধ্যে।···কখন ঢেউ এসে শাড়ির প্রান্ত ভিজিয়ে দিয়েছে—জানতে পারেনি সুধা। জনতার

কোলাহল কাণে যায় নি তার,···সাগরের বুকে সন্ধ্যা নেমে এসেছে কখন, খেয়াল নেই কিছুরই।·· হঠাৎ উত্তপ্ত নিঃশ্বাস যেন গায়ে লাগলো, চমক ভাঙ্গল সুধার···'কে?' ফিরে তাকিয়ে দেখলো সুরজিৎ!—দুজনেই নীরব।

কুমারী মেয়ে মনের কথা মুখ ফুটে বলতে পারেনি সেদিন। নীরবেই পার হয়ে গিয়েছিল কয়েকটা মুহূর্ত, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রাত্রির অন্ধকার এসেছিল নেমে, সমুদ্র কল্লোল হয়ে উঠেছিল আরো গভীর, আরো উত্তাল হয়ে উঠেছিল সাগরের ঢেউ।···কী কে হয়েছিল সুরজিতের মনে কে জানে, কুমারী মেয়ের হাতখানি তুলে নিয়েছিল হাতের মধ্যে, কিন্তু কোনো কথা বলে নি। নীরবে কত পল, অনুপল কেটে গিয়েছিল কে জানে,···হঠাৎ তার কোলে মাথা দিয়ে নরম বালির ওপর শুয়ে পড়েছিল সুরজিৎ।···না, ওর সেই আচরণে চম্‌কে ওঠে নি সুধা, বরং সেই অবুঝ লোকটিকে ওভাবে শুয়ে পড়তে দেখে মমতায় নিবিড় হয়ে উঠেছিল সুধার মন। মাথার অগোছালো বড়-বড় কোঁকড়ানো চুলের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞাসা করেছিল অস্ফুট কণ্ঠে, 'লোকে দেখলে কী ভাববে?'

—'ভাবুক।' ব'লে তার একখানা হাত টেনে নিয়ে ঠিক বুকের ওপর রেখেছিল সুরজিৎ। তারপরেই আর কথা নেই, চোখ বুজে চুপ-চাপ সেইভাবে পড়ে রইল লোকটি। অদ্ভুত খেয়ালী প্রকৃতি!··· আপন মনেই সেদিন হেসে ছিল সুধা।

দুজনেই আবার নীরব। সাগর বেলায় তরঙ্গের পর তরঙ্গ ভেঙ্গে পড়ছে অবিরাম। গর্জনে বুঝি ধরিত্রী কেঁপে ওঠে। ওপরে তারায় ভরা শান্ত নীলাকাশ আর নিচে বিক্ষুব্ধ নীল জলরাশি।···সুধার মন আবেগে, আনন্দে সঙ্কোচে কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল! ঐ বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের মতই তার বক্ষের স্পন্দন দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়েছিল—ঢেউয়ের দোলা

আছ্‌ড়ে এসে পড়তে লাগল দেহে ও মনে। কৌমার্যের সমস্ত আবেগ দমন করে নিজেকে সংযত করে সুধা বলেছিল—'শিল্পী হলেই কি এই রকম পাগল হতে হয় ?'

—'পাগল !' উঠে বসেছিল সুরজিৎ, আবার সুধার কোলে মাথা রেখে যেন নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়ে।

কণ্ঠে ঈষৎ তিরস্কারের ভঙ্গি এনে সুধা বলে, 'কী পাগ্‌লামী হচ্ছে সেই থেকে! যদি কেউ……।'

'আসুক।'

'তা বৈ কি ! আমার বুঝি লজ্জা করে না ?'

সুধার হাতের ওপর মৃদু চাপ দিয়ে বলে,—'লজ্জা করবে ?'

—'জানি না যাও !'

হেসে উঠলো সুরজিৎ, বলল—'যাক্‌ এতক্ষনে 'তুমি' তে এসে নামলে !'

'যাও !'

'যাবো তো বটেই,··· কিন্তু তোমাকেও নিয়ে যাবো।'

'ওমা, ···কোথায় !'

'কেন, ক'লকাতায়।'

'ওমা গো, ···নিয়ে পালাবে বুঝি ?'

'হ্যাঁ, তাই।···যেমন ক'রে মাথায় টোপর দিয়ে লোকেরা এসে ক'নেদের নিয়ে পালায়! ···যাবে ত ?'

কয়েকটি নিস্তব্ধ মুহূর্ত। চারিদিক নিঝুম। রাত কত কে জানে! তীর-ভূমি জন-বিরল—তরঙ্গ-কল্লোল আরো গভীর, অসংখ্য সর্প শিশুর মণি জ্বলে ঢেউয়ের মাথায়। ···সুধার কাণ দুটি যেন অস্বাভাবিক লাল আর গরম হয়ে উঠেছে। গভীর নিস্তব্ধতায় নিজেরই দ্রুত বক্ষ স্পন্দন স্পষ্ট শুনতে পায়—অন্তরের সেকি দাপাদাপি!

মনের সমস্ত আবেগ যেন উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বারম্বার তার দেহ-প্রান্তে ঢেউয়ের মত এসে আছ্‌ড়ে পড়তে লাগল!

স্ফুরিত অধর!…ভাবে, সুরজিতের পাগলামীর কথা, ভাবনার অতলে ডুবে গিয়েছে সুধা।

শ্যামলী মেয়ে সে, রূপবতী নয়,—যৌবন লাবণ্য অনিবার্যরূপে এসে দেহে তার সুষমা সঞ্চারিত করেছে বটে, কিন্তু বিশেষত্ব ত' কিছু নেই। কুমারী মনের স্বপ্ন-সায়রে গোপন কামনার শতদল অতি নিভৃতেই ফুটেছিল, কোনো ব্যাকুলিত ভ্রমর কাছে ত' আসেনি গুন্‌ গুন্‌ করে!

নিভৃত স্বপ্নের ফুল গোপনে প্রস্ফুটিত হ'য়ে গোপনেই হয়ত ঝরে যেতো,—কিন্তু কে-এ,—এসে পড়ল তার অন্তরের অন্তঃস্থলে ?…

অন্ধকার সমুদ্রের সেই ঢেউ-ওঠা-পড়ার কথাই আজ বার বার মনে পড়ছে সুধার। বার বার মন চলে যায় সেই অতীতের স্বপ্ন কাহিনীর মধ্যে। কোথায় গেল স্বপ্নে-দেখা সেই সব দিন,—কোথায় গেল স্বপ্নের সেই সুরজিৎ!

বারান্দার কোণে মাদুর বিছিয়ে কালি-পড়া লণ্ঠনের আলোয় ছেলে দুটি গুন্‌ গুন্‌ করে পড়ছিল,—দ্বিতীয় ভাগের একটা বানান 'দ্রংষ্ট্রা' উচ্চারণ করতে গিয়ে বড় ছেলেটীর বারে বারে আট্‌কে যাচ্ছে,—হঠাৎ শব্দটা কাণে যেতেই সম্বিত ফিরে এল সুধার। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ভাতের হাঁড়িটা নামালো, ছোট ছেলে কখন বই-শ্লেটের ওপরই ঘুমিয়ে পড়েছে—তাকে তুলে নিয়ে বড় ছেলেটীর সঙ্গে খাইয়ে-দাইয়ে দুজনকেই ঘুম পাড়িয়ে দিল —শ্রান্তিতে নিজেও কাৎ হয়ে পড়ল তাদের পাশে।…বস্তি নিঃঝুম হয়ে আসছে, রাত কত কে জানে! অথচ এখনও সুরজিতের দেখা নেই।

নাঃ, আজ অনন্ত ভাবনার সাগরে ডুবে গেছে সুধা। চোখ বুজে আছে বটে, কিন্তু মন তার চলে গেছে আবার সেই সমুদ্র পারের ঝিকি-মিকি বেলায় —স্বপ্নের জাল বুনে চলে।

—ক্ষ্যাপা শিল্পী বাবার কাছে অকুণ্ঠে এসে যেদিন বলেছিল,—'আপনার মেয়েকে আমি বিয়ে করতে চাই'···বাবার চোখে সে কি আনন্দাশ্রু। এই রূপহীন কালো মেয়েটিকে নিয়ে দরিদ্র পিতার ভাবনার অন্ত ছিলনা সেদিন। তাই ত শিখিয়েছিলেন মেয়েকে লেখাপড়া, যতদুর পেরেছিলেন। ওর অযাচিত প্রস্তাবে বাবা আনন্দে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন। সেদিনের সেই খেয়ালী আপন ভোলা ছেলেটিকে সত্যিই ভালোবেসে ছিলেন বাবা।

আজ ঘটনাটির কথা মনে করতে গিয়ে হাসিই পায় সুধার। ক্ষ্যাপা ব'লে কি সহজ ক্ষ্যাপা? বলেছিল, ঐ পুরীতেই বিয়ে করবে, দেরি করতে চায়না। দেরি সে করেনি।—তবে পুরীতে নয়, বাবা ওকে রাজি করিয়ে এই কলকাতায় নিয়ে এসেই বিয়ে দিয়েছিলেন। বিয়ের দিন সেকি ঘন-বর্ষন! মেঘে মেঘে সারা আকাশ ছেয়ে গিয়েছে। ঝম্ ঝম্ করে নেমেছে জল। তারই ভেতর টোপর মাথায় দিয়ে এল বর।···বরযাত্রী?···না, কেউ ছিল না, সঙ্গে ছিল শুধু পুরোহিত। জীবনে যে উৎসব সর্বাধিক স্মরণীয়,—তাতে না ছিল আড়ম্বর, না ছিল সমারোহ। বাপ-মেয়ের সংসার। ভাড়াটেদের বউ-ঝীরা এসে শাঁখ বাজালো।···বাসর? হ্যাঁ হয়েছিল বৈ কি!

আর কিছু না হোক, সুধা অন্ততঃ আশা করেছিল তার ভাবী শ্বশুরকে দেখবে বিবাহ বাসরে। তিনিও আসতে পারেন নি নাকি অসুস্থতার জন্য—একথা সুরজিৎ বলেছিল। কিন্তু আসল ঘটনা পরে জানা গেল।—ওর' বাবা এই বিবাহে মত দেন নি! তবু সুধার বাবা দুদিন বৈবাহিকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে মনস্তাপ নিয়েই ফিরে

এসেছিলেন —তাঁকে প্রকৃতিস্থ অবস্থায় দেখতে পান নি। সুরজিৎকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন বাবা, জবাব পেয়েছিলেন : 'বহুদিন থেকেই এই ব্যাপার, মদ না হ'লে বাবার এক মুহূর্তও চলেনা।'—জামাতার আগ্রহ, কন্যার রূপহীনতা এই দ্বিবিধ কারণে সেদিন স্তম্ভিত পিতা সংশয়কে দূরে ঠেলে দিয়েছিলেন।

তারপর ?—

তারপর কিছুদিন নিরুদ্বেগ জীবন-যাত্রা।

বাবার সঙ্গেই থাকত সুধা, থাকত সুরজিৎ। ছবি আঁকা তার চলে, সুধা ধুয়ে মুছে রাখে তুলি, সযত্নে সাজিয়ে রাখে রঙের পাত্র, কখনো কখনো চলে যেতো তার বাবার কাছে। তিন চারদিন থেকে আবার চ'লে আসতো সুরজিৎ। জোর করে সুধা-ই কি সঙ্গে যায়নি একদিন !···কিন্তু সেদিনের সে অপমানের কাহিনী মনে পড়লে আজও কান্না পায়। বেতের একটা ইজি-চেয়ারে অর্ধ-শায়িত অবস্থায় ছিলেন শ্বশুর, প্রায় কঙ্কাল-সার দেহ, চক্ষু কোটরাগত, যেন বহু বিনিদ্র-রজনী যাপন করেছেন। ছোট ক'রে ছাঁটা চুল, তামাটে গায়ের রং—সবটা জড়িয়ে কিন্তু ভাল লাগেনি সুধার। তবু ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে হেঁট হয়ে প্রণাম করতে গিয়েছিল সুধা। তড়িৎ-গতিতে পা সরিয়ে নিয়ে হুঙ্কার ছেড়েছিলেন শ্বশুর—'ছুঁয়োনা আমাকে,—খোকা নিয়ে যা, নিয়ে যা শীগ্‌গীর।'

স্পষ্ট মনে আছে সুধার—সেই হুঙ্কারে থর্‌থরিয়ে কেঁপে উঠেছিল তার সারা দেহ, পায়ের তলায় মাটি যেন সরে যাচ্ছিল। গোটা বিশ্বটা দুলছিল ! ···চোখের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা। কোনো রকমে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল, তারপর অশ্রুজল বাধা মানে নি আর, কপোল বেয়ে নেমে এল অজস্র ধারায়। অপমানে সংকোচে সঙ্কুচিত হয়ে ফিরে এল স্বামীর হাত ধরে।

এই প্রত্যাখ্যানের কথা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে সুধা সদুত্তর পায়নি কোনদিন। তেমনি, বেশীদিন এ প্রশ্নকে লালন করার অবকাশও পায়নি সে। কিছুদিন পরেই লিভারের অসুখে শ্বশুরের মৃত্যু হ'ল। সে আর এক বিশৃঙ্খলার ইতিহাস। পিতা পরলোকে যাত্রা করলেন, আর ইহলোকে পুত্রের জন্য রেখে গেলেন মোটা অঙ্কের ঋণের বোঝা। —বসতবাড়ি, আসবাবপত্র, সবই গেল।

দুর্ভাগ্যের এখানেই সমাপ্তি নয়। এরই সাত মাস পরের ঘটনা।

তাদের দু'জনকে যিনি বটবৃক্ষের মত স্নিগ্ধ ছায়ার আশ্রয়ে রেখেছিলেন—সেই সুধার বাবা এবার শয্যার আশ্রয় নিলেন। দারিদ্রের নিষ্পেষণ, হাঁপানি, ব্লাড প্রেসার—এদের হাত থেকে অব্যাহতি পেলেন না তিনি। বিকল ঘড়ির মতই একদিন হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হ'ল চিরতরে। যে সতর্ক সস্নেহ দৃষ্টি ওদের দুজনের চারিদিকে সজাগ প্রহরীর মত পাহারারত থাকত—সে দৃষ্টি হয়ে গেল নিষ্প্রভ। যে দুটি বাহু সকল বিপদে অভয় দিত—সে আজ নিস্পন্দ।···সুধা কিন্তু কান্নায় ভেঙ্গে পড়েনি সেদিন। অশ্রুর উৎস গিয়েছিল শুকিয়ে, শিলাখণ্ডের মত নিশ্চল নিথর হ'য়ে গিয়েছিল,—আজও মনে হলে আশ্চর্য লাগে তার।

তবু দিন চলে। সূর্যের উদয় হয়, অস্ত যায়।···ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় শোকের ছায়া। সংসার-রথের চক্রকে চলমান রাখতে নতুন করে সচেতন হ'য়ে ওঠে দুটী প্রাণী। নতুন করে যেন আসে বসন্ত বর্ষা, আসে হেমন্ত, শীত। সংস্থানের চিন্তাই তখন প্রবল। সুরজিৎ পুস্তক প্রকাশকদের আর পত্রিকা-সম্পাদকদের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়ায়

ছবি আঁকার কাজের সন্ধানে। সুধা ভর্তি হ'ল একটা টাইপরাইটিং স্কুলে। এই স্কুলের কর্তার সুপারিশে আড়াই মাস পরেই অনেক কষ্টে যোগাড় হয়েছিল এই বর্তমান চাকরি—এই চাকরি-ই ত' আজ ভরসাস্থল! এরই মধ্যে এসে গেল নতুন অতিথী। এমনি করেই সুরু হয়েছিল ওদের জীবনের নতুন অধ্যায়।

সুরজিৎ কদাচিৎ কখনও ছবি আঁকার কাজ পায়, পারিশ্রমিক অবশ্য সামান্যই।—

দারিদ্র ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। আবার আর একটি শিশুর আবির্ভাব! দৈন্যের আগুনে ঝল্‌সে যায় তাদের দেহ মন। অকালে ভেঙ্গে যায় সুধার যৌবন, ভেঙ্গে পড়ে স্বাস্থ্য,—ঝরে যায় যৌবনলাবণ্য।

সুধা আজ যেন শুধু 'টাইপিস্ট'—এই তার পরিচয়! গৃহ আছে তবু সে গৃহিণী নয়! একজনের স্ত্রী হয়েও সে আজ আর প্রিয়া নয়! সে আজ রিক্ত! বিকশিত হবার আগেই যে-তরু বিদ্যুতের আঘাতে ঝল্‌সে গেছে,—সেই অর্থহীন রিক্ত তরুর মত সে দাঁড়িয়ে আছে সংসার অরণ্যে! চারিপাশের এই কল-কোলাহল, দক্ষিণ বাতাসের কাণাকাণি, বর্ষা দিনের এই আনন্দধারা—সে যেন এদের কেউ নয়, কেউ নয়—সুধা আজ অবাঞ্ছিত আগন্তক এই আনন্দময় বিশ্ব সংসারে!

দুঃখ ও দুর্দশার সীমান্তে এসে পৌঁছেছে তারা। তার ওপর অতীত কাহিনীর চিন্তায় আজ যেন কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে আসছে সুধার। গলার কাছে কোথায় যেন টন্‌ টন্‌ ক'রছে। উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল সুধা। বিছানার প্রান্তে মলিন বালিশটাকে আঁকড়ে ধরে ফুলে ফুলে সে কি অজস্র কান্না!···একটানা এই দুঃখের বোঝা আর সে বহন করতে পারে না!

কতক্ষণ এইভাবে কেটেছে মনে নেই সুধার। ভেজানো দরজায় শব্দ হয়। তারই মত ক্লান্ত দেহ-মন নিয়ে প্রবেশ করে সুরজিৎ। ধীর-পায়ে কাছে এসে ডাকে,—'সুধা।'

স্বামীর সঙ্গে আজকাল আলাপ কম-ই হয়। যখন হয়, তখন সুধার কণ্ঠস্বরে তাপ-ই প্রকাশ পায়। আজ কিন্তু বেশ নরম সুরেই জবাব দেয়—

'কী?'

একটু থেমে সুরজিৎ বলে,—'এক লেখক-বন্ধু তার বইয়ের প্রচ্ছদপট আঁকার জন্য প্রকাশককে বলে অগ্রিম পনেরো টাকা পাইয়ে দিয়েছে,—এই নাও।'

—'থাক্ তোমার কাছে।'

অবাক হয় সুরজিৎ। এভাবে কায়-ক্লেশে যখনই টাকা সংগ্রহ করেছে সুরজিৎ, সুধা যেন ছোঁ মেরে নিয়েছে টাকা ...আজ হ'ল কি ওর!

সুরজিৎ খুঁজতে চেষ্টা করে এই ভাবান্তরের কারণ।

আস্তে আস্তে উঠে বসে সুধা। একটু নিবিড়ভাবে তাকায় সুরজিতের দিকে।—না, সে চেহারা আর নেই, শুকিয়ে ঝল্‌সে গেছে। চোখ নামিয়ে জিজ্ঞাসা করে—'কি ছবি আঁকবে তুমি?'

আরও আশ্চর্য হয় সুরজিৎ। অতীত দিনের কথা মনে প'ড়ে যায়। ছবি দেখবার, ছবি নিয়ে আলোচনা করবার কত আগ্রহ ছিল সুধার, কিন্তু সেই দীপ্তিময়ী সুধা ত বেঁচে নেই!

ম্লান হাসি হাসল সুরজিৎ,—বললে, 'নতুন ধরণের পটভূমিকায় বই লিখেছে আমার সেই লেখক-বন্ধু। আইডিয়াও দিয়ে দিয়েছে আমাকে। প্রচ্ছদে আঁকতে হবে নীল সমুদ্রের ঢেউ, আর ...

—'সমুদ্র!'

—'হ্যাঁ সুধা।'

মাত্র কয়েক মুহূর্ত।···নিজেকে সামলে নেয় সুধা। বক্ষের দ্রুত স্পন্দন কিছুটা সহজ হয়ে আসবার পর অপেক্ষাকৃত শান্ত কণ্ঠেই বলে—'বেশ ত', আঁকা সুরু করে দাওনা।'

গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে শিল্পী বলে—'হ্যাঁ, সুরু করতে হবে।'—বিছানায় ক্লান্ত দেহটা এলিয়েই দেয় সুরজিৎ।

সুধা প্রশ্ন করে,—'এত রাত হ'ল কেন ফিরতে ? লেখক-বন্ধু কি···'

'না, মঞ্জুদের বাড়ি গিয়েছিলাম। মানে, না গিয়ে পারলাম না ওর দাদার সঙ্গে হঠাৎ রাস্তায় দেখা। কিছুতেই ছাড়লো না, নিয়ে গেল ধরে।···কিন্তু আমার কথা কিছুতেই শুনল না মঞ্জুশ্রী। অথচ ওদের ধারণা···

—'কি কথা, কিসের ধারণা ?' ···

আবার ম্লান হাসি সুরজিতের।

বলল—'বাড়ির সবাই বুঝিয়েছে, ধমকেছে, ভয় দেখিয়েছে। কিন্তু মঞ্জু অচল, অটল।···আমার কথাও শুনলো না, জানো ?'

আপন-ভোলা শিল্পীর কণ্ঠে যে বেদনার সুর বেজে ওঠে, যে ব্যথার ছায়া পড়ে মুখে আর চোখে—তা আজ আর লক্ষ্য এড়ায় না সুধার। কিন্তু কিসের এ ব্যথা ? ··· ব্যর্থতার ? ··· না-পাওয়ার বেদনা ? মঞ্জুশ্রীকে—যাক্, বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে আবার ! সুধাকেও ত একদিন ভালবেসেই এনেছিল ঘরে ! সেদিনের সেই বালু-বেলায়—

—'সুধা ?'

—'বল'

সুরজিৎ বলে,—'মঞ্জুর বিয়ে ঠিক হয়েছে সামনের বুধবার। কিন্তু বাড়ির কারুর মত নেই।

চমকে উঠলো সুধা,—'যার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে মঞ্জুর, শুনেছি তারা খুব বড়লোক!'

'হ্যাঁ, মস্ত ধনী।'

—'তবে,—তবে কি ভালো নয় ছেলেটি!'

একটু হেসে বলে সুরজিৎ—'খুব ভালো, গুণী লোক, পরম রূপবান।'

সুধা সত্যি এবার বিস্মিত হয়। বলে, 'ধনবান, রূপবান, গুণবান পাত্র.—তবুও বাড়ির লোকের আপত্তি কিসের?'

উঠে বসে সুরজিৎ। রুক্ষ চুলের রাশির মধ্যে আঙ্গুল চালাতে থাকে। তারপর অস্ফুট ও ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে বলে, 'সুধা! যাকে মঞ্জুশ্রী বিয়ে করছে—সেই মৃগাঙ্কমৌলি অন্ধ···এক অন্ধকে বিয়ে করছে মঞ্জু!'

সুধার সামনে যেন বজ্রপাত হোল! বিস্মিত, বিমূঢ় সুধা পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকে সুরজিতের মুখের দিকে।

ট্রাম রাস্তা পেরিয়ে, চৌমাথা অতিক্রম করে নিরিবিলি জায়গাটায় এসে দাঁড়ালো. মঞ্জু। শ্যাম-স্কোয়ারের এ-জায়গাটায় এখন এ সময়ে অন্ধকার। সামনের ছোট ছোট দোকানে আলো জ্বলে উঠেছে। মঞ্জুর মনে হলো সে যেন সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ পেরিয়ে আর এক নতুন গ্রহে এসে পৌঁছেছে আজ। নতুন গ্রহই বটে। এই পৃথিবীটাই যেন তার কাছে আজ নতুন মনে হচ্ছে। এই ঘর-বাড়ি লোক-জন, এই চির-কালের দেখা শহরটা, এই আত্মীয়-স্বজন সমস্ত যেন নতুন। মনে হলো

—তার বাবাকে এতদিন সবাই নির্লিপ্ত মানুষ বলেই তো জানতো। কিন্তু সেই বাবাও আজ অন্যরকম হয়ে গেছেন যেন।

সেদিন সারাদিন অফিসে যান নি নিবারণবাবু। ঘরে শুয়ে ছিলেন। মঞ্জুকে কাছে ডেকে বললেন—'আয় মা মঞ্জু, একটু কাছে বোস্ তো আমার'—

মঞ্জুকে এমন করে আগে কাছে বসতে বলেন নি তিনি কোনদিন।

বললেন—'তোমার পড়া-শুনা কেমন চলছে মা?'

মঞ্জু বললে—'আমি আর পড়বো না বাবা, আমার আর পড়তে ভালো লাগে না'—

নিবারণবাবু বললেন—'কেন মা?'

মঞ্জু হঠাৎ এর উত্তর দিতে পারলো না। মনের মধ্যে উত্তরটা তৈরি থাকলেও বাবাকে বলতে কেমন যেন বাধোবাধো ঠেকলো।

নিবারণবাবু বললেন—'তোমার পড়াশুনোতে আমারও ঠিক মত ছিলনা মা, তবে আমার কথা তো কেউ এ বাড়িতে কোনও দিন শোনেনি।'

মঞ্জুর বাবার মুখের দিকে চেয়ে মঞ্জু কেমন যেন অবাক হয়ে গিয়েছিল। বাবাকে এমন করে তো কোনোদিন দেখেনি সে। বাবা বরাবর অফিসে গেছেন। মাসকাবারে সমস্ত মাইনেটা এনে মার হাতে তুলে দিয়েছেন। তারপর জামাকাপড় ছেড়ে সেই যে বৈঠকখানায় নেমেছেন দাবা খেলতে—কখন বাবা শুতে এসেছেন, কখন খেয়েছেন, সে খবর কারোর রাখবার দরকার মনে হয়নি। এ সংসারের ভালো মন্দ সমস্ত ব্যাপারে কখনও হস্তক্ষেপ করেন নি বাবা—এই টুকুই শুধু জানতো মঞ্জু। কিন্তু হঠাৎ বাবার জীবনের সমস্ত ট্রাজেডিটা স্পষ্ট হয়ে

উঠলো আজ মঞ্জুর চোখের সামনে। বাবাকে যেন আজ এই প্রথম বড় নিঃসহায় মনে হলো তার, বড় একলা। এতদিন মঞ্জুর নিজেকেই কেবল মনে হয়েছিল অসহায়। কিন্তু এখন নিজের চেয়েও অসহায় আর একজনকে দেখতে পেলে চোখের সামনে।

বাবার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে—'আপনার শরীরটা কি খারাপ লাগছে বাবা?'

নিবারণবাবু বললেন—'না মা, আমার জন্যে তুমি ভেবো না, তুমি বড় হয়েছ, তোমার নিজের সামনেই অনেক ভাবনা পড়ে আছে, অনেক সমস্যা, তার ওপর আমার নিজের সমস্যা চাপিয়ে তোমাকে আর ভারাক্রান্ত করবো না মা'—

মঞ্জু বললে—'না বাবা, আমার কোন ভাবনা নেই, আপনারা সবাই রয়েছেন —আমার আবার ভাবনা কিসের বাবা'—

নিবারণবাবু বললেন—'দাবা নিয়ে মেতে থাকি বলে মনে করো না মা —আমি কিছুই দেখতে পাই না —বন্ধু মহলে খেলায় আমার নামও আছে ঠিক ···কিন্তু'—

—'কিন্তু কি বাবা?'

নিবারণবাবু কী বলতে গিয়ে থামলেন। মঞ্জুর মনে হলো বাবা যেন কিছু গোপন করতে চাইছেন। কোনও গোপন ব্যথা যেন আজীবন মনের মধ্যে পুষে রেখেছেন। কেউ জানে না, কেউ জানতে চায়ও না, কারো জানবার গরজও নেই যেন। বাবার দিকে চেয়ে চেয়ে মঞ্জুর নিজের মনের বোঝাটা যেন অনেক হাল্কা হয়ে গেল।

শ্যামস্কোয়ারের সামনের ফুট-পাথের ওপর দাঁড়িয়ে বাবার কথাগুলো আবার মনে প'ড়ল মঞ্জুর।

বাবা বলেছিলেন —'এবার তোমারও দাবা খেলার দিন এলো মা—

তোমারও তো বয়েস হল—তোমার ইচ্ছে থাক্ আর না থাক্—সংসার তোমাকে রেহাই দেবে না তা' বলে।'

মঞ্জু চুপ করে রইল।

বাবা আবার বলতে লাগলেন—'এই আমার কথাই ধরোনা, তুমি তখন হওনি, তোমার দাদাও তখন হয়নি। তোমার মা তখন এ সংসারে সবে নতুন এসেছেন, বড় আনন্দে আমি নৌকা নিয়ে একদিন যাত্রা করলাম, বিধাতা পুরুষ হঠাৎ গজ চেলে বসলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমার হাতের ঘুঁটি এক দানেই বেহাত হোয়ে গেল,—তারপর আমি চাললুম আমার গজ, হঠাৎ ওদিকে নজর করে দেখি মন্ত্রী নেই—সংসারের দাবা খেলায় সেই যে মন্ত্রী হারালুম, আজ পর্যন্ত সেই মন্ত্রী আর ফিরে পেলুম না মা'…

মঞ্জু এবারও কিছু কথা বললে না। সুধু অবাক হয়ে শুনতে লাগল।

শ্যামস্কোয়ারের সামনে, আশেপাশে, চারিদিকে আবার চেয়ে দেখলে মঞ্জু। কোথাও সুরজিৎদা'র দেখা নেই। কথা দিয়ে সুরজিৎদা' কোনদিন কথা রাখেনি, আজও রাখবে না জানা ছিল। তবু আশা রাখতে দোষ কী!…কে যে তার মন্ত্রী আর কে যে তার গজ—কে বলতে পারে।

অচলা সেদিন হেসে বলেছিল—'আমি তোকে কিন্তু কাকিমা বলতে পারব না ভাই—তা রাগই করিস তুই আর যা-ই করিস—তোকে আমি মঞ্জু বলেই ডাকবো'…

মঞ্জু কিছু উত্তর দেয়নি এ কথায়।

অচলা বলেছিল—'রাগ করলি বুঝি, কথা বলছিস্ না যে'—

মঞ্জু বলেছিল—'বাবার কথাটাই ভাবছি কেবল, এতদিন বাবা-মার

ওপর নিজের সমস্ত ভারটা চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তেই বসে ছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি আমাকে নিজেই সব ভাবতে হবে।'

—'হঠাৎ তোর এ কথা মনে হোল যে?'

মঞ্জু বললে—'হঠাৎ-ই মনে হোল—আমার মত এই বয়সে এত নিঃসহায় আর কেউ হয়নি ভাই।'

অচলা গম্ভীর হয়ে গেল। বললে—'কেন বল্ ত'! ···ক'দিন থেকে তোকে দেখে আমার কেমন ভয় করছে—পড়া-ই বা ছেড়ে দিলি কেন?'

—'সব কথা তোকে বলা যায়না অচলা, তুই বললেও তা বুঝতে পারবি না।'

অচলা বললে—'আমরা বড়লোক, এ কথাটা তুই ভুলতে পারিস না বুঝি?'

মঞ্জু বললে—'ভুলতে পারলেই ভালো হ'ত ভাই।'

অচলা বললে—'তোর পায়ে পড়ি মঞ্জু, তুই ভুলতে চেষ্টা কর'—

মঞ্জু বললে—'তোর মত বন্ধু পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের কথা অচলা, কিন্তু তোকে আমি কিছুতেই আপনার লোক বলে ভাবতে পারি না, এ কি আমার কম দুঃখ! তোকে পর মনে করে আমিই কি কম দুঃখ পাই ভেবেছিস? কিন্তু আমার আর এ-সব ছেলেমানুষি করবার সময় নেই রে অচলা, আমাকে শক্ত হতে হবে—আমার নিজের পথ আমাকেই বেছে নিতে হবে এবার'—

—'তার মানে?'

মঞ্জু বললে—'তার মানে তুই আমাকে জিজ্ঞেস করিস নি'—

অচলা খানিক চুপ করে রইল। তারপর বললে—'কিন্তু কাকা যে অন্ধ, সে কথা তো তোকে আগেই বলেছিলাম—তোর কাছ থেকে তো তা লুকোতে চাইনি ভাই'—

মঞ্জু বললে—'তা জেনেও তো আমি তাঁকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছি।'

'তাহলে এখন আবার ও কথা বলছিস কেন তুই ?'

মঞ্জু বললে—'এই দু'দিনে অনেক ঘটনা ঘ'টে গেছে ভাই—এতদিন আমি কিছুই জানতাম না—জানতাম না বলেই আমি এমন অহঙ্কার করেছিলাম'—

—'অহঙ্কার ? ···অহঙ্কার মানে ?'

মঞ্জু বললে—'তুই জানিস না, কত বড় অহঙ্কারী মেয়ে আমি, অচলা, কিন্তু আজ আমার সমস্ত অহঙ্কার ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে—আজ আমি সত্যি সত্যিই বড় গরীব।'

অচলা বললে—'তুই বড়লোক কি গরীব সে প্রশ্ন তো আমাদের মনে কখনও ওঠেনি।'

মঞ্জু বললে—'তোদের মনে না উঠলেও আমার মনে উঠেছে'—

—'আমি কিছু বুঝতে পারছিনা ভাই—তুই সত্যি খুলে বল্—এখন আমি ভাবছি কাকাকে গিয়ে কি বলবো !'

মঞ্জু বললে—'তুই মৃগাঙ্কমৌলিবাবুকে গিয়ে বলিস—তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন—বলিস ···মঞ্জুর সমস্ত দর্প ধুলিসাৎ হয়ে গেছে'—

'তার মানে বুঝলুম না—হেঁয়ালী করিস নে, খুলে বল্'—

মঞ্জু বললে—'আমিও কি বুঝেছিলুম ভাই—দু'দিন আগেও আমি কিছুই বুঝতাম না, বুঝতে চেষ্টাও করিনি। বোঝবার দরকারও ছিল না। তোদের মত অত বড়লোক ছিলাম না বটে, কিন্তু ভাবতুম আমাদের অবস্থা সচ্ছল তো বটেই, ভবিষ্যতের ভাবনা ভাববার মত অবস্থাও নয় আমাদের, কিন্তু পরশু আমার সব ভুল ভাঙল ভাই—বুঝলাম সংসারে আমরা যে টিকে আছি সেটাই আশ্চর্য—তোর সঙ্গে যে এখন কথা বলছি, কিম্বা বলতে পারছি এটাই এক পরমাশ্চর্য ব্যাপার।'

—'সত্যিই এক পরমাশ্চর্য ব্যাপার বটে !'

ছোটবেলা থেকে সামান্য মধ্যবিত্ত সংসারে মানুষ হলেও সংসার সুশৃঙ্খলেই ত' তাদের চলে এসেছে চিরকাল। যখন যা প্রয়োজন হয়েছে, তা সবাই পেয়েছে। বাবাকে দেখেছে নিশ্চিন্তে দাবা খেলতে। দাদা আর বৌদি হাসি-খেলায় কাটিয়েছে। দাদার বিয়েও ঘটা ক'রে হয়েছে। তার কলেজের মাইনে কখনও কোনো মাসে বাকি পড়েনি। কোনও দিন অভাব অনটনের এতটুকু ক্ষীণ চিহ্নও চোখে পড়েনি মঞ্জুর, পূজোর সময় বাড়িময় লোকের কাপড়-জামাও এসেছে। চাকর-ঝি কাজ করেছে। একটা কুটো পর্যন্ত নাড়তে হয়নি মঞ্জুকে। ঘুম থেকে উঠে বিছানায় চা পেয়েছে বরাবর। কোনও দিন কোনও ব্যাপারে কোনও অভিযোগ করবার সুযোগই ঘটেনি তার।

বাবা তাই বলেছিলেন—'আমি নৌকো চালিয়ে ছিলাম নির্বিঘ্নে—বড় নিশ্চিন্ত মনেই'—

সত্যিই—নির্বিঘ্নেই সংসার চলছিল তাদের।

ইতিমধ্যে হঠাৎ সকলের অজ্ঞাতে কখন মন্ত্রী হারিয়ে গেল নিবারণবাবুর।

নিবারণবাবু শুয়ে শুয়েই বললেন—'মা, তোমার বয়স হয়েছে, আজ আর তোমাকে বলতে দোষ নেই ···আমি একেবারে নিঃস্ব'—

মঞ্জু তখনও কিছু বুঝতে পারেনি সত্যি !

—'হ্যাঁ মা, একেবারে নিঃস্ব, এতদিন ঢেকে চেপে অনেকদিন চালিয়েছি, কাউকে জানাইনি। আজও কেউ জানে না, কেবল তোমাকে জানালাম, কিন্তু আর বেশি দিন ঢেকে রাখলে হাতের বাকি ঘুঁটিগুলোর একটাও থাকবে না'—

—'মা,···মাকেও জানান নি ?'

নিবারণবাবু বললেন—'কাউকে না'—

—'দাদা ?'

নিবারণবাবু বললেন—'না, তোমার দাদাকেও বলিনি—শুনলে বড় কষ্ট পাবে ওরা।'

—'শুধু আমাকেই বললেন ?'

—'হ্যাঁ মা, শুধু তোমাকেই বললাম, মনে হ'ল, একলা তুমিই আমাদের সকলকে বাঁচাতে পারো, আমি এক মস্ত ঝুঁকি নিয়েছিলাম, অনেক শেয়ার নিয়ে অনেক রকম অঙ্ক ক'ষে অনেক স্বপ্ন গড়েছিলাম'—

মঞ্জু বললে—'কিন্তু কেন এমন হ'ল বাবা ?'

—'কেন হ'ল সে-কথা আমাকে জিজ্ঞেস করা বৃথা মা, আমি তোমাদের ভালোই চেয়েছিলাম, তোমাদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিন্ত করতেই চেয়েছিলাম—আর তা' ছাড়াও আর একটা কারণও ছিল মা, সংসারে আমার কিছুই ছিল না, কেউই ছিল না, তোমার মা তোমাদের নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন, তোমার মাকে আমি কাছে পেতাম না, আমি তখন কী করি ! কাজের মধ্যে শুধু ডুবে থাকলেই আরাম পেতাম কেবল, যখনি তোমার মাকে কাছে ডেকেছি, পরামর্শ চেয়েছি, সাহায্য চেয়েছি, সঙ্গ চেয়েছি,—তিনি তোমাদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, আমি তখন আরো কাজের মধ্যে ডুবে গিয়েছি। কিন্তু অফিসের কাজ তো সামান্য মা, সে কাজে সময় মন কিছুই ভরতো না, শেয়ার মার্কেটে মন দিলাম—আর তার পরেও যখন সন্ধ্যেবেলা ফাঁকা লাগতে লাগল, বসলাম দাবা খেলতে—মনে মনে হাসি পেল—বড় খেলায় মন্ত্রী হারিয়ে ছোট খেলায় মন্ত্রী থাকলেই বা কী আর হারালেই বা কী !'……

বাবা চুপ করলেন। চুপ করে হাঁপাতে লাগলেন। মঞ্জুর মুখের দিকে চেয়ে পরম নির্ভরতায় যেন কিছু আশার কথা শুনতে চাইলেন।

বাবা আবার বলতে লাগলেন—এখন তুমিই আমার একমাত্র আশা মা, তোমার ওপরেই সংসারের ভালো-মন্দ সমস্ত নির্ভর করছে'—

মঞ্জু চুপ করে রইল, বাবার এই আর্ত্তি যেন তার কাছে বড় কর্কশ হ'য়ে বাজলো। আজ বড় নিষ্ঠুর মনে হলো তার বাবাকে। তার বিধাতা-পুরুষকে। বড় স্বার্থপর!

মঞ্জু একবার জিজ্ঞেস করলে—'সবশুদ্ধ কত টাকার দেনা বাবা?'

নিবারণবাবু বললেন—'সে অনেক টাকা মা—অনেক টাকা!'

মঞ্জু আবার জিজ্ঞেস করলে—'তবু কত টাকা আপনি বলুন, শুনি'—

নিবারণবাবু যেন দাবা খেলায় আবার তার মন্ত্রী ফিরে পেয়েছেন। বললেন—'সে টাকা তোমার দাদা সারা জীবন চাকরী কোরেও শোধ করতে পারবে না মা—এত'—

মঞ্জু একটু দ্বিধা করে বললে—'আমাকে আপনি কী করতে বলেন বাবা?'

নিবারণবাবু বললেন—'মা, তোমার ওপরই আমার এখন একমাত্র ভরসা, তোমাকে সেই কথা বলবো বলেই ডেকেছি আজ, তোমার মাকেও বলিনি, কাউকেই বলিনি—আমাদের সকলের ভবিষ্যৎ তোমার ওপরই এখন নির্ভর করছে'…

নিবারণবাবু চুপ করলেন। মঞ্জুও চুপ করে রইল। মুখে আর তার কোনও কথা আসছে না আজ। শিল্প আর সাহিত্য উপলক্ষ্য করে জীবনের উন্মেষ সুরু হয়েছিল তার, কিন্তু পুরোপুরি উন্মেষ হ'তে না হ'তেই এমন করে আত্মরক্ষার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে কে ভেবেছিল!…হঠাৎ তার খুব হাসি পেতে লাগলো। এখনও সামনে এতখানি বয়স পড়ে রয়েছে, এরই মধ্যে সে এত আশা করেছিল কেন! জীবনকে এত সহজ বলে ভেবেছিল কেন সে!

নিবারণবাবু বলেছিলেন—'এত কী ভাবছো মা?'

অচলাও সব শুনে বলেছিল—'এত কী ভাবছিস তুই?'

মঞ্জু হেসে উঠলো।

বললে—'নিজের আমার সত্যিই অহঙ্কার ছিল ভাই—তোর কাকামণিকে বিয়ে করবার কথা যখন তুই বললি, আমি অমত করিনি,...কেন জানিস ?'

—'কেন ?'

—'ভেবেছিলাম তোদের ঐশ্বর্য আছে, থাকুক,—আমরা গরীব হলেও আর একদিক থেকে আমিই বা কম কিসে—তবু ত' তোদের দয়া করতে পারবো—দয়া করে আমি বিয়ে করবো তোর কাকামণিকে —কথাটা ভেবেও আত্মপ্রসাদ পেয়েছিলাম...আমিও তাহলে দয়া করতে পারি, আমিও ছোট নই—আমার কাছে তোদেরও নেমে আসতে হয়'...

অচলা কিছু বুঝতে পারছিল না, শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে ছিল।

মঞ্জু বললে—'তুই এসব কথা বুঝতে পারবি না ভাই, ভগবান করুন এসব কথা তোকে যেন কখনও বুঝতে না হয়'—

অচলা বললে—'কিন্তু এখন হঠাৎ তোর মত বদলালো-ই বা কেন—খুলে বলবি তো !'

মঞ্জু বললে—'সবই তো বললুম তোকে—আমাদের অবস্থার কথা তো শুনলি, আমার বাবার পাহাড় প্রমাণ দেনার কথা তো শুনলি, বাবার গোপন কামনার কথাও তো শুনলি·· বাবা আমার মুখের দিকেই এখন চেয়ে বসে আছেন—আমিই একমাত্র এখন সমস্ত সংসারটাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারি—

অচলা হেসে উঠলো।

বললে—'বাবাঃ, বাবাঃ, তুই এতও ভাবতে পারিস মঞ্জু, তা এখন সবাইকে বাঁচা তুই—আমরাও বাঁচি—সবাই-ই বাঁচুক'—

মঞ্জু আরো গম্ভীর হয়ে গেল।

বললে—'ছিঃ, সে এখন আর হয়না'—

—'কেন, হয় না কেন শুনি ?'

—'হয় না ভাই অচলা, হয় না, তুই যদি আমার মতন মধ্যবিত্ত সংসারে জন্মাতিস ত' বুঝতিস,…তুই যদি আমার মতন অবস্থায় পড়তিস, ত' বুঝতিস —এখন আর তা হয় না'—

তারপর একটু থেমে মঞ্জু বলেছিল—'আমি কি জানিনা কত বড় দায়িত্ব আমার মাথায়, বাবা বুড়ো হয়েছেন, দাদা বিয়ে করেছে। আমার মা কোনও দিন বাবাকে বুঝতে চেষ্টা করেন নি, হঠাৎ কাল যদি পাওনাদারেরা সমস্ত দাবি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে—তখন কোথায় থাকবে আমাদের সম্মান, আর কোথায় থাকবো আমরা বলতো ?'

অচলা বললে—'কাকামণিকে তাহলে তুই এতদিনেও চিনলি না, —কাকামণির নিজের নামেই তিনটে কোলিয়ারী—কাকা অন্ধ বটে, গান-বাজনা নিয়ে থাকে অবশ্য—কিন্তু ওই জন্যেই আমার ঠাকুর্দা অনেক সম্পত্তি আলাদা করে দিয়ে গেছেন, কাকামণিকে যে বিয়ে করবে—তার কোনও দিন কোনও অভাব ঘটবার ভয় নেই—এ অবস্থায় তোদের সংসারকে বাঁচাতে একমাত্র কাকামণিই পারে'—

মঞ্জু বললে—'সেই জন্যেই তো মত বদলেছি ভাই, আমাকে জয় করবে কেউ এ আমি সহ্য করবো কেমন করে ? এর চেয়ে যে সারা জাবন চাকরি করাও ভালো—অফিসে চাকরি করবো, দাসত্ব করবো, সেও যে এর চেয়ে ভালো'—

অচলাকে এসব কথা বোঝানো বৃথা।

মৃগাঙ্কমৌলি সেদিন বলেছিলেন—'আমার সঙ্গে ভাগ্যকে জড়ানো মানে আজীবন সমস্ত সুখ থেকে বঞ্চিত থাকা…তা আমি বুঝি, তাইতো এ ক্ষেত্রে আমার কোনও জোর খাটে না মঞ্জু'—

মঞ্জু বলেছিল—'আপনি জোর করবেন কেন, আমিই ত' নিজে এসে ধরা দিচ্ছি'—

—'কিন্তু তোমার মনে যদি বিন্দু মাত্র ক্ষোভও থাকে ত' এখনও খুলে বল মঞ্জু—আমি কিছু মনে করবো না, বরং খুশীই হবো, নইলে পরে আমার আর আফ্‌শোষ রাখবার যে জায়গা থাকবে না'—

মঞ্জু বলেছিল—'জীবনকে সহজ ভাবে গ্রহণ করবার শিক্ষাই এতদিন আমি পেয়ে এসেছি মৃগাঙ্কবাবু'—

মৃগাঙ্কমৌলি হাসলেন—'এত অহঙ্কারও ভালো নয় মঞ্জু'—

—'আমি একে অহঙ্কার বলি না, এ যে আমার আত্মপ্রত্যয়'—

মৃগাঙ্কমৌলি এবারও হাসলেন।

বললেন—'কোন্‌টা অহঙ্কার আর কোন্‌টা আত্মপ্রত্যয়—এ চেনা কি এতই সহজ ভাবো'—

মঞ্জু বললে—'আমার মুখে হয়ত কথাটা শোভা পাচ্ছে না—কিন্তু সুরজিৎদা' বলেন—দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় যার থাকে, সব রকম অবস্থাকেই সে মানিয়ে নিতে পারে'—

—'সুরজিৎদা' ?···সুরজিৎদা' কে ?'

মঞ্জু বললে—বাঙলা দেশের একজন অসাধারণ শিল্পী, এখনও তার নাম জানেনা কেউ, কিন্তু আমার ধারণা তাকে অনাদর করেছে বলে একদিন বাঙলা দেশের আক্ষেপের আর শেষ থাকবে না'—

মৃগাঙ্কমৌলি বললেন—'জানিনা কে তোমার সুরজিৎদা'··· কেমন তার শিল্প—সে বিচার করবার চোখ আমার বিধাতা আমাকে দেন নি, কিন্তু ভালো শিল্পী হলেই যে ভালো জীবন-স্রষ্টা হতে হবে এমন কথা কোনও শাস্ত্রেই লেখে না'—

মঞ্জু বললে—'সব শিল্পীই অবশ্য জীবন-স্রষ্টা হয় না স্বীকার করি, কিন্তু সুরজিৎদা'র কথা সত্যিই আলাদা—তাকে ভালো করে জানি বলেই বলছি···মানুষের কাছ থেকে কোনও মানুষ সুরজিৎদা'র মত এত মর্মান্তিক আঘাতও যে পায়নি তাও আমি জানি'—

মৃগাঙ্কমৌলির মুখে যেন হঠাৎ মৃদু হাসি ফুটে উঠলো।

সেতারের তারে মৃগাঙ্কমৌলি একটা আঘাত করলেন অন্যমনস্কভাবে। মঞ্জু'র মনে হলো যেন করুণ সুরে কেউ কেঁদে উঠলো কোথা থেকে।

মৃগাঙ্কমৌলি বললেন—'আঘাত হয়ত তোমার সুরজিৎদা' পেয়েছেন, আমি অবিশ্বাস করছি না—কিন্তু সংসারে সকলের কাছ থেকেই কি তিনি শুধু আঘাত পেয়েছেন?···একজনও কি তাঁকে ভালোবাসবার নেই?'

মঞ্জু চুপ করে রইল। কোনও কথা হঠাৎ তার মুখ দিয়ে বেরুল না।

মৃগাঙ্কমৌলি এবার সেতারের আর একটা পর্দায় ঘা দিলেন। কোমল গান্ধারের রেশটা অনেকক্ষণ ধরে ঘরের মধ্যের আবহাওয়ায় ভাসতে লাগলো।

মৃগাঙ্কমৌলি বললেন—'ভালোবাসা বলতে যদি তোমার আপত্তি থাকে ত' না হয় সহানুভূতিই বললাম—অন্ততঃ তোমার সুরজিৎদাকে সহানুভূতি করবার একজন লোকও যে আছে, তা ত' আমি চোখ না থেকেও দেখতে পাচ্ছি'—

এবার আর কোমল গান্ধার নয়, সরাসরি পঞ্চমে বেজে উঠলো সেতারের একটা তার।

মৃগাঙ্কমৌলি হঠাৎ ব'লে উঠলেন—'যাকগে, তোমার সুরজিৎদা'র কথা বলতে তোমায় সত্যি আজ ডাকি নি—ডেকেছিলুম যে জন্যে সেই কথাটাই বলি'—

তারপর একটু থেমে আবার বললেন,—'ডেকেছিলুম অন্য কারণে,'

বলতে গিয়ে যেন একটু দ্বিধা হলো মৃগাঙ্কমৌলির। কেমন করে কথাগুলো ব'লবেন তাই যেন একটু ভেবে নিলেন।

তারপর আবার সুরু করলেন—'অর্থাৎ নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের

চিরদিনের সঙ্গীর সঙ্গে খোলাখুলি বোঝাপড়া করে নেওয়াই আমি যুক্তিযুক্ত মনে করি !'…

মঞ্জু চুপ করে শুনছিল। মৃগাঙ্কমৌলির চোখ দু'টোতে যেন বড় কাতর আবেদন ফুটে উঠলো।

মৃগাঙ্কমৌলি এবার মুখ নিচু করে আরম্ভ করলেন—'প্রথমে আমার নিজের কথাটাই বলি—আমি অন্ধ, কিন্তু যাদের চোখ আছে, তারা দু'চোখ নিয়ে যতটুকু কজে করে তাদের চেয়েও আমি বেশী কাজ করি এ কথাটা তুমি বোধ হয় জানো না—তুমি বোধ হয় জানো না আমারও অফিস আছে। সেখানে আমার কারবার চলে, সেখানে আমার লোকজন আছে…তারাই আমার নির্দেশে কাজ করে, আর সে কারবারের লাভ লোকসানের দায়িত্বটাও আমার। এক কথায় আমি যে বেকার নই সেটাই তোমাকে বলতে চাই'—

মঞ্জু মুখ নিচু করে রইল।

মৃগাঙ্কমৌলি বললেন—'সবই আছে আমার, শুধু চোখ দুটোই নেই,…তা না-ই বা রইল !…তোমার তো চোখ আছে—তুমি তো সব দেখতে পাও…তোমার চোখ দুটো দিয়েই না হয় পৃথিবীকে দেখবো,—এতদিন' যাদের চোখ দিয়ে কাজ-কর্ম দেখে এসেছি—সে ত' আমার ধার করা চোখ, এবার তোমাকে পেলে আমি আমার নিজের চোখই ফিরে পেলাম মনে করবো—বলো,—বলো মঞ্জু…তোমার কি আপত্তি আছে ?

মঞ্জু বললে—'আপনি এই কথা বলতেই কি আমাকে ডেকেছিলেন ?'

মৃগাঙ্কমৌলি বললেন—'জীবনে কখনও কাউকে পীড়ন করেছি বলে মনে পড়ে না—তোমার ওপরেও পাছে পীড়ন হয়, সেই আশঙ্কাতেই তোমায় ডেকেছিলুম…তুমি আজ শুধু নিজের মুখে বলে যাও…তোমার পূর্ণ সম্মতি আছে'—

মঞ্জু এ-কথার উত্তরেও চুপ করে রইল।

মৃগাঙ্কমৌলি বললেন—'আমি তোমার কাছে আর কিছুই চাই না মঞ্জু, তুমি তোমার সেই সুরজিৎদা'র জন্যে তোমার সব সহানুভূতিটুকুই রেখে দিও—আমি কিছু আপত্তি করবো না, তার কোনও ভাগও আমি চাইবো না—শুধু আমাকে দিও তোমার চোখ দুটো—আর যদি পারো···একটু'···

মঞ্জু চোখ তুলে মৃগাঙ্কমৌলির মুখের দিকে সোজাসুজি চাইলো। হঠাৎ মনে হলো মৃগাঙ্কমৌলির অন্ধ চোখ দু'টোর পাতা যেন ভিজে ভিজে দেখাচ্ছে।

মৃগাঙ্কমৌলি কেমন করে যেন বুঝতে পারলেন মঞ্জু তার দিকেই সোজা চেয়ে আছে।

বললেন—'তোমার ভয় নেই মঞ্জু—তোমার চোখ দু'টোই শুধু আমার নিজের চোখ বলে মনে করতে দিও...তা'হলেই আমি খুশী হবো, আর এ ছাড়া তুমি নিজে কিছু না দিলে আমি জোর করে কিছুই কেড়ে নেব না···এও তোমাকে কথা দিচ্ছি'—

মঞ্জুর যেন কেমন মায়া হলো। মায়া হলো মৃগাঙ্কমৌলির নিঃসহায় অবস্থার জন্যে। মনে হ'ল সে যেন ইচ্ছে ক'রলেই এই অসহায় লোকটিকে দয়া ক'রে কৃতার্থ করতে পারে। এই মৃগাঙ্কমৌলিকেই শুধু নয়—এই ধনী পরিবারের সকলকেই।···আজ এ বাড়িতে যে উৎসবের আয়োজন হয়েছে, চাকর-বাকর ঝি, মালিক, গৃহিণী, সকলেরই কেন্দ্র যেন সে। সবাই জেনেছে—মৃগাঙ্কমৌলি মঞ্জুর কৃপাপ্রার্থী। আজ মঞ্জুর একটি ছোট্ট সম্মতির অনেক দাম এদের কাছে। তার একটু সম্মতিতে এ বাড়িতে এখনি অভূতপূর্ব আনন্দের স্রোত বইতে সুরু করবে। এখনি তাকে নিয়ে ভবিষ্যৎ রচনার পরিকল্পনা চলবে। এখনি গাড়ি নিয়ে লোকজন বেরিয়ে যাবে চারিদিকে। ধুম লেগে যাবে জিনিস-

পত্র কেনার।···কাপড়, পোষাক, গয়না, কত কী! বাজারের সমস্ত বিলাসিতার পাহাড় জমে উঠবে বাড়িতে। শুধু মঞ্জুর একটু দয়া —একটু অনুগ্রহ—এক কণা করুণা!

মনে আছে···মঞ্জু সেদিন মৃগাঙ্কমৌলির ঘর থেকে উঠে আসবার আগে বলেছিল—'আপনি কিছু ভাববেন না—আমার এতে পূর্ণ সম্মতি আছে'—

ঘরের বাইরে আসতেই অচলা জিজ্ঞেস করেছিল—'রাজি হয়েছিস ত' মঞ্জু? কাকামণিকে কথা দিয়েছিস তো—

অচলার মা দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কথাটা তিনিও বুঝি শুনলেন। বললেন—'চলো, ডাইনিং হলে চলো মঞ্জু—এখন থেকে তো এ তোমার নিজের বাড়িই হয়ে গেল—এখানে লজ্জা করতে পারবে না আর'—

অচলা বলেছিল —'আমি কিন্তু তোকে কাকিমা বলতে পারবো না ভাই—আগেই বলে রাখছি—মঞ্জু বলে ডাকবো —কিছু মনে করতে পারবিনে তুই কিন্তু'—

তারপর খাবার টেবিলে বসে অচলা বললে—'আয়, কা'কে কা'কে নেমন্তন্ন করতে হবে লিস্টটা করে ফেলি—

সেদিন অনেক হাঁসি, অনেক গল্প অনেক আনন্দ করেছিল সবাই মঞ্জুকে ঘিরে।···আজ দু'জনেরই মনে আছে সে সব কথা। কোন্ শাড়ি প'রে বিয়ে হবে মঞ্জুর, কোন্ গয়না মঞ্জুর পছন্দ। মৃগাঙ্কমৌলির নতুন গাড়ি কিনতে হবে একটা। কোন্ গাড়ি মঞ্জুর পছন্দ! বিয়ের পর কোথায় বেড়াতে যাবে মঞ্জুরা। কোথায় কোথায় বেড়াতে ভালো লাগে মঞ্জুর। ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক-অনেক গল্প।

এত কথার পর, এত ঘটনার পর অচলা মঞ্জুর মুখ থেকে আবার অন্য কথা শুনে আজ অবাক হ'য়ে গেল। বললে—'তাহলে কাকামণিকে গিয়ে আমি কী বলবো ভাই?···কী করে কাকামণিকে মুখ দেখাবো?'

মঞ্জু বললে—'বলিস, আমাকে যেন তিনি ক্ষমা করেন'...

অচলা বললে—'তুই যদি জানতিস কতখানি দুঃখ পাবে কাকামণি—সব যে কেনা-কাটা সুরু হয়ে গিয়েছিল—কত শাড়ি কত ব্লাউজ আর কত গয়না এসেছে জানিস'—

মঞ্জু বলেছিল—'আমাকে আর ওসব কথা শোনাস নি ভাই'—

অচলা বললে—'তুই বড় সেন্টিমেণ্টাল'—

মঞ্জু বললে—'বাবা সেই যে সেদিন থেকে বিছানায় প'ড়ে, আজ পর্যন্ত আর উঠলেন না, অথচ বাবার আয় থেকেই সংসারের যা কিছু চলে—দাদার তো নতুন চাকরি—বাবার একটা কিছু হলে কোথায় দাঁড়াবো বুঝতে পারছিস ?'

অচলা বললে—'কাকামণিকে বিয়ে করলেই তো তোর সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়'—

মঞ্জু বললে—'তা সম্ভব হলে তা-ই করতুম ভাই'—

তারপর একটু ভেবে নিয়ে আবার বলতে লাগলো—'এমন করে জীবনের সব পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাওয়া এই আমার প্রথম নয় ভাই—যখন 'উন্মেষ' কাগজ চালাতাম—তখনও শেষ পর্যন্ত একটা-না-একটা কিছু ঘ'টে সব গোলমাল হয়ে যেত,—এই দেখ না, আমাদের এতবড় দুরবস্থার কথা পর্যন্ত আমি এতদিন জানতেই পারিনি। আগে জানতে পারলে কি আমিই সেদিন তোর কাকামণির সঙ্গে বিয়েতে রাজি হ'তাম।'

অচলা বললে- 'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না ভাই তোর কথা—এত দুরবস্থার খবর পেয়ে ত' আরো বেশী করে রাজি হওয়া উচিৎ।—

মঞ্জু বললে—'ঠিক তার উল্টো! তখন মর্যাদার প্রশ্ন ছিল না—কিছু মনে করিসনি ভাই—তখন বিয়ে করলে তোর কাকামণিই কৃতার্থ হ'ত—আর এখন তিনি আমাকে কৃতার্থ করবেন—আমার বাবাও

অন্য কোনও উপায় না পেয়ে আমাকে সেই অমর্যাদার মধ্যেই ফেলতে চান'—

অচলা জিজ্ঞেস করলে—'তা হলে তোর বাবাকে কী জবাব দিলি ?'

—'কিছুই জবাব দিইনি, শুধু বলেছি—কাউকে এখন বলবার দরকার নেই—দেখি আমি কী করতে পারি'—

—'তুই কী করবি ঠিক করেছিস ?'

মঞ্জু বললে—'কিছুই ঠিক করতে পারিনি এখনও—দেখি সুরজিৎদা'কে বলে কী পরামর্শ দেয়'—

অচলা জিজ্ঞেস করলে—'সুরজিৎদা' ? সুরজিৎদা' আবার কে রে ?'

তারপর নিজেই বলে উঠলো—'ওঃ সেই তোর আর্টিস্ট—আর্টিস্ট নিজেই তো গরীব—সে আবার তোকে কী সাহায্য করবে ?'

মঞ্জু বললে—'গরীবরাও যে মানুষ এ-কথা তোর বিশ্বাস হবেনা জানি'—

অচলা জিভ কেটে বললে—'ছিঃ আমি তা' বলিনি ভাই'—

মঞ্জু বললে—'সুরজিৎদাকে তুই চিনিস না তাই ও-কথা তুই বলতে পারলি। এই তোকে ব'লে রাখলুম, একদিন দেখবি সুরজিৎদাকে নিয়ে বাঙলা দেশে হৈ-চৈ পড়ে যাবে'—

অচলা কিছু কথা বললে না।

মনে আছে, সেদিন যাবার সময় অচলা বলেছিল—'যদি তোর আপত্তি না থাকে ত' একটা কথার উত্তর দিবি ?'

মঞ্জু বলেছিল—'বল্'—

অচলা জিজ্ঞেস করলে—'তোর বাবার দেনা সবশুদ্ধ কত ?'

মঞ্জু প্রশ্ন শুনে হেসে উঠেছিল।

বলেছিল—'কেন বল ত' ? জেনে তোর কী হবে ?'

অচলা বললে—'কাকামণিকে তো সব কথাই বলতে হবে—তোর যদি আপত্তি থাকে বলতে ত' শুনতে চাই না অবশ্য'—

মঞ্জু বললে—'না তোর কাছে বলতে আমার আপত্তি নেই—আমাদের মতন লোকের কাছে সে অনেক — প্রায় সত্তর-আশি হাজার টাকা'—

আজ শ্যামস্কোয়ারে সুরজিৎদা'র জন্যে অপেক্ষা করতে করতে মঞ্জুর সমস্ত কথাই মনে পড়ছিল। বিশেষ করে এ-ক'দিনের সব ঘটনাগুলো যেন হঠাৎ বড় নাটকীয় হয়ে ঘ'টে গেছে তার জীবনে। কোথায় রইল তার শিল্পীকে সাহায্য করবার মহৎ কল্পনা। কোথায় রইল নিজেকে নিয়ে বিলাস! আর কোথায়—আরো কতদূরে তাকে যেতে হবে কে জানে!

হঠাৎ মঞ্জুর মনে হল যেন সুরজিৎদা' আসছে। সুরজিৎদাকে দেখেই প্রথমে কী কথা বলবে সেই কথাগুলো একবার ভেবে নিলে মঞ্জু।

সুরজিৎদা' হয়ত বলবে—'এত জায়গা থাকতে এখানে দেখা করতে বলেছিলে কেন বলো তো মঞ্জু?'

মঞ্জু বলবে—'এসব কথা কি সুধা বৌদির সামনে বলা যায়? বলো তুমি?'

—'খুব বলা যায়, সুধা বাঘ না ভালুক—তোমার বয়েস হলো, এখনও ছেলেমানুষি গেল না দেখছি'—

—'তুমি আমার ছেলেমানুষিটাই শুধু দেখলে সুরজিৎদা'—আর আমি বলে তোমার জন্যে ভেবে ভেবে মরছি—তোমার মত এতবড় শিল্পী পয়সার অভাবে উপোষ করে —এ ত' বাঙলা দেশের কলঙ্ক—

সুরজিৎদা' কথাগুলো শুনে খুব রাগ করবে হয়ত। বলবে—'এই সব কথা বলতেই আমাকে এখানে ডেকেছ নাকি—তবে চললুম আমি—যত সব ছেলেমানুষি'—

মঞ্জু বলবে—'না না, আজ সত্যিই ও কথা বলতে ডাকিনি—আজ আমার সব কল্পনা, সব ভবিষ্যৎ মিথ্যে হয়ে গেছে সুরজিৎদা'—আজ বোধ হয় তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা'—

—'শেষ দেখা! তার মানে?'

কিন্তু না।...সুরজিৎদা' ত' নয়। লোকটাকে অনেকটা ঠিক সুরজিৎদা'র মত দেখতে। অন্ধকারে ভালো ঠাহর হয় না। এদিকে আসতে আসতে লোকটা অন্যদিকে চলে গেল আবার! মঞ্জু কেমন অস্থির হয়ে উঠলো। অনেকক্ষণ বাড়ি থেকে বেরিয়েছে সে। এতক্ষণ বাড়িতে কী হচ্ছে কে জানে!

মঞ্জু ফুটপাথ ছেড়ে রাস্তায় এসে পড়লো। আর দাঁড়ানো যায় না। এমনিতেই আশে-পাশের লোক সন্দেহ করতে সুরু করছে। দু' একজন গা ঘেঁষে চলে গেল। কেউ আবার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে গুণ-গুণ করে গান ভাঁজতে সুরু করেছে।

বাস রাস্তায় এসেও অনেকক্ষণ দাঁড়াতে হ'ল। এত দেরী ক'রে এদিকে বাস আসে!—কিন্তু এত শিগ্‌গির বাড়িতে গিয়েই বা সে কী করবে! বাড়িতে গিয়েও ত' তার শান্তি নেই। গেলেই বাবার কাছে গিয়ে বসতে হবে। বাড়িতে এখনও কেউ জানে না। দাদা এখনও তার ফুর্তি নিয়ে আছে। মা'র আছে সংসার। কিন্তু মঞ্জুই শুধু বাবার মত এ-সংসারে একলা। সংসারে একমাত্র বাবার সঙ্গেই তার মেলে কেবল। কিন্তু তবু বাবার কাছে এখন বেশিক্ষণ বসতেও তার ভয় করে। বাবার চেহারার দিকে চাইলেই তার ভয় হয়।

রাস্তাটুকু হাঁটতে হাঁটতেই চলতে লাগলো মঞ্জু!

হঠাৎ পাশ থেকেই কে যেন চিৎকার করে উঠলো—'ওমা মঞ্জু তুই'—

আর সঙ্গে সঙ্গে একটা মোটর গাড়ি পাশেই এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। দরজাটা নিজেই খুলে নেমে পড়লো অচলা।

বললে—'মঞ্জু তুই এখানে? আর আমি ক'দিন থেকে তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি—আজও তোদের বাড়ি যাচ্ছিলাম'—

মঞ্জু কী বলবে বুঝতে না পেরে বললে—'কিন্তু আমার সঙ্গে তোর কী দরকার—বুঝতে পারছি না ত'—

—'কেন, তুই কি আমাদের একেবারে পর করে দিতে চাস?'

মঞ্জু হঠাৎ নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—তুই কিছু মনে করিস নি ভাই—ক'দিন থেকে আমার মনটা ভালো নেই —তুই ত' জানিস ·

অচলা জিজ্ঞেস করলে—'এখন কোথায় গিয়েছিলি এদিকে?'

মঞ্জু বললে—'গিয়েছিলাম অনেক জায়গায়, সারা দিনই টো টো করে ঘুরছি, বাড়িতে থাকতে ভালো লাগেনা—বাড়িতে ওই অবস্থা, তার ওপর নিজে যে কী করবো জীবনে এখনও ঠিক করতে পারছি না'—

অচলা বললে—'কিন্তু এখন কোথা থেকে আসছিস?'—

মঞ্জু বললে—'সুরজিৎদা'র জন্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এখন চলে আসছি — দেখা হ'ল না' —

—'ও, তোর সেই আর্টিস্ট!'

মঞ্জু বললে—'হ্যাঁ ক'দিন থেকে তার কাছে পরামর্শ নেব বলে দেখা করতে চেষ্টা করছি—

অচলা বললে—'আর্টিস্ট মানুষ পরামর্শ দেবে, আর সেই পরামর্শ তুই নিবি তবেই হয়েছে'—

তারপর একটু থেমে বললে—'তোর এখন কোনও কাজ নেই তো?'—

মঞ্জু বললে—'না, বাড়ির দিকেই তো যাচ্ছিলাম'—

—'তবে একবার কাকামণির সঙ্গে দেখা করবি ?'

মঞ্জু বললে —'তোর কাকামণি ! কিন্তু এত কথা শোনার পরেও'...

অচলা বললে —'হ্যাঁ—আমি সব বলেছি কাকামণিকে'—

মঞ্জু বললে —'কিন্তু কেন বলতে গেলি ?'

অচলা বললে —'কিন্তু তুই নিজে ভেবেও কি কিছু কুল-কিনারা করতে পারলি এতদিনে ?'

খানিকক্ষণ থেমে অচলা আবার বললে—'চল্ গাড়িতে ওঠ্'—

গাড়িতে উঠতেই গাড়ি ছেড়ে দিলে।

মঞ্জু বললে—'কিন্তু তোদের বাড়ি এ-রকম ভাবে যাবো না ভাই —সারাদিন রাস্তায় ঘুরে ঘুরে চেহারা যা হয়েছে বুঝতেই পারছি— আমি বরং পরে একদিন যাবো—আজ আমায় তুই বাড়ি পৌঁছে দে'—

অচলা বললে—'তা'হলে কবে আমাদের বাড়ি যাবি বল ?'

মঞ্জু কিছু বললে না। গাড়ি সোজা চলেছে। মঞ্জু চুপটি করে বাইরের দিকে চেয়ে বসে রইল।

অচলা অনেকক্ষণ পরে বললে —'এত কী ভাবছিস রে মঞ্জু ?'

মঞ্জু বললে—'কিচ্ছু না'—

অচলা বললে —'তুই যদি রাগ না করিস তো একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ?'

—'কী ?'

অচলা বললে—'তোর সব কথা কাকামণিকে বলেছিলাম। শুনে কাকামণি কী বললে জানিস—বললে—টাকাটা আমিই দিয়ে দিতে পারি, এমনি নিতে যদি আপত্তি হয় ত' ধার হিসেবেও দিতে পারি'—

মঞ্জু এ-কথার কোনও উত্তর দিচ্ছে না দেখে অচলা বললে—'কাকার এবার শেয়ার মার্কেটে হঠাৎ অনেক টাকা লাভ হয়ে গেছে কিনা'...

'তুই হয়ত বলবি জানি'—

মঞ্জু তবু কিছু কথা বললে না। অচলা বলতে লাগলো—'এতে তোর আত্মমর্যাদায় আরো বেশি করে ঘা লাগবে'…

বাড়ির কাছে এসে গিয়েছিল গাড়িটা।

হঠাৎ মঞ্জু সোজা হয়ে উঠে বসে বললে—'এখানে থামাতে বল্ ভাই'—

মঞ্জু গাড়ি থেকে নামলো।

অচলা বললে —'কিছু জবাব দিচ্ছিস না যে? যাবার আগে কিছু বলে যা'—?

মঞ্জু বাড়ির দরজার দিকে পা বাড়িয়েই কী একটা কথা বলতে যাচ্ছিল —হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। আর ভেতর থেকে ব্যস্তত্রস্ত হয়ে বেরিয়ে আসছিল মৃণাল।

সামনে মঞ্জুকে দেখেই বললে—'মঞ্জু! এতক্ষণ কোথায় ছিলি তুই—ওদিকে বাবার যে ভীষণ বিপদ'—

মঞ্জু যেন ককিয়ে কেঁদে উঠলো—'কী বিপদ দাদা?'

মৃণাল বললে—'আমার দাঁড়াবার সময় নেই, ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি—বাবা কী রকম করছেন হঠাৎ'—

মঞ্জু ঝড়ের গতিতে ভেতরে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল।

মঞ্জু ভাবে নি, জীবনের দাবা খেলায় তার বাবা শেষ পর্যন্ত হেরে গিয়েই থামবেন না, হঠাৎ ছক উল্টে ঘুঁটিগুলো সব লণ্ডভণ্ড করে সকলের চোখের আড়ালে আচমকা ছুট দেবেন। যেন এই হার, এই দুঃসহ পরাজয় তিনি সহ্য করতে পারলেন না, পালিয়ে গেলেন।

সর্বস্ব যার গিয়েছে—এমনি করে অন্ধকারের আড়ালে স'রে যাওয়া ছাড়া আর তার কি-ই বা করার ছিল।

মঞ্জু কাঁদল। মা কাঁদল। দাদা বৌদিও। সংসারে মৃত্যুর বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়ত থাকে, আর্জি চলে না। সম্ভবত তাই আমরা কাঁদি—কিন্তু কাঁদতে কাঁদতে সত্যটা সইয়ে সইয়ে স্বীকার করে নি। একদিন তাই কান্নাও বন্ধ হয়। শোকের ছায়া আসে ফিকে হয়ে।

আঘাতটা নিশ্চয় অপ্রত্যাশিত এবং মর্মান্তিক। তবু মঞ্জুকে আর পাঁচ জনের মতন এ আঘাত সইতে হ'ল। স'য়ে গেল।

মঞ্জুদের শোকের দিনে সহানুভূতি জানাতে অনেকে এসেছিল। বাবার বন্ধু কেউ কেউ, মার আত্মীয় স্বজন, দাদার চেনা-জানা অনেকেই, বৌদির বাপের বাড়ির লোক। কিন্তু শুধু মঞ্জুকে সান্ত্বনা দিতে, মঞ্জুর জন্যে এসেছিলেন মৃগাঙ্কমৌলি। সঙ্গে ছিল অচলা।

মৃগাঙ্কমৌলি একটু একা পেতে চাইছিলেন মঞ্জুকে। পেলেনও।

বললেন, 'এ-বয়সে এসব আঘাত খুব লাগে মঞ্জু; আমি জানি। তোমায় আমি মুখের সান্ত্বনা দিতে আসি নি। সে সান্ত্বনা অনেক পেয়েছ, আরও অনেক পাবে; তোমার মন নিজেই সান্ত্বনা খুঁজে পাবে। —আমি অন্য কথা বলতে এসেছি।' মৃগাঙ্কমৌলি থামলেন।

মঞ্জুর ঘরেই ওরা বসেছিল। মৃগাঙ্কমৌলি জানালার কাছে একটা চেয়ারে। আর মঞ্জু একটু তফাতে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। বিকেল তখন শেষ হয়ে এসেছে। আবছা আবছা অন্ধকার ঘরের মধ্যে।

মৃগাঙ্কমৌলি কথা বলতে বলতে থামলে মঞ্জু তাঁর দিকে চাইল। চেয়ে মঞ্জুর মনে হ'ল, সামনের লোকটি তো অন্ধ! মঞ্জুকে দেখবার সাধ্য তাঁর নেই। তবু মঞ্জু এতক্ষণে ক'বারই বা তাঁর চোখের দিকে তাকাতে পেরেছে। আশ্চর্য! মঞ্জুর যেন কেমন লাগছিল কথাটা ভাবতে গিয়ে। সত্যি, আজ শুধু নয়—মৃগাঙ্কমৌলির কাছাকাছি যতবার

দাঁড়িয়েছে মঞ্জু, কোনোবারই ত' তাঁর দিকে সহজভাবে চোখ তুলে তাকাতে পারে নি। কোথায় যেন বেধেছে।

কেন? ··মৃগাঙ্কমৌলি অন্ধ বলে? এই আঙ্গিক ত্রুটি সহ্য করতে পারে না মঞ্জু,···তাই কি! না অন্য কিছু,—মঞ্জু লজ্জা পায়।

মৃগাঙ্কমৌলি ততক্ষণে কথা বলতে শুরু করেছেন। প্রথমে কি বললেন মঞ্জুর কানে গেল না। মঞ্জু শুনলো মৃগাঙ্কমৌলি বলছেন, 'অচলার মুখ থেকে আমি খানিকটা শুনেছি।—বোধ হয় এরপর তুমি নিজেকে আরও অসহায় মনে করবে।—তোমার যদি কখনো কোনো পরামর্শ বা কোনো রকম সাহায্য দরকার হয় অসঙ্কোচে আমায় জানাতে পার।'

মঞ্জু কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারল না। অন্ধকার মৃগাঙ্ক-মৌলির মুখ অস্পষ্ট ক'রে তুলেছে। সে-মুখের কোনো ভাষা-ই পড়া যায় না। চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মঞ্জু মৃদুস্বরে বললে, 'আপনার কথা আমার মনে থাকবে।'

মৃগাঙ্কমৌলি নীরবে মাথা হেলালেন। মনে হ'ল এইটুকু জবাবেই তিনি খুশী হয়েছেন। বললেন, 'অচলাকে ডেকে দাও, আমরা এবার ফিরবো।'

মৃগাঙ্কমৌলিরা চলে গেলে মঞ্জু অনেকক্ষণ নিজের ঘরে চুপচাপ বসে রইল। -ভাবলো। নির্দিষ্ট কোনো ভাবনা নয়, এক-কথা ভাবতে বসে অন্য কথা মনে আসছিল। কিন্তু সমস্ত ভাবনাই শেষ পর্যন্ত একটি জায়গায় এসে থামছিল। · এরপর! এরপর মঞ্জু কি করবে!

সন্ধ্যা একটু ঘন হ'তেই মা, দাদা,—একে একে মঞ্জুর ঘরে এসে ঢুকলেন। দাদাকে দেখে মনে হচ্ছিল, মঞ্জুর চেয়েও সে যেন ভেঙে

পড়েছে। শোকের চেয়ে দুশ্চিন্তা, নিঃস্বতার চেয়ে উদ্বেগ তার হাসি-খুশী মুখটাকে এই ক'দিনেই আশ্চর্য রকম বদলে দিয়েছে। হঠাৎ যেন বয়সটা বেড়ে গিয়েছে দাদার—বোঝার ভারে মানুষটার মেরুদণ্ড গেছে গুটিয়ে।

আর মা! মঞ্জু তার মাকে আজকাল অন্য একরকম চোখ নিয়ে দেখে। আগে যা দেখেনি। আগে এই মা ছিল তার কাছে সাধারণ মা, যার হাতে এই সংসার ছিল, ছিল এই সংসারের চাবিকাঠি, যার কাছে আদর আব্দার অত্যাচার নির্বিবাদে চালানো যেত। আর হাসি মুখেই যিনি সব সহ্য করতেন।

এখন মঞ্জু মাকে অন্য চোখে দেখতে শিখেছে। মা শুধু মা নয়, সরোজিনী নামের এক প্রৌঢ়া। এই মহিলা একজনের জীবনকে নষ্ট করেছে, ব্যর্থ করেছে। সবচেয়ে বড় আঘাত দিয়েছে সেই মানুষটিকে যাকে সবচেয়ে বেশি প্রশ্রয় দেওয়া উচিত ছিল।

মঞ্জু আজকাল মাকে বিচার করে। আর বিচার করলে মায়ের ওপর রাগ ঘৃণা ছাড়া সত্যিই আর কিছু হয় না। বাবার জীবনকে, বাবার মনকে এই মহিলা —তার মা, কোনোদিন জানতে চায়নি ; চিনতে পারে নি। সেই মানুষটা যে তার কে, তার কী দরকার, স্ত্রীর কাছে কী চায়—সরোজিনী কখনো তা ভাবেনি। ভাববার প্রয়োজন মনে করেনি। বাবা বলেছিলেন—'সংসারের দাবা খেলায় তিনি মন্ত্রী হারিয়েছিলেন।' বড় দুঃখে এই বয়সে মেয়ের কাছে নিজের জীবনের এই গভীর দুঃখ ও অভিমান প্রকাশ করে ফেলেছিলেন তিনি। মা কি সে-কথা জানে! জানে বাবার এই অন্তরের শূন্যতার জন্যে কে দায়ী!…না, জানে না ; জানবেও না কোনোদিন।

মৃণালের কথায় মঞ্জুও চমকে উঠল। মৃণাল বলছিল, 'মৃগাঙ্কবাবু এসেছিলেন—?'

মঞ্জু দাদার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল।

সরোজিনী বললেন, 'ছেলেটিকে এই আমি প্রথম দেখলাম। আমার মনে হচ্ছে একে আমি আগে কোথায় যেন দেখেছি।' সরোজিনী ভাববার চেষ্টা করলেন।

মঞ্জু মায়ের দিকে চাইল। থান কাপড়ে রুক্ষ' চুলে মাকে যেন কেমন দেখাচ্ছে।

মৃণাল একটু ইতঃস্তত করে বললে,—'তোর সঙ্গে ক'টা কথা বলতে এলুম, মঞ্জু।'

মঞ্জু দাদার দিকে তাকাল।

মৃণাল মুখে একটু হাসি টেনে বললে, 'তুই তো আজকাল বেশ বড় হয়ে উঠেছিস।—সংসারের কথাবার্তা বুঝতে পারবি।'

সরোজিনী বললেন, 'যা হ'ল—এর পর না বুঝে আর উপায় কি! আমাদের ভাগ্য যেমন।'

মৃণাল একটু চুপ করে থেকে খুব হতাশ গলায় বললে, 'বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন ঘুণাক্ষরেও আমরা কিছু জানতে পারি নি। বাবা মারা যেতে না যেতেই জানতে পারছি। আর যা জানছি, যত জানছি—আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমি পাগল হয়ে যাব।—তুই জানিস মঞ্জু, বাজারে বাবার দেনা কত?'

'জানি।' মঞ্জু ছোট্ট করে জবাব দিল।

'জানিস!' মৃণাল অবাক। বোনের মুখের দিকে খানিকক্ষণ অপলক চোখে চেয়ে রইল।

সরোজিনীও বিস্মিত হয়েছিলেন। বিস্মিত চোখেই মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন।

'কোথা থেকে তুই জানলি?...তোর বৌদি বলেছে?' মৃণাল প্রশ্ন ক'রল।

'না।—বাবার মুখ থেকেই আমি শুনেছি।'

'বাবার মুখ থেকে?'—মৃণাল যেন পায়ের তলায় মাটি পাচ্ছিল না।

সরোজিনী বললেন,—'তোমায় এ-সব কথা তিনি কবে বললেন? তুমিও তো আমাদের কিছু বলো নি।' সরোজিনীর গলায় আহত হওয়ার সুর ছিল।

'খুব বেশিদিন আগে নয়। একদিন নিজের থেকেই বাবা আমায় বলেছিলেন।' মঞ্জু বললে,—'তিনি তোমাদের বলতে চান নি। বলেছিলেন, ওরা শুনলে ভীষণ কষ্ট পাবে।'

মৃণাল ম্লান হাসলো,—'আর এখন জেনে আমরা পরম শান্তিতে আছি, না—?'

সরোজিনী বললেন, 'আমরা পথে দাঁড়াবো। দাঁড়াবো কেন দাঁড়িয়ে আছি—এ-কথাটা যদি তোমাদের বাবা আগে বলতেন, আমরা তৈরি হতে পারতুম। কিন্তু এখন—'

'তোমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছ এ-কথা তো তোমরাও কোনোদিন খোঁজ করতে যাও নি। তাঁর আর দোষ কি?'

'না, দোষ যত আমাদের। তিনি বাড়ির বাইরে কোথায় সাততলা স্বর্গ গড়ার স্বপ্ন দেখছেন, আমরা সে-কথা জানতে যাব।'

সরোজিনীর কথার মধ্যে থেকে সেই মেয়ে ফুটে উঠলো,—মঞ্জু বাবার মুখ থেকে শুনে যে আত্মসুখী, নিশ্চিন্ত, হৃদয়হীন সরোজিনীকে চিনতে পেয়েছে! মায়ের কথাটাই শুধু খারাপ লাগল না, মায়ের ওপর কেমন একটা বিশ্রী ঘৃণাও হচ্ছিল মঞ্জুর। মঞ্জু চুপ করে থাকতে পারল না। বললে, 'নিজের জন্যে বাবা স্বপ্ন দেখেন নি, মা। তোমাদের সংসারের জন্যে, তোমরা যাতে সুখে থাকতে পার তার জন্যেই এই ঝুঁকি নিয়েছিলেন।'

মৃণাল বিরক্ত হচ্ছিল। বললে, 'তোমাদের কথা কাটাকাটি থাক। আচ্ছা মঞ্জু, বাজারে বাবার দেনা কত?—তিনি নিজের মুখে কি বলেছেন?'

'সত্তর আশি হাজার টাকা।' মঞ্জু বললে।

মৃণাল স্তব্ধ হ'য়ে বসে রইল। তার মুখের সমস্ত রক্ত কে যেন শুষে নিয়েছে। সাদা মুখ; চোখ দুটোও নিশ্চল, সংজ্ঞাহীনের মতন।

অনেকক্ষণ আর ঘরে কেউ কোনো কথা বললে না। বলতে পারল না। ঘরের আবহাওয়া ভয়ংকর গুমোট হ'য়ে উঠল।

শেষে মৃণাল বললে, 'এতো টাকার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। বাবার শ্রাদ্ধে কম করেও চার-পাঁচশো টাকা খরচ পড়বে—তাই যোগাড় করতে পারছি না। আমার নিজের এক পয়সাও নেই। থাকবে কোথা থেকে, আমি নিজে কখনো টাকা জমাই নি। যা মাইনে পেয়েছি মায়ের হাতে এনে দিয়েছি। নিজে যা পেতাম—চা, সিনেমা, সিগারেটে উড়িয়ে দিতাম।'

একটু থামলো মৃণাল। ক্লান্ত হতাশ কণ্ঠে বললে আবার, 'আমাদের বাইরের অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে যদি শ্রাদ্ধ করতে হয় বাবার—দেড় হাজারেও কুলোবে না। কিন্তু বাইরের অবস্থায় আর আমাদের কি যায় আসে। তাই মোটামুটি একটা হিসেব ক'রেও দেখলাম—শ' চার-পাঁচ টাকা লাগে শ্রাদ্ধে।—আমাকে শেষ পর্যন্ত বউয়ের গয়নাই বিক্রি করতে হবে।'

মঞ্জু বাধা দিল। বললে, 'না—না—বৌদির গয়নায় তুমি হাত দিয়ো না, দাদা। সেটা খুব অন্যায় হবে। ওর বাপের বাড়ি থেকে পাওয়া গয়নায় আমাদের হাত দেবার কোনো অধিকার নেই। তা ছাড়া তাঁরাই বা কি বলবেন! তার চেয়ে আমার গয়নাগুলো তুমি বরং নিয়ে যেও। আমার গলার হার, চুড়ি, রুলি—সবই তো আছে।'

সরোজিনী বললেন, 'তারপর—? তুমি কি যোগিনী সেজে থাকবে! তোমার বিয়ে থা' নেই?'

'বিয়ে!'—মঞ্জু এতো দুঃখেও হাসলো।

'হ্যাঁ, তোমার বিয়ে দেওয়া আমাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। বিরাট ভার। এমন নয়, তোমাকে আর আমরা পড়াতে পারব। ঘরে বসে থেকে তোমার জীবনে কি হবে, মঞ্জু? তার চেয়ে নিজের সংসার-ঘর পাত। আমরা ভিখিরী হই, খাই না খাই—তুমি তো সুখে শান্তিতে থাকতে পারবে।'

সরোজিনী একটু থামলেন। বললেন আবার, 'অচলার সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল। আভাসে আমি যা বুঝলাম, ওই ছেলেটির খুবই আগ্রহ রয়েছে এখনো। সবই সে জানে। তোমার বাবা বেঁচে থাকলে তোমায় আমরা আমাদের বাড়ির যোগ্য করেই পাঠাতুম। তা যখন পারছি না—আর মিথ্যেও বলছি না—তখন আমাদের লজ্জা কি! মৃগাঙ্ককে তুমি বিয়ে কর। তাতে তোমার ভাল হবে। আমাদেরও।'

মঞ্জু কোনো কথা বললে না।

মৃণাল বললে, 'আমি তোর দাদা, মঞ্জু—আমার মনের একটা কথা তোকে বলি। আমার যদি সামর্থ থাকত, এই ছেলের সঙ্গে আমি তোর বিয়েতে মত দিতাম না। মৃগাঙ্কবাবুর বয়স যা, তাতে তোর সঙ্গে ভালো মানায় না। এটাও অবশ্য ধরতাম না, যদি ভদ্রলোক অন্ধ না হ'তেন। অন্ধ স্বামী নিয়ে আজীবন সংসার টানা যে কী কষ্টের—' মৃণাল কথাটা শেষ করতে পারল না। তার মুখে নিখাদ স্নেহ মমতার এবং দুঃখের রেখা ফুটলো।

মঞ্জু কি ভাবছিল। দাদার মুখ থেকে বার বার অন্ধ শব্দটা শুনতে তার বিশ্রীই লাগছিল। মঞ্জুর মনে হোল—এতে সে কষ্টই পাচ্ছে।

কি যেন ভাবতে ভাবতে মঞ্জু মায়ের দিকে একবার তাকিয়ে মৃণালকে

বললে,—'বিয়ে করার কথা আমি ভাবছি না, দাদা। কিন্তু অন্ধতে কি যায় আসে! কেউ এমনি অন্ধ, কেউ চোখ থাকতেও অন্ধ। সংসারে চোখ-না-থাকা অন্ধের চেয়ে চোখ-থাকা অন্ধই বেশি।'

সরোজিনী এই ঠেস্ দেওয়া কথাটা বুঝতে পারলেন। বিরক্ত মুখে বললেন, 'কথা তুমি অনেক শিখেছ আজকাল। মৃগাঙ্ককে বিয়ে করলে শাড়ি বাড়ি গয়না আমার হবে না। আমরা তোমার উথলে-ওঠা সুখের কড়ায় হাতা ডুবিয়ে সুখ খাব না।'

'তুমি অযথা বাড়াবাড়ি করছ মা।' মৃণাল সরোজিনীকে বাধা দিল, 'কালই আর বিয়ে হচ্ছে না। শ্রাদ্ধ-শান্তি যাক—দু'দিন সময় দাও মঞ্জুকে। তার জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার আমরা কে—! ও ভাবুক। যা ভালো বোঝে করবে।'

সরোজিনী আর কোনো কথা না বলে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

মৃণাল বলল, 'বাবার দেনার কথা ভাবলে আমার চোখের সামনে সমস্ত তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। এ-দেনা সারা জীবনেও আমি শোধ করতে পারব না। করা অসম্ভব। কোথা থেকে ক'রব, মঞ্জু। এ দেনার দায়িত্ব আমি নেব না। বাবার নিজস্ব যা আছে, তাঁর অফিসের প্রভিডেণ্ট ফণ্ড-টণ্ড—পাওনাদাররা তাই নিয়ে টানাটানি করুক। আমি নিঃস্ব—আমার নেবারও কিছু নেই, দেবারও কিছু নেই।'

মঞ্জু একটু ভেবে বললে, 'এ-দেনা শোধ করতে না পারলে লোকে যে চোর বলবে বাবাকে, ঠগ জোচ্চোর কত কি বদনাম দেবে।'

'তা দেবে। কিন্তু দিলেও আমাদের উপায় নেই। সত্তর আশি হাজার টাকা যে কতো, তুই কি তা জানিস, মঞ্জু! আমাদের যদি একটা বাড়ি থাকত, জমি-জমা থাকত—বিক্রী করে দিয়ে যতটা পারতাম দেনা শোধ করতাম। কিন্তু কিছুই যে আমাদের নেই।'

'সম্পত্তি না থাক, সততা থাক দাদা—' মঞ্জু আবেগ ভরে বললে।

'গল্পের সেই দেনা শোধের কথা বললি, মঞ্জু। সততা আমাদের আছে। কিন্তু তার চেয়ে আমার মা, বোন, বউ—একটা ছেলেপুলেও তো হবে তোর বৌদির শুনছি—এদের থাকা, খাওয়া-পরা—আপদ বিপদ—এ-সব দায়িত্ব পালনই কি কম নাকি? আমার যা আয়—তাতে বাড়ি ভাড়া দিয়ে এতগুলো মানুষের খেতে পরতেই তো সব যাবে—দেনা শোধ ক'রব কি দিয়ে। তাও দু' পাঁচশো টাকার নয়, সত্তর আশি হাজার।'

মৃণাল মাথা নাড়ল,—'যা হবার নয়, তা নিয়ে ভেবে লাভ নেই।'

মঞ্জু চুপ। দাদাকে বড় অসহায়, বড় দুঃখী মনে হ'চ্ছিল তার। ভীষণ ভেঙে পড়েছে ও।

মঞ্জু আস্তে আস্তে এসে মৃণালের পাশে দাঁড়াল। তার রুক্ষ এলোমেলো চুলে হাত দিয়ে যেন জট ছাড়াতে লাগল। বললে, 'অতো ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন দাদা। আমিও তো তোমার পাশে আছি। চাকরি-বাকরি আমায় একটা জুটিয়ে দাও।'

মৃণাল বোনের মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর ওর হাতটা টেনে নিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে।

শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকল। সদানন্দ রোডের বাড়ি আবার তার নিত্যকার ছন্দ তুলল। যদিও এ-ছন্দ আর আগের মত মিঠে নয়, অনায়াস প্রবাহিত নয়। তবু ছন্দ বাজলো। হয়ত বা খানিক রুক্ষ, রূঢ়, কর্কশ। তবু ছন্দ—জীবনেরই।

দিন কাটছিল। মঞ্জু বাড়িতেই থাকে চুপচাপ।...ভাবে। ভাবনার এখনো শেষ হয়নি।

বাবা মারা যাবার পর সুরজিৎদা' এসেছিলেন। একবার না, কয়েকবারই। শ্রাদ্ধের দিনও এসেছিলেন। কিন্তু তখন দেখা-সাক্ষাৎ হ'লেও মামুলি কথা ছাড়া কথা হয় নি অন্য কিছু। অথচ সুরজিৎদা'র সঙ্গে মঞ্জুর একটা পরামর্শ ছিল। অন্তত মঞ্জু মনে করেছিল সুরজিৎদা'র কাছে সে একটা পরামর্শ নেবে। নেওয়া হয়নি তখনও, আজ পর্যন্ত আর হ'লোই না।

পরামর্শের এখনও কি দরকার আছে? মঞ্জুর মনে হয়, হ্যাঁ—আছে। ক'দিন ধরেই ভাবছে মঞ্জু এবার একবার যাবে, সুরজিৎদা'র বাড়ি যাবে।

সেদিন গেল মঞ্জু। একটু বিকেল করেই। সুধা বৌদির বাড়ি ফেরার সময়। হ্যাঁ, সুধা বৌদির অসাক্ষাতে আজ আর সে যেতে চায় না। তার উপস্থিতিতেই যেতে চায়।

মঞ্জু সুরজিতের বাড়ি পৌছল যখন—বিকেল বেশ ঘন হয়ে উঠেছে, সুধা বৌদি সবে ফিরেছে অফিস থেকে।

মঞ্জুকে দেখে সুধা বললে, 'এই যে—। তারপর কি মনে করে হঠাৎ!'

'এলাম।' মঞ্জু একটু হাসল।

'যাঁর জন্যে এলে তিনি তো বাড়ি নেই।' সুধা অন্য রকম ভাবে হাসলো।

'সুরজিৎদা' কেন, আপনিও তো থাকেন এ-বাড়িতে, আপনার সঙ্গেও কি দেখা করতে আসতে পারি না!' মঞ্জু নিজেকে সহজ করবার চেষ্টা করছিল।

'আমার সঙ্গে দেখা'—সুধা ভাল করে মঞ্জুকে দেখল। বললে, 'আমরা দেখা করার পাত্র নই। যাক্‌গে, বসো তুমি। উনি আসবেন এখুনি, কাকে যেন এগিয়ে দিতে গেছেন।'

সুধা বসল না। সুধার বাচ্চাদের সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করল মঞ্জু। পারলো না।

সুরজিৎ এসে প'ড়ল এমন সময়। মঞ্জুকে দেখে মুখে একটু হাসি খেলে গেল।

'আরে মঞ্জু যে—! কি ব্যাপার? আবার 'উন্মেষ' নাকি? এসো, ঘরে এসো। ও সুধা, একটু চা খাওয়াবে নাকি আমাদের!'

সুরজিতের ঘরে গিয়ে বসল মঞ্জু। তেমনি ঘর। সেই চেহারা। বিশৃঙ্খল, নোঙরা। কিন্তু একদিন এই বাড়ি-ঘর যত খারাপ লাগতো মঞ্জুর, আজ আর অত খারাপ লাগছিল না। নিজেও তো সে আজ এমনি অবস্থার মধ্যে পড়েছে।

দু' পাঁচটা সাধারণ কথার পর আস্তে আস্তে মঞ্জু কথাটা তুললে।

সুরজিৎ শুনল চুপ করে। বললে, 'মৃণালের কাছে আমি সব শুনেছি, মঞ্জু। সে আমায় সমস্তই বলেছে।'

'এখন আমি কি করি বলতো, সুরজিৎদা'?—একটা কিছু না করলে আমি বাঁচবো না।'

'আমি কি বলবো?' সুরজিৎ এড়িয়ে যেতে চাইল।

'কিছু বলবে না?…তোমার বলার কিছু নেই! পরামর্শ দিতে পার না একটা!'

মঞ্জুর মুখে অভিমান ঘন হচ্ছিল।

সুরজিৎ মঞ্জুর দিকে চাইল একটুক্ষণ। মুখ ফিরিয়ে নিজেরই আঁকা একটা ছবি দেখলো। ভাবছিল দেখতে দেখতে। বললে হঠাৎ, 'আমি যা বলবো তুমি কি তাই শুনবে? তা' যদি হয়, আমি ভেবে দেখেছি, তোমার বিয়ে ক'রাই ভাল।'

'বিয়ে?' মঞ্জু কেমন করে যেন তাকালো।

সুরজিৎ বললে,—'তা ছাড়া আর কি তুমি করতে পার?'

মঞ্জু বুঝতে পারছিল না সুরজিৎদা' তার সঙ্গে তামাশা করছে না আর কিছু।

'তুমি আমায় ঠাট্টা করছো?' মঞ্জু ক্ষুব্ধ হয়ে বললে।

'না।'—সুরজিৎ মাথা নাড়লো, 'এ অবস্থায় তোমার করার কি আছে। তোমার বাবার দেনা শোধের দায়িত্ব তোমার নয়। তোমার দাদাই যখন সে দায়িত্ব নিতে পারছে না তার সাধ্যাতীত বলে, তখন তুমিই বা কোন সাহসে সে দায়িত্ব নেবে? নিলেও পারবে না, মঞ্জু। চাকরি করে আশি হাজার টাকা দেনা শোধ করা যায় না।'

সুধা চা নিয়ে এল। সুরজিৎ চায়ের পাত্রটা হাত থেকে নিতে নিতে সুধাকে বললে,—'তোমার একটা চিঠি এসেছে। দেখেছো?'

'না। কার চিঠি?' সুধা মঞ্জুর হাতে চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে স্বামীর দিকে তাকালো।

'তা তো দেখিনি। মনে হলো কোনো অফিস-টফিসের হবে।'

সুধা বই চাপা দেওয়া চিঠিটা উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটলো। তারপর সুরজিৎ বললে, 'কোনো কোনো মানুষের ভাগ্য এ-রকম হয়, একদিকে ভাঙে একদিকে গ'ড়ে ওঠে। আমি একে মন্দ ভাগ্য বলি না। বেশির ভাগের শুধু ভেঙেই চলেছে।' সুরজিৎ কথা শেষ করে নিশ্বাস ফেললো।

মঞ্জু সুরজিৎকে দেখছিল। কেমন যেন ম্লান হয়ে এসেছে সুরজিৎদা'র মুখ।

'আমার কপালে যা তুমি গড়া দেখেছ আসলে সেটাও ভাঙা বৈ আর কিছু নয়, সুরজিৎদা।' মঞ্জুর গলার স্বর মৃদু, বিষণ্ণ হয়ে উঠলো।

'কেন? একটা খুঁত বাদ দিলে তুমি যাকে বিয়ে করবে তার তো সবই আছে। রূপ, অর্থ, গুণ—'

'অন্যের খুঁতই সব নয়, মানুষের নিজেরও কোন খুঁত থাকে বৈ কি।'

মঞ্জু কি বলতে কি বলে ফেলে হঠাৎ ভীষণ আড়ষ্ট হয়ে পড়ল। মুখ নিচু করে বসে রইল। তাকাতে পর্যন্ত পারছিল না। মনে হচ্ছিল তাকালেই যেন তার খুঁত খুব স্পষ্ট করে সুরজিৎদা'র কাছে ধরা প'ড়ে যাবে।

সুরজিৎ যে কথাটা অতি সহজেই বুঝতে পারবে, মঞ্জু ভাবে নি। কিন্তু দেখা গেল সুরজিৎ বুঝেছে। সুরজিৎ বললে,—'ওইটুকু খুঁত তোমার থাক; না থাকলে আমাদের ভুলে যাবে যে, —বলে একটু হাসলো। কথাটার ভিতরকার অর্থ গভীর হলেও অন্তত কথার একটি দুটি অন্য রকম বুনুনীতে যেন সরল করে ফেলা গেল। হ্যাঁ, মঞ্জুর মুখোমুখি এই ঘরে বসে এর বেশি সে কি-ই বা বলতে পারে!

আরও একটু চুপচাপ বসে থেকে মঞ্জু উঠলো। কেন যে এসেছিল মঞ্জু সুরজিৎদা'র কাছে—স্পষ্ট করে নিজেই সে জানে না। কিন্তু অনুভব করতে পারছে এখন,—যাবার সময় কী যেন একটা আশা ক'রে সে এসেছিল, সে আশা তার পূর্ণ হ'ল না। মনে হচ্ছে, মঞ্জুর কোনো কামনা ব্যর্থ হয়ে গেল। বুকের ভেতরটা এ-রকম শূন্য হয়ে যাবে তা' কে জানতো। না, বেশ কষ্ট হচ্ছে মঞ্জুর। কান্নাই পাচ্ছে।

মঞ্জু উঠলো। মুখ নিচু করে খুব মৃদু গলায় বললে,—'বিয়ে যদি আমি করি-ই, নিজের সুখ সুবিধের জন্যে করব না সুরজিৎদা'। আমার আর একটা সাধ আছে, স্বপ্ন আছে—সেই জন্যেই ক'রব।' মঞ্জুর চোখে জল এসে গিয়েছিল কথাটা বলতে গিয়ে। অনেক কষ্টে সামলে নিল।

'আমি জানি, মঞ্জু। শুনেছি।' সুরজিৎ চাপা গলায় বলবার চেষ্টা ক'রল।

আঁচলে মুখ মুছে মঞ্জু বাইরে এল।

বাইরে এসে সুধাকে সে দেখতে পেল—সুধা চুপটি করে দাঁড়িয়েছিল।

মঞ্জু বিদায় চাইল,—'সন্ধ্যে হয়ে এল। আজ চলি বৌদি।'

সুধা একদৃষ্টে দেখছিল মঞ্জুকে। হঠাৎ বললে, 'তুমি বাড়ি ফিরবে তো?'

—'হ্যাঁ।'

'একটু দাঁড়াও। আমিও বাইরে যাব একবার। একটা কাজ আছে।'

মঞ্জুকে কথা বলার অবসর না দিয়েই সুধা ঘরে ঢুকে গেল। খুব তাড়াতাড়ি ফিরে এল। শাড়িটা বদলে নিয়েছে। চটিটা পায়ে গলিয়ে বললে,—'চলো।' বাচ্চাগুলো কান্না জুড়ে দিয়েছিল। সেদিকে কান না দিয়ে সুধা আগে আগেই বাইরে বেরিয়ে গেল।

রাস্তায় এসে কেউ কোনো কথা বললে না। গলি শেষ হয়ে বড় রাস্তা। মঞ্জু ভেবেছিল, এখানে সুধা বৌদির সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হবে। তাও না।

সুধা বললে, 'চলো কাছেই একটা ছোট পার্ক আছে, সেখানে গিয়ে বসি।'

মঞ্জু অবাক। বললে,—'সন্ধ্যে হয়ে গেছে, সুধা বৌদি···বাড়িতে ভাববে যে।'

'এমন কিছু রাত হয়নি। আর তুমিও ত' কচি খুকি নও। এসো, তোমার সঙ্গে ক'টা কথা আছে।'

সুধা বৌদির মুখের দিকে তাকিয়ে তার গলার স্বর শুনে মঞ্জু আর কিছু বলতে সাহস ক'রল না।

পাশাপাশি হেঁটে দুজনে ছোট মতন সেই পার্কে এল।

পার্কে এমনিই লোক কম। তবু নিরিবিলি একটা জায়গা খুঁজে বসল সুধা। চুপচাপ কাটলো খানিক। তারপর সুধাই বললে,—'তোমার সঙ্গে আমার খোলাখুলি ক'টা কথা হয়ে যাওয়া ভালো, মঞ্জু। এ আমার সহ্য হচ্ছে না।'—সুধার গলায় অসহ্য জ্বালা।

'কি বলছেন বৌদি আপনি ?'

'যা বলছি তা তুমি ভালো করেই জান। ন্যাকামি করো না, ঢঙ করে কথা ব'লো না। তোমার যা বলবার স্পষ্ট করে বলো। আমার যা বলবার, লুকোচুরি না করেই আমি বলব।'

শুনতে শুনতে মঞ্জুর মনেও অকস্মাৎ কেমন এক রূঢ়তা এল। —'বেশ, বলুন আপনার যা বলবার আছে।'

'তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।...তুমি ওঁকে ভালোবাস !'

প্রশ্নটা এত স্পষ্ট এবং রূঢ় যে মঞ্জু চমকে উঠলো। সুধার মুখের দিকে তাকালো। জ্বলজ্বলে তীক্ষ্ণ দুই চোখ নিয়ে তার দিকে চেয়ে আছে সুধা।

মঞ্জু জবাব দিতে পারল না।

একটু অপেক্ষা করে সুধা অসহিষ্ণু স্বরে বললে, 'কি—কথা বলছো না যে !'

'আমি জানি না।' মঞ্জু ছোট্ট করে বললে।

'জানো না—তবে যে সেদিন ছুটে বলতে এসেছিলে ওঁকে—পাঁকে কুড়িয়ে পাওয়া তোমার পদ্মটিকে সকলের চোখের সামনে তুলে ধরতে চাও !'—সুধার খর গলায় ব্যঙ্গে খরতর শোনালো।

'চেয়েছিলাম...তখন ভেবেছিলাম আমি পারব। এখন দেখছি সে সাধ্য আমার নেই।'

'কেন চেয়েছিলে তখন,—সখ...সৌখিনতা...খেলা...মনের আনন্দের জন্যে ?'

'সখ ? ছি-ছি বৌদি ; এ তুমি কি বলছো ? সুরজিৎদা' গুণী লোক, তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করতে, তাঁর মর্যাদা তাঁকেই আমি দিতে চেয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ, কিন্তু কেন ? হয় দয়া না হয় অনুরাগ—এ বই তো নয় !'

'শ্রদ্ধাও তো হ'তে পারে !'

'শুধু শ্রদ্ধায় এত হয় না, মঞ্জু। আমি তোমায় কিছু কম চিনি নি।

শ্রদ্ধায় যদি এতোই গদগদ তুমি, তবে মৃগাঙ্কবাবুকে বিয়ে করতে পারছ না কেন—কোন্ খুঁতের কথা বলতে এসেছিলে আজ, মৃগাঙ্কবাবুর না তোমার নিজের ?'

মঞ্জু নির্বাক। সুরজিৎদা'র সঙ্গে তার কথার সবই শুনেছে সুধা বৌদি লুকিয়ে লুকিয়ে! সন্দেহ হওয়ার মতন কোনো কথা তারা কেউই পারতপক্ষে বলতে চায় নি। তবু অমন সময় মনের ওপর কতখানি হাত রাখতে পারে মানুষ। দু-একটা কথা না জেনে না বুঝে আচমকা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে বই কি!

মঞ্জু বুঝতে পেরেছিল, এখন বরং দরকারের বেশি স্পষ্ট হওয়াই ভালো, তবু ভীরুতা ভালো নয়। তাছাড়া সুধা বৌদি তাকে পেয়েছে কি! নিষ্ঠুরের মতন আঘাতের পর আঘাত করে যাবে, আর সে মুখ বুজে থাকবে!

মঞ্জু উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। সুধাকে আঘাত দেবার জন্যেই বাঁকাস্বরে বললে,—'আড়িপাতা আপনার স্বভাব জানলে ঘরের বাইরে গিয়ে কথা বলতাম।'

'তাই বা না নিয়ে গেছ নাকি! ঘরের বাইরেই তো টেনে নিয়ে গেছ।···আমার ঘরের মধ্যে তোমার শিল্পী আর নেই ···কিন্তু···কিন্তু এ আমি সহ্য করতে পারছি না। হয় তুমি তাকে পুরোপুরি নিয়ে যাও। আমি বাঁচবো তাতে। আমার রক্ত দিয়ে আমি তাকে বাঁচিয়ে রাখব আর তুমি তার মন নিয়ে চোর চোর খেলবে এ হয় না।···আমি সোজা কথা বলছি মঞ্জু, হয় ওঁকে তুমি নিয়ে চলে যাও বরাবরের মতন, না হয় ছেড়ে দাও চিরকালের মতন।'

সুধার গলার স্বর বুজে এল।

তুজনেই নীরব। পার্কের মধ্যে একটা ছোট ঘূর্ণি উঠেছে। ধুলো বালি খড় কুটো উড়ছে। মঞ্জুর চোখের মধ্যে কী একটা পড়ল যেন। করকর করছে।

এবার মঞ্জুই বললে, 'যদি আমার সাধ্যে কুলতো তাই আমি নিতাম বৌদি। সুরজিৎদা'র এ অপমৃত্যু আমারও সহ্য হয় না।'

'না হবারই কথা। দূর থেকে পরের বাড়িতে মাথা গলিয়ে—সখ করে ভালোবাসা আর ভালোবাসার পাত্রকে তিলে তিলে মরতে দেখা খুব সহজ, মঞ্জু। কিন্তু বলতে কি, তুমি যা ভাব তা নয়। তোমার সুরজিৎদা' নাম-মুখে-আনার মতন একজন শিল্পীও হয়ত নয়।'

'কেউ বলছে বুঝি আপনাকে?' মঞ্জু বিদ্রূপ করতে চাইল।

'আমায় হয়ত কেউ বলে নি। কিন্তু তোমাকেই বা কে বললে উনি অবনী ঠাকুর? কিসের জোরে তুমি ওঁর বিচার করছ?···কি জান তুমি ছবির, তোমার চোখ ভালোমন্দ চেনার কতটুকু শিখেছে? নিজের মনে মনে যাকে নিয়ে তাজমহল গ'ড়ছ সে হয়ত নিছক বাজে পাথর!'

মঞ্জু চমকে উঠল।···সত্যিই তো, সুরজিৎদা'র প্রতিভার বিচার করার সাধ্য কি তার আছে! তার চোখে ভালো লাগে বলেই কি রাজ্যের মানুষ ওঁকে নিয়ে নাচানাচি করবে?—কই, কোথাও তো সুরজিতের নাম শোনেনি মঞ্জু। আর দাদাও কখনো এমন কথা বলেনি যাতে মনে করা যেতে পারে, সুরজিৎ একজন সত্যিকারের বড় শিল্পী, তার অসাধারণ প্রতিভা আছে!

ভাবতে গিয়ে মঞ্জু খেই হারিয়ে ফেলছিল। আর হঠাৎ মনে হচ্ছিল, তার ভেলাটা যে পল্‌কা নয় এর প্রমাণ কি! মঞ্জুর মনে এই প্রথম একটা সন্দেহ উঁকি দিল।

সুধা আবার কথা শুরু করলে। বললে,—'আর একটা কথা তোমায় বলি। তোমার সুরজিৎদা'কে আমিও ভালোবেসে-ই বিয়ে করেছিলাম।

তিনিও অন্তত তখন ভালোবেসেছিলেন আমাকে··· তাই ত' জানতাম আমিও তোমার মতন কচি মন, অন্ধ চোখ নিয়ে ভেবেছিলাম—আহা এই শিল্পী একদিন জগৎসভা আলো করবে। সত্যি, যা বলছি তাতে এক বিন্দু মিথ্যে নেই।···ওই মানুষটাকে তখন কী না ভেবেছি—কী· না ভাবতাম তাকে। ওর জন্যে আমায় কতো করতে হয়েছে-·তুমি নিজেই তাকে জিজ্ঞেস করতে পারো · আজও কি না করছি। চাকরি করছি, সংসার টানছি, ছেলেপুলে সামলাচ্ছি—ওর খাওয়া, পরা, সিগারেট, ছবি আঁকার কাগজ, রঙ পর্যন্ত কিনে দিতে হয়। কিন্তু কি হ'লো? এতো কষ্টের পর আমি কি পেলাম?···কিচ্ছু না ··কিচ্ছু না···।'

কথা বলতে বলতে সুধার গলা আটকে এল—অভিমানে, বেদনায়, অশ্রুতে, নিজের ব্যর্থতায়।

আবার খানিক চুপচাপ। মঞ্জুর মাথাটা ঠাস আর গরম হয়ে উঠেছিল। কিছু ভাবতে পারছিল না আর। পার্কের অন্ধকারের ওপর আর একটা অন্ধকার যেন নেমে এসেছে তার চোখে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মঞ্জু বললে,—'চলুন, ওঠা যাক, বৌদি।'

'উঠবে?—বেশ, ওঠো। —আর একটা কথা মঞ্জু তোমায় আমি জিজ্ঞেস করছি। ধরো, আমার ছেলেপুলে আমি নিয়ে স'রে গেলাম। কি করবে তুমি, তোমার সুরজিৎদাকে নিশ্চয় হাত বাড়িয়ে টেনে নেবে?'

মঞ্জু কোনো জবাব দিল না।

—'ওকে বিয়ে করবে নিশ্চয়।' সুধা বললে,—'সংসার পাতবে!'

মঞ্জু এবারও কোনো জবাব দিল না।

সুধা একটু থেমে বললে, 'তোমার শরীরে নিশ্চয় রোগ নেই—কাজেই ছেলেপুলে হবে—এবং একটা হয়েই বন্ধ হবে না নিশ্চয়! তোমার শিল্পীর আনন্দ অতো কমে মেটবার নয়! আর, তখন স্বামী ছেলেপুলে নিয়ে সংসারের অথৈ জলে কাদা ঘাঁটবে কে,···তুমি না

তোমার শিল্পী? দেখছ না আমার দিকে চেয়ে কে খাঁটছে, কাকে খাঁটতে হচ্ছে।'

মঞ্জুর বুক যেন আর বাতাসও টানতে পারছিল না। নিশ্বাস নিতেও ভুলে যাচ্ছিল ও।

সুধাই আগে উঠলো। মঞ্জুও উঠলো ঘাস ছেড়ে।

যেতে যেতে সুধা বললে,—'তুমি আমি মানুষ আলাদা—কিন্তু সেই একই মেয়ে। যে মেয়ের মন নরম, চোখে আছে মোহ, আছে অর্থহীন স্বপ্ন, আছে ভালোবাসা। আমি তোমার বয়সে যা যা ভেবেছি, করেছি—তুমি সেই সবই করতে যাচ্ছ।...পরিণামটা আমার দিকে চেয়ে দেখে নাও।'

সত্যি সত্যিই পার্কের গেটের কাছে এসে মঞ্জু থমকে দাঁড়িয়ে সুধাকে দেখল। এমন করে আগে কোনোদিন এই সুধা বৌদিকে দেখে নি। মঞ্জু অপলকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো। হায় নিঃস্ব মূর্তি! হা দরিদ্র, নিষ্প্রভ, রিক্ত চেহারা, বেশভূষা! সর্বস্ব—এমন কি শরীরের সবটুকু লাবণ্যও নিঃশেষে উজাড় করে দিয়ে সুধা বৌদি একটা শুকনো গাছ কি লতার মত দাঁড়িয়ে আছে।...এতো সব কার জন্যে করেছে সুধা বৌদি? সুরজিৎদা'র জন্যই তো!

সুধা বৌদির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অকস্মাৎ ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললো মঞ্জু।

একটু বিমূঢ় বোধ করলো সুধা।—তাড়াতাড়ি একটু অন্ধকার জায়গায় টেনে নিয়ে গিয়ে ধমকে উঠল, 'ছি ছি,—রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁদছ। লোকে দেখলে ভাববে কি! চোখের জল মুছে নাও।' মুখে বললে মুছে নাও—কিন্তু সুধা গভীর সহানুভূতিতে নিজেই চোখ মুছিয়ে দিল। তারপর মঞ্জুর একটা হাত টেনে নিজের পাশে পাশে চলতে লাগলো।

খানিকটা পথ হেঁটে এসে সুধা বললে,—'একটা কথা বলবো মঞ্জু?'

'বলো।' মঞ্জু আর 'বলুন' বললে না। সুধা বৌদিকে খুব ঘনিষ্ঠ মনে হচ্ছিল তার।

'মৃগাঙ্কবাবুকে তুমি বিয়ে কোরো না। যে অন্ধ, তাকে চিরকাল তুমি করুণা ছাড়া আর কিছুই করতে পারবে না। আর সে তোমায় তার ধনদৌলতের অহমিকায় তোমাকে বিয়ে করে কৃতার্থ করেছে ভাববে। ...তা ছাড়া, নিজের চোখে যে দেখে না—মন নিয়েই যার সব—মন দিয়ে যে দেখে—তার দেখা বড় তীক্ষ্ণ। অযথা তারা বেশি দেখে, বেশি ভাবে। তুমি' —

মঞ্জু আবার যেন চমকে উঠলো। বললে, 'সুরজিৎদা'র কথা মৃগাঙ্কবাবু জানেন, বৌদি।'

'তবে তো আর কথাই নেই। তোমার সুরজিৎদা'র মতলব তুমি তাঁর 'পেট্রন' হও—আর সে জন্য মৃগাঙ্কবাবুকে বিয়ে কর। আর তোমার অন্ধ মৃগাঙ্কবাবু জানেন তাঁর হবুস্ত্রী অন্য একজন পুরুষের শিল্প-প্রতিভার দীপ্তিতে চোখ ঝলসিয়ে বসে আছে।...এর ফল কি দাঁড়াবে, মঞ্জু? অন্ধ মৃগাঙ্কবাবুর না-চোখে-দেখা চোখে অনেক বেশি কিছু দেখবেন—সত্যিই যা চোখ থাকলে দেখতে পেতেন না।'

মঞ্জুর চোখের একটা ঘন পর্দা যেন সরে গেল। খুব স্পষ্ট একটা ছবি সে দেখতে পেল। দেখে শিউরে উঠলো।

বড় রাস্তায় এসে পড়েছিল দুজনে। ট্রামও আসছিল।

সুধা বললে, 'তোমার অনেক রাত করিয়ে দিলাম, মঞ্জু। এবার যাও।'

মঞ্জু ট্রামটা দেখতে দেখতে বললে,—'তুমি আমায় সত্যিই একটা পথ দেখিয়ে দিলে বৌদি।—দিশেহারা হয়ে অন্ধের মতন ঘুরছিলাম। ...মৃগাঙ্কবাবুকে অমি বিয়ে ক'রব না।'

সুধা হাসলো। বললে, 'একদিন আবার এসো, মঞ্জু। আজ শুধু তোমায় কষ্ট দিলাম।'

ট্রামটা এসে পড়েছিল।

মঞ্জু তাড়াতাড়ি বললে, 'তোমার কাছে যাবো, বৌদি—তবে বাড়িতে নয়। ও-বাড়িতে আর আমি কোনোদিন যাব না। তোমার অফিসেই যাব। ঠিকানাটা বলো।'

ঠিকানাটা কানে শুনে নিয়েই মঞ্জু ট্রামে উঠলো।

চোখের সামনে দিয়ে ট্রামটা চলে গেল দ্রুত গতিতে। সুধার চোখ কে জানে কেন ছল ছল করে উঠলো।

মেয়েমানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু যে মেয়েমানুষ, একথাটা বোঝবার মত বয়েস তখনো হয়নি মঞ্জুর, তাই সুধা বৌদির পরামর্শটাকেই সে মজ্জমান ব্যক্তির মত সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আঁকড়ে ধরলে। সঙ্গে সঙ্গে একটা গুরুভার যেন নেমে গেল তার বুক থেকে। কেবল সুরজিৎদা'র সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হ'লো না, মৃগাঙ্ককেও বিয়ে না করার সপক্ষে যে যুক্তি সুধা বৌদি দেখালে, তাকেও লুফে নিল। যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো।

স্ত্রীর মুখে স্বামীর চরিত্রের ওই রকম নিষ্ঠুর ও নির্লজ্জ সমালোচনা যত নিন্দনীয় হোক, মঞ্জু যেন একটা নতুন পথের দিশা পেল! ওঃ, একটা চিন্তার ঘূর্ণাবর্তে পড়ে যেন সে এই ক'দিনে দিশাহারা হয়ে গিয়েছিল। সত্যিকারের পরামর্শ কোথাও পায়নি। মা, বৌদি, দাদা সবাই তাকে একবাক্যে সেই অন্ধ ও প্রৌঢ় মৃগাঙ্কমৌলিকে বিয়ে করার পরামর্শই দিয়েছিলেন স্বার্থপরের মত। সে জানে—তাকে বিয়ে করলে বড়লোক

জামাইয়ের দ্বারা তাদের দুঃখ ঘুচবে। তাই বলে সুরজিৎদা'র কাছ থেকে মঞ্জু ঠিক ওই রকম জবাবটা আশা করেনি।···ভালই হলো, তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে সুধা বৌদি আজ তার সকল মোহ মুক্ত করে দিলে। অনেকদিন পরে বেশ সুস্থ মন নিয়ে বাড়ি ফিরলো মঞ্জু। দশদিনের মধ্যে আরো দু'দিন সুধা বৌদির অফিসে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করলে। যেটুকু সংশয় আর অনিশ্চয়তা তখনো মনের কোনে লেগে ছিল, বুঝি সুধা বৌদির ওই অতিস্পষ্ট উক্তির দাপটে ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

অল্পবয়সী তরুণী মেয়ের মন কাঁচা মাটির মত ভ্যাদভেদে ও তলতলে। সুধা বৌদি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তা ভালোভাবেই জানতেন। তাই সুকৌশলে মঞ্জুর মনটাকে এমনভাবে চটকে দ'লে দিলেন যাতে যে দাগ সেখানে পড়েছিল, তার আর কোন চিহ্ন না থাকে। কাঁচা মাটির দাগ সহজে মুছে যায় কিন্তু তরুণী মেয়ের নিষ্কলঙ্ক মনে যে দাগ প্রথমে লাগে—গোপন ক্ষতের মত ধীরে ধীরে একটু একটু করে তা যে সমস্ত মনটাকে কেমন ভাবে জীর্ণ করে ফেলে, বাইরের লোক ত দূরের কথা, মনের অধিকারিণী পর্যন্ত সে খবর জানতে পায় না। তাই মঞ্জু, বিশেষ করে যেদিন সুধা বৌদির সঙ্গে গল্প-গাছা করে বাড়ি ফিরতো, সেই দিনই যেন তাকে বেশ প্রফুল্ল দেখাতো। এদিকে বাড়িতে মঞ্জুর দাদা, বৌদি ও মা তার মুখের দিকে তাকিয়ে দিন গুণতে থাকেন···কবে সে নিজস্ব মতামত জানাবে!

একদিন, দু'দিন করতে করতে যখন একটা পুরো মাস কেটে গেল, বৌদি একদিন মঞ্জুর ঘরে ঢুকে নিজে থেকেই কথাটা বলে ফেললেন, —'কি ঠিক করলে ঠাকুরঝি বিয়ে সম্বন্ধে?'

মঞ্জুকে তেমনি নীরব দেখে আবার প্রশ্ন করলেন,—'তোমার দাদা

বলছিলেন, এত বড় বাড়ির ভাড়া টানা আর তার পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু তোমার বিয়েটার জন্যে অপেক্ষা করছেন···কাজটা এখান থেকে হ'লে সবদিক থেকেই মানসম্ভ্রম বজায় থাকে।

বৌদির হাতটা চেপে ধরে এবার মঞ্জু কেঁদে ফেললে।—'তুমি মেয়ে-ছেলে হয়ে কি করে মৃগাঙ্কবাবুকে বিয়ে করতে বলো! দাদা যা বলে বলুক কিন্তু তুমি হ'লে এক্ষেত্রে কি করতে!'

বৌদি উত্তর না দিতে পেরে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর শাড়ির আঁচল দিয়ে মঞ্জুর চোখের জল মোছাতে মোছাতে বললেন, 'আমি বলি কি বাবার দেনা শোধ করার দায়িত্ব তুমি ঘাড়ে নিয়ো না, বাবার যা কিছু আছে পাওনাদাররা তাই নিয়ে চলে যাক্—যত কিছু সমস্যা, সব ত ওই বাবার বিপুল দেনার জন্যে?'

'না-না তা হয় না বৌদি। বাবা যে নিজে মুখে আমায় বলে গেছেন।'

'তাহ'লে ও ছাড়া ত আর দ্বিতীয় কোন পথ আমাদের নেই ভাই!'

আবার মঞ্জুর চোখে জল এসে পড়লো। বললে,—'এ ছাড়া আর কোন পথ নেই,—সত্যি বলছো বৌদি?'

বৌদি কিছুক্ষণের জন্য চুপ করেই রইলেন। তারপর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন,—'জানি তুমি কি বলতে চাইছো, মনে মনে আমি অনেক আগেই তার কথাই চিন্তা করেছিলুম কিন্তু ভগবান সেখানেও বাদ সাধলেন! সুস্মিত ডাক্তার যে এতখানি নেমক্‌হারামী করবে —সত্যি বলছি, তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। ভেবেছিলাম, সত্যি বুঝি সে তোমার প্রেমে পড়েছে। নিজে থেকে তোমার যে ফটো তুলেছিল, সব সময় সেটা মনিব্যাগে করে বুক পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াতো। তোমার দাদাকে আমি পাঠিয়েছিলুম তার কাছে শনিবার বিকেলে। তিনি ফিরে এসে খবর দিলেন—আমাদের না জানিয়ে সে একেবারে বিয়ের দিন ঠিক করে ফেলেছে। দক্ষিণ ক'লকাতার

কোন্ বড় লোকের একমাত্র মেয়ের সঙ্গে নাকি এই মাসের একুশ তারিখে বিয়ে হবে। শুধু সুন্দরী মেয়ে নয়, তার ওপর বিশ হাজার টাকার যৌতুক এবং এমন কি মোটর গাড়িও দেবে।'

এই পর্যন্ত বলে একটু থেমে আবার একটা গভীর নিশ্বাস ফেলে বৌদি বললেন,—'টাকাটাই দেখছি সংসারে সব। প্রেমট্রেম সব বাজে! তাই বলছিলুম, একটু ভালো করে ভেবেচিন্তে মনটা ঠিক করে ফেলো ঠাকুরঝি।

কোন জবাব না দিয়ে বৌদির মুখের দিকে চেয়ে তেমনি কঠিন হয়ে বসে রইলো মঞ্জু।

হঠাৎ যেন বৌদির কণ্ঠস্বরে পরিবর্তন এলো। তিনি বললেন, —'অবশ্য এক্ষেত্রে কেবল সুস্মিত ডাক্তারকে দোষী করলে অন্যায় হবে। কেননা, তার দিকে আগ্রহের অভাব ছিল না ··বরং তুমি-ই অবিচার করেছো বরাবর তার ওপর, কখনো তাকে প্রশ্রয় দাওনি। আমি আড়াল থেকে অনেকদিন লক্ষ্য করেছিলুম যে তুমি মনে মনে তাকে পচ্ছন্দ করো না। সেই জন্যেই বোধহয় সে এইভাবে তোমার ওপর প্রতিশোধ নিলে।'

'দোহাই বৌদি, তোমার পায়ে পড়ি একটু চুপ করো। আমাকে কেবল একটু একলা থাকতে দাও।'

বৌদিও আর কথা না বলে তখনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পরদিন দুপুরে মঞ্জু সুধা বৌদির অফিসে গিয়ে হাজির হ'লো এবং কোন ভূমিকা না করে প্রথমেই বললে, 'বৌদি ভাই, তোমাদের অফিসে আমার একটা চাকরি করে দিতে পারো? আর এ বেকার জীবন বহন করতে পারি না।

নিমেষে সুধার চোখ দু'টো যেন হিংস্র হয়ে উঠলো।—'এমন সুন্দর তোর চেহারা, কোন্ দুঃখে চাকরি করবি!'

'বাবার দেনা আমি শোধ করবো চাকরি ক'রে ঠিক করেছি। এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই আমার বাঁচবার। তোমার অফিসে না হয় অন্য কোথাও যদি একটা কিছু জোগাড় করে দাও—আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো তোমার কাছে সুধা বৌদি।

সুধার কণ্ঠ দিয়ে এবার যেন আগুন ছিট্‌কে পড়লো।

'খবরদার, চাকরির নাম মুখে আনিসনি ভাই। বড় বেইমান পুরুষজাত! যদি একবার জানতে পারে যে চাকরি করেও তুই টাকা উপার্জন করতে পারিস তাহ'লে আর রেহাই দেবে না।—কেন দিবি এ সুযোগ স্বার্থপর পুরুষদের! বিনা মাইনের ঝি···রাঁধুনী, তার বহু সন্তানের জননী হয়েও নিস্তার নেই, আবার বাইরে থেকে টাকা রোজগার করে তাকে খাওয়াতে যাবি কোন দুঃখে! লজ্জা করে না ও কথা মুখে আনতে!···পুরুষ হয়ে জন্মেছে বলে কি ওরা আমাদের মাথা কিনে নিয়েছে?'

মঞ্জু তাকে মাঝপথে থামিয়ে বললে,—'কিন্তু তুমি ভুল করছো সুধাদি, আমি ত স্বামীকে পোষবার চাকরি চাইছি না। বাবার ঋণ শোধ করার জন্যে ও ছাড়া যে আমার আর উপায় নেই।'

'ভুল! এ সম্পূর্ণ ভুল ধারণা তোমার! চাকরিই করো আর মাস্টারী-ই করো, বিয়ে মেয়েদের করতেই হবে একদিন না একদিন। তাই আগে থাকতে সতর্ক করে দিচ্ছি, ওপথে না গিয়ে বিয়ে করে ফেল ভাই সময় থাকতে। তারপর দেখবি বাপের ঋণ শোধ করা কত সহজ। নইলে চাকরি করতে করতে বিয়ে করলে জীবনে আর কোন দিনই ছুটি পাবিনা। স্বামী একবার টাকার গন্ধ পেলে কিছুতেই রেহাই দেবে না তা থেকে।'

'তুমি কি নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই একথা বলছো, না অন্য…'

'শুধু নিজের নয়, আমার মত আরো অনেক চাকরি-করা মেয়ের কথা আমি জানি, তাই সাবধান করে দিচ্ছি। স্বামী তো দূরের কথা, বাপ-মাও রোজগারী মেয়েকে হাতছাড়া করতে চায় না। বিয়ে দিলে পাছে মেয়ের উপার্জনটা থেকে বঞ্চিত হয়, তাই মেয়ের জীবনকে নিস্ফল করে দিতে এমন কি বাপ মায়ের মনেও এতটুকু দুঃখ হয় না! ফলে কেউ কেউ ঘরে বাইরে জোয়াল টেনে মরে,—কেউ বা ব্যর্থ নারীত্বের যন্ত্রনায় হা-হুতাশ করে মরে। তাই প্রাণ থাকতে কোনো মেয়েকে আমি চাকরি করার পরামর্শ দেবো না কখনো।'

বলতে বলতে সুধার কণ্ঠস্বরের উত্তাপ যেন ক্রমশ বাড়তে থাকে। বলে,—'আর আমাদের বাল্যকালেও দেখেছি, কোনো একটা ভালো মেয়েকে পাবার জন্যে পুরুষের সে কি কঠোর সাধনা! তার শিক্ষাদীক্ষা, উপার্জন, বাড়িঘর বিষয়-সম্পত্তি, গহনার পুঁটুলি, আর নিষ্কলঙ্ক চরিত্র নিয়ে কি প্রতিযোগীতা পুরুষে পুরুষে! আর এখন সে জায়গায় কি হয়েছে ভেবে দেখ দেখি! ঠিক তার উল্টো…হ্যাংলামীর চূড়ান্ত! তার জন্যে তাদের মানমর্য্যাদা, ঘেন্নাপিত্তি কিছু নেই। বারবনিতারাও…

ঘৃণায় কণ্ঠ রোধ হয়ে আসে সুধার।

মঞ্জু নারীত্বের জগতে নতুন অতিথি। তার কাছে তাই সব কথাই কেমন বিস্ময়কর ঠেকছিল। সুধা বৌদির দিকে তাকিয়ে সে শুধু ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলে,—'বৌদি কি ব'লছ, এ কি সত্যি?'

হ্যাঁ, এর এক বর্ণও মিথ্যে নয় ভাই, বরং এরও পরে যে কথা, তা মুখে না আনাই ভালো। তাতে নিজের জাতের কলঙ্কই প্রকাশ পাবে।… তাই বলছি এ পথে এসোনা ভাই। যদি শান্তি চাও, সুখ চাও ত' বিবাহ ক'রে ঘর সংসারী হও। তবে বিবাহ সম্বন্ধেও সাবধান করছি—শিল্পী, ধনী বা বেশী শিক্ষিত কাউকে বিয়ে করতে গেলে ঠকবি, মনে রাখিস্।

'বা রে! বেশ ত' তুমি সুধা বৌদি! এপারেও ঠকবো, ওপারেও ঠকবো—তাহ'লে লাভটা রইলো কোনখানে শুনি?'

এবার একটু চুপ করে কি যেন ভাবলে সুধা। তারপর আস্তে আস্তে গলার স্বরটা নামিয়ে এনে বললে,—'সেকথা মুখে বলবো না, একেবারে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবো যদি কোনদিন আমার বাসায় যাস্।'

'সে আবার কি ভাই?' মঞ্জু প্রশ্ন করলে।

'আমার ঘরের আশেপাশে যারা থাকে, তাদের অধিকাংশই অল্পশিক্ষিত পুরুষ, কলকারখানায় কাজ করে। অফিস থেকে ফিরেই তারা লুঙ্গি প'রে ছেলে মেয়েকে কোলে নিয়ে বসে রান্নাঘরের দাওয়ায়, আর স্ত্রী গল্প করতে করতে কখনো চা তৈরি করে দেয়, কখনো বা ফুটন্ত তরকারি কড়া থেকে তুলে তার সঙ্গে খেতে দেয়। আবার দেখি ছুটির দিনে তারা স্বামী-স্ত্রীতে মিলে সিনেমায় যায়, থিয়েটারে যায়। তাদের মুখেচোখে হাসি ধরেনা, সারা দেহে খুশির বন্যা বয়ে যায়।'

মঞ্জু আর চুপ করে থাকতে পারলে না। বললে, 'তাই বলে ওই আন্‌কাল্‌চারর্ড মিস্ত্রীর সঙ্গে'—

'কাল্‌চারর্ড শিল্পীর সঙ্গে বিয়ে হ'লে তার কি পরিণাম, তা ত' চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছিস ভাই। এর চেয়ে ওই অশিক্ষিত কারখানার শ্রমিকরা কি ভালো নয়?'

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে থপ্ করে উঠে দাঁড়ালো মঞ্জু। তারপর একরকম নিঃশব্দেই বিদায় নিলে।

আবার তার মাথার মধ্যে সব গোলমাল হয়ে যায়। বেশ গুছিয়ে এনেছিল মনটাকে, কিন্তু সুধাদি আবার দিলে সব এলোমেলো করে। ...কোন্ পথে যাবে,...কে বলে দেবে তাকে সত্যের সন্ধান!

সেদিন সকালে মঞ্জুকে চা দিতে এসে মঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন বৌদি।—ঠাকুরঝি, একি চেহারা হয়েছে তোমার! কাল সারা রাত বুঝি ঘুমোওনি! সত্যি করে বলতো, কি হয়েছে! এমনি করে রাতে না ঘুমোলে শেষে যে একটা কঠিন রোগে পড়বি ভাই। কি হয়েছে বল।

এর জবাব দিতে গিয়ে মঞ্জু ডুকরে কেঁদে উঠলো। তারপর বৌদির একখানা হাত চেপে ধরে বললে, আর পারি না ভাবতে, যা তোমরা ভালো বোঝো, করো। আমায় জিজ্ঞেস করতে এসো না।

চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বৌদি বললেন,—যদি আমার কথার ওপর তোমার এতটুকু আস্থা থাকে তাহলে বলছি কারুর কথা না শুনে ওই মৃগাঙ্কবাবুকেই বিয়ে কর, তাতে তুমি সুখী হবে, দেখে নিয়ো আমার কথা!

তবে তাই করো। আমি আর ভাবতে পারি না। বলে বৌদির শাড়ির আঁচলটা মুখে চেপে ধরে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো মঞ্জু।

সেই মাসের শেষ তারিখটায় বিয়ে হয়ে গেল মঞ্জুর।

মাত্র চোদ্দটা দিন আগে যে মঞ্জু নিজেকে মনে করতো দীনতম দীন, সত্যি সত্যি সেই ভিখারিনী যেন হয়েছে রাজরাণী। অচলার কাকার বিপুল ঐশ্বর্যের একমাত্র অধিকারিণী সে।—বাড়ি, গাড়ি, দাসদাসীরা সব আজ তার নিজস্ব। শুধু তার মুখের একটি কথার অপেক্ষায় রয়েছে। হীরামুক্তা চুনিপান্নার অলঙ্কারের বিপুল সম্ভার সর্বাঙ্গে ঝলমল করতে করতে দেওয়ালজোড়া সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো বিরাট আয়নাটার সামনে গিয়ে নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে মঞ্জু যেন হতবাক হয়ে যায়।···সত্যিই কি সে এত রূপসী! কোথায় ছিল এতদিন তার এই রূপ ঢাকা? —আর ভাবতে পারে না। সহসা তার মনে পড়ে যায় ফুলশয্যার

রাত্রের মৃগাঙ্কর সেই কথাটা। ফুলের বিছানার ওপর বসেছিল মৃগাঙ্কমৌলী, আর খাটের বাজুতে হাত রেখে তারই পাশে এসে দাঁড়ালো মঞ্জু, তার মাথার সোনার মুকুটে, কানের জড়োয়া ঝাপটায়, গলার মুক্তার চিক্‌ও শতনরী হারের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে মৃগাঙ্ক বললে,—মঞ্জু তোমাকে নাকি আজ একেবারে ইন্দ্রাণীর মত দেখাচ্ছে!

কথাটা শুনে মঞ্জুর বুকের মধ্যেটা ব্যথায় মুচড়ে উঠলো। সে এমনি হতভাগী যে আজকের এই রূপ তার স্বামী চোখে দেখতে পেলো না। প্রাণপণে চোখের জল চাপতে চাপতে মনের আবেগ দমন করছিল মঞ্জু, হাতের আঙ্গুলগুলো নিয়ে খেলা করতে করতে আবার মৃগাঙ্ক প্রশ্ন করলে, —মঞ্জু বলো, চুপ করে থেকো না,—তোমার মুখ থেকে আজ ওই কথা শুনে আমার জীবনকে সার্থক করি, বলো!

অন্ধের চোখ নেই কিন্তু দৃষ্টির অধিক যে তার কণ্ঠস্বর এটা মঞ্জু জানতো না। তাই স্বামীর সেই আকৃতি শুনে সমস্ত অন্তর তার কান্নায় ভরে উঠলো। চোখের জল গোপন করতে গিয়ে এক ফোঁটা মৃগাঙ্কর হাতে পড়তেই সে শিউরে উঠলো। মঞ্জুর চোখের ওপর হাতটা ধীরে ধীরে রেখে বললে, তুমি কাঁদছো মঞ্জু?

উত্তর দিতে গিয়ে মঞ্জুর ঠোঁটের দুটি প্রান্ত থর থর করে কেঁপে উঠলো। অতি কষ্টে বললে,—না।

তবে এখানে জল কেন?

জল নয়,—ঘাম। এত গয়না ও বেনারসীর ভারে বড্ড গরম লাগছে।

মৃগাঙ্ক বললে, অন্ধের চোখকে তুমি ফাঁকি দিতে পারো মঞ্জু কিন্তু মনকে পারবে না। তাই বৃথা ও চেষ্টা করো না। মনের মধ্যে যেন কিসের একটা বেদনা জোর করে চেপে রেখে আস্তে আস্তে বললে,—শুধু আজকের দিনটায় চোখের জল ফেলে এ বাড়ির অকল্যাণ করো না মঞ্জু, এইটুকুমাত্র আজ তোমার কাছে আমার অনুরোধ।

মৃগাঙ্ক যত সুপুরুষই হোক,—সে যে প্রৌঢ় এবং অচলার কাকা একথাটা কিছুতেই ভুলতে পারে না মঞ্জু, বরং আরো বেশী করে মনে হয় আজকাল সব সময়ে।

মঞ্জুর মত কোন তরুণী মেয়ের মনে স্বামীর আসন বুঝি পাতা থাকে না,—ফুলের গন্ধে, বাঁশীর সুরে, পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় সে মিশে থাকে বিদেহী স্বপ্নের মত। স্থান কাল ও পাত্রের আনুকূল্যে সে নেমে আসে মর্ত্যলোকে, পরিগ্রহ করে রূপ—ফুলফোটার আগে যেমন আসে বসন্ত, মলয়পবন প্রবাহিত হয়, মৌমাছি ও ভ্রমরের গুঞ্জনে পুষ্পের পল্লবে পল্লবে অণু-পরমাণুতে জাগে পুলক শিহরণ। লজ্জা সরম সঙ্কোচ ভয় সব ভুলে গিয়ে সবুজ ওড়নার অবগুণ্ঠন খসিয়ে বেরিয়ে আসে নিঃশব্দে একটির পর একটি দলে। তারপর লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে কখন যে হৃদয়ের একেবারে অন্তঃপুরে বিকশিত মর্ম্মমুকুরে তার স্থান চিরস্থায়ী করে নেয়, তা সে ছাড়া কেউ বুঝি জানতেও পারে না।

মঞ্জুর মন বার বার ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে মৃগাঙ্কর কাছ থেকে। একে স্বামীর আসনে কি করে বসাবে, ভাবতে গিয়ে তাই কেবল গোপনে চোখের জল মোছে! এক এক সময় তার মনে হয়,…কেন যেচে এই সোনার বেড়ী পায়ে পরতে গেল,…বৌদির কথা শুনে? পরক্ষণেই আবার বাবার মুখটা মনে পড়তে নিজেকে সামলে নেয়। বাবাব শেষ ইচ্ছা—তাঁর ঋণ সে ছাড়া আর কেউ শোধ করতে পারবে না! কিন্তু কি করে বাপের সেই বিপুল ঋণের কথাটা মুখ ফুটে মৃগাঙ্কর কাছে বলবে, তাও সে বুঝতে পারে না। সত্যি, কি ভাববেন তিনি। স্বামীর আসনে যতদিন না সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারছে মৃগাঙ্ককে, ততদিন কিছুতেই সে-আবদার করতে পারবে না মঞ্জু তাঁর কাছে।

ওদিকে মৃগাঙ্কর মনেও মঞ্জু বধূরূপে প্রবেশাধিকার লাভ করতে পারে না, বরং ভাইঝি অচলার সঙ্গে সব সময় মেলামেশা খেলাধুলো

করে ব'লে স্বভাবত স্নেহের সম্পর্কটাই প্রকট হয়ে ওঠে। প্রেমের নাম মুখে উচ্চারণ করতে গেলে জিভ আপনা থেকেই যেন আড়ষ্ট হয়ে আসে। এক একদিন মৃগাঙ্কর মনে অনুতাপ হয়! মঞ্জুকে বিয়ে ক'রে কাজটা হয়ত ভাল করলে না! তবু অন্তরের অবচেতনে কোথায় যেন চিরন্তন পুরুষের সেই পরম ক্ষুধাটি জেগে থাকে! সে ভাবে, হয়ত একদিন সেই বিশেষ ক্ষণটি আসবে তার জীবনে, যখন মঞ্জুর অন্তরের সব ব্যবধান আপনা থেকে ঘুচে যাবে—তাকে হয়ত ধরে তুলে নেবে তারই পাশে প্রেমের সিংহাসনে!

আবার এক একদিন মৃগাঙ্ক মনে করে,—না সে কিছু অন্যায় করে নি! ফুলের গাছ রোপণ করবার মত জমি যার নেই সে যেমন টবে করে ফুলের গাছ এনে ঘর সাজায়, এও তার তেমনি। যৌবনমত্ত তরুণী মেয়ের পায়ের আওয়াজ, অলঙ্কারের শিঞ্জিনী, তার চুলের গন্ধ, গায়ের স্পর্শ ভরে থাক তার এই শূন্য ঘরের মধ্যে। চোখে দেখতে না পেলেও নিঃশ্বাসের সঙ্গে সে তাকে অহরহ গ্রহণ করবে, নইলে সে বাঁচবে কি নিয়ে!

মঞ্জুকে মৃগাঙ্ক কলেজে ভর্তি করে দিয়েছে, সে অচলার সঙ্গে এক গাড়িতে চেপে খাতা বই নিয়ে ক্লাস করতে যায়। ওস্তাদ রেখেছে, তার কাছে গান বাজনা শেখে। আর ছোট মেয়ের মত অচলার সঙ্গে হুড়োহুড়ি ছুটোছুটি ক'রে সারা বাড়িটা যেন মাতিয়ে রাখে। তরুণী রূপসী মেয়ের পায়ের শব্দে মৃগাঙ্কর শূন্য ঘর যখন ভরে ওঠে তখন তার সেই উপস্থিতিকে সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে অনুভব করার জন্যে মৃগাঙ্ক হঠাৎ ডেকে ওঠে—মঞ্জু—ও মঞ্জু?

ডাকছেন কেন? বলে হাঁপাতে হাঁপাতে একটু পরে সে ছুটে আসে মৃগাঙ্কর কাছে। মঞ্জুর সেই দ্রুত নিশ্বাসের স্পর্শ সর্বাঙ্গে নিতে নিতে মৃগাঙ্ক বলে,—এত চেঁচাচ্ছো কেন, একটু আস্তে আস্তে খেলতে,

ছুটোছুটি করতে পারো না!

মঞ্জু খিলখিল করে হেসে উঠে জবাব দেয়, ছুটোছুটি আবার আস্তে করা যায় নাকি?

আচ্ছা তা যদি না করা যায়, তাহ'লে জোরে জোরেই খেলো, মোদ্দা ঘর দোরগুলো যেন আস্ত থাকে, ভেঙ্গে না পড়ে কেবল এইটুকু লক্ষ্য রেখো।

কখনো টুংটাং ক'রে পিয়োনোতে স্থর তোলে মঞ্জু! কখনো বা সেতারটা টেনে নিয়ে তাতে সদ্য শেখা আশাবরী গৎটার অস্থায়ীর মীড়টাতে ঠিকমত স্থর লাগাতে চেষ্টা করে। শিক্ষার্থিনীর হাতের সেই কাঁচা স্থর চৈত্রের উদাসী সন্ধ্যায় ভেসে আসা মেঠো সঙ্গীতের মত। প্রবীণ ওস্তাদ মৃগাঙ্কের মনে তা যেন কিসের স্বপ্ন আনে, পাশের ঘরে সে কান পেতে বসে থাকে—যত শোনে তৃষ্ণা ততই বেড়ে ওঠে। কেন, তা ঈশ্বর জানেন।

হঠাৎ কোথাও ভুল করে ফেললে এক একদিন হয়ত মৃগাঙ্ক ছুটে যায় সেটা সংশোধন করে দিতে। কিন্তু তার সাড়া পেলেই, মঞ্জুর হাত কেন কে জানে লজ্জায় একেবারে থেমে যায়। অনেক সাধ্য সাধনা করেও কিছুতেই যখন রাজী করাতে পারে না মৃগাঙ্ক, তখন সে চলে যায়।

মঞ্জুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে মৃগাঙ্ক কোন কাজই করে না। এমন কি কোন বই পড়ে শোনাবার জন্যে মঞ্জুকে ডাকলে সে যদি অনিচ্ছা প্রকাশ করে, তাতেও পীড়াপীড়ি করে না।

সন্ধ্যার সময় এক একদিন মৃগাঙ্ক মঞ্জুকে ডাকে কাছে, কোন একটা বই থেকে কয়েক পৃষ্ঠা পড়ে শোনাতে ফরমাশ করে। এই সব বই বেশীর ভাগ সাহিত্য ও দর্শনের দুরূহ প্রবন্ধ। তাই খুব খুশির সঙ্গে মঞ্জু পড়ে না। সেদিন মৃগাঙ্ক 'ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা' বইখানা

আলমারী থেকে এনে পড়ে শোনাতে বললে মঞ্জুকে।

দু'চার পৃষ্ঠা অতিকষ্টে পড়ে মঞ্জু বললে, একি বাংলাভাষা? কি দাঁতভাঙ্গা সব কথা! আমি আর পারবো না পড়তে!

আচ্ছা, বেশ, তাহ'লে ওটা এখন তুলে রাখো। তার চেয়ে বঙ্কিম-চন্দ্রের কপালকুণ্ডলাটা নিয়ে এসো, বড় ভাল বইটা না?

ও তো স্কুলেই কতবার পড়েছি!

আচ্ছা, তবে থাক। তোমার মন যা চায় তাই পড়ে শোনাও। বলে মৃগাঙ্ক একটু চুপ ক'রে থেকে মৃদুকণ্ঠে বললে, আচ্ছা, রবীন্দ্রনাথের সেই 'শেষ বসন্ত' কবিতাটা পড়ো ত দেখি।

আলমারী থেকে সঞ্চয়িতা এনে মঞ্জু পড়তে শুরু করলে—

আজিকার দিন না ফুরাতে
হবে মোর এ আশা পুরাতে—
শুধু এবারের মতো বসন্তের ফুল যত
যাব মোরা দু'জনে কুড়াতে।
তোমার কানন তলে ফাল্গুন আসিবে বারম্বার
তাহারি একটি শুধু মাগি আমি দুয়ারে তোমার॥

হঠাৎ তাকে থামিয়ে মৃগাঙ্ক বলে উঠলো, মঞ্জু এর মানেটা কি তুমি বুঝতে পারছো?

না। আমি কি বুঝি এর মানে? বলেই যেই উঠে দাঁড়াতে গেল মঞ্জু, অমনি তার একটা হাত ধরে মৃগাঙ্ক আবৃত্তি করে উঠলো—তার পরের লাইনগুলি।

বেলা কবে গিয়াছে বৃথাই
এতকাল ভুলে ছিনু তাই,
হঠাৎ তোমার চোখে দেখিয়াছি সন্ধ্যালোকে
আমার সময় আর নাই।

কি যা তা বলছেন···ভালো লাগে না···ছাড়ুন—জোর করে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে মঞ্জু ভেতরে চলে গেল। বেশী রোমান্টিক কবিতা বা কোন উপন্যাসের নরনারীর গভীর প্রেমের কথা পড়তে গেলেই মঞ্জুর গলা যেন বুজে আসে, হঠাৎ বইটা বন্ধ ক'রে বলে আর ভাল লাগছে না, এবার উঠে যাই।

মৃগাঙ্ক তাকে বাধা দেয় না। শুধু নিজের বুকের মধ্যে কিসের একটা ব্যথা যেন গোপন করে। মঞ্জুর মনটাকে এইভাবে মাঝে মাঝে সে পরীক্ষা করে দেখতো। তাব মনে তখনো যে বিবাহের রং লাগেনি, এটা বুঝতে পেরে নিরুৎসাহে তার মন ভেঙ্গে পডতো।

এরপর কিছুদিন মৃগাঙ্ক চুপচাপ থাকে, নিজেকে প্রাণপণে মঞ্জুর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। কিন্তু তবু মন মানে না। ইদানীং প্রায়ই কবিতা শোনবার জন্যে তাব মন যেন তৃষ্ণার্ত হয়ে ওঠে। তাই আবার ডাকে মঞ্জুকে।

মঞ্জু আসে সঞ্চয়িতা হাতে নিযে। বলে, কোন্‌টা পড়বো বলুন?

যা তোমার ইচ্ছে, পড়ো। বলে মঞ্জুর ওপর ভার দেয়। কিন্তু যে কবিতাগুলো তখন মঞ্জুব মুখ থেকে শোনবার জন্যে মৃগাঙ্কর প্রাণ আকুলি বিকুলি করে, তার ধার দিয়েও যায় না মঞ্জু। সে বেছে বেছে কতকগুলো এমন কবিতা পড়ে, যা শুনতে অন্তত তখন তাব মন নারাজ। তবু মঞ্জুর মনের গতি বোঝবার জন্যে মুখে বাহবা দিয়ে তাকে উৎসাহিত করে। তাই প্রথমে 'বর্ষশেষ', তারপরে 'বৈশাখ' পড়বার পর যখন সে 'বিসর্জন' কবিতাটা আরম্ভ করলে, আর চুপ কবে থাকতে পারলে না মৃগাঙ্ক। গম্ভীর স্বরে শুধু বললে,—ওটা থাক। তার চেয়ে 'অসমাপ্ত' কবিতা পড় তো। মঞ্জু সঙ্গে সঙ্গে সূচিপত্র দেখে কবিতাটা বার করে পড়তে শুরু করলে।—

বোলো তারে বোলো

এতদিনে তারে দেখা হ'ল।"

কিন্তু খানিকটা এগিয়ে হঠাৎ বইটা বন্ধ করে বললে, আর নয়, ভাল লাগছে না।

মৃগাঙ্কর কণ্ঠ বিরক্তিতে ভরে উঠলো। সে বললে, ভুলে যেয়ো না, তোমার ভালো লাগার জন্য আমি তোমায় পড়তে বলিনি, ওর শেষটুকুও তোমায় পড়তে হবে এখনি।

অগত্যা মঞ্জু আবার আরম্ভ করলে—

"বোলো তারে আজ,—
অন্তরে পেয়েছি বড়ো লাজ।
কিছু হয় নাই বলা, বেধে গিয়েছিল গলা,
ছিল না দিনের যোগ্য সাজ।
আমার বক্ষের মাঝে পূর্ণিমা লুকানো আছে
সেদিন দেখেছ শুধু অমা
দিনে দিনে অর্ঘ্য মম, পূর্ণ হবে প্রিয়তম,—
আজি মোর দৈন্য করো ক্ষমা।"

কবিতাটা শেষ হলে, অনেকক্ষণ পর্যন্ত অভিভূতের মত নিস্তব্ধ হয়ে রইল মৃগাঙ্ক, মঞ্জু কর্তব্য পালন করেই সেখান থেকে উঠে চলে গিয়েছিল।

এমনি ভাবে দিন কেটে যায়। তবু অন্তরের নিভৃতকন্দরে আশার দীপ জ্বালিয়ে কিসের যেন প্রতীক্ষা করতে থাকে মৃগাঙ্ক।

এক একদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ মৃগাঙ্কব ঘুম ভেঙ্গে যায়। ধড়মড় করে বিছানায় সে উঠে বসে। মাথায় যেন তার খুনের নেশা চাপে।··· ইচ্ছে করে, ডাকাতের মত জবরদস্তি লুঠ করে নেয় মঞ্জুব সর্বস্ব। যেখানে যা কিছু গোপন আছে। পরক্ষণেই, কি জানি কেন, সে তার মনের মধ্যে ডাক শুনতে পায় অচলার—'কাকামণি, কাকামণি'। নিমেষে অচলা ও মঞ্জুর মধ্যের ব্যবধানটুকু ঘুচে গিয়ে যেন এক হয়ে যায়। মৃগাঙ্কর

হাত থেকে খসে পড়ে সব হাতিয়ার।...লাঞ্ছিত, অপমানিত সৈনিকের মত লজ্জায় মুখটা ঢেকে আবার শুয়ে পড়ে মৃগাঙ্ক।

কোনদিন বা গভীর রাতে ছিঁচকে চোরের মত মঞ্জুর নিঃশ্বাসের শব্দটা চুরি ক'রে বসে শোনে। শুনতে শুনতে একটু একটু করে নিঃশব্দে এগিয়ে যায় কাছে— আরো কাছে—আরো — আরো। তারপর আল্‌তোভাবে মঞ্জুব দেহটা একবার ছুঁইয়েই হাত তুলে নেয়! কেঁপে ওঠে—তার হাত নয় শুধু, সেই সঙ্গে বুঝি সর্বাঙ্গ; বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করে, কে যেন হাতুড়ির ঘা মারতে থাকে! মৃগাঙ্কর না-ই বা রইল চক্ষু, আছে ত অন্যান্য ইন্দ্রিয়—যেগুলো আবো সতেজ, আরো সজাগ। আলুথালু বেশে ঘুমোচ্ছিল মঞ্জু। তার দেহের মৃদু সৌরভ মৃগাঙ্কের কেবল নাসিকায় গিয়ে লাগছিল না, তার মুখে চোখে যেন আছড়ে পড়ছিল। সেই মদির-গন্ধ কেবল আঘ্রাণ কবে বুঝি তৃপ্তি হয় না মৃগাঙ্কর, তাই তাকে যেন সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে লেহন করছিল।

কিন্তু পারে না আর বেশীক্ষণ ধৈর্য ধরতে মৃগাঙ্ক। মাতালের মত লুটিয়ে পড়ে সে মঞ্জুর পায়ের তলায়। তারপর কামনা বাসনার দাবানল বুকে নিয়ে এক সময় সহসা মঞ্জুব দু'খানি ঘুমন্ত পা মুখের ওপর চেপে ধবলে। বুঝি এইভাবে মৃগাঙ্ক নিভাতে চায় তার মনের সে আগুন!

একি! একি! আপনি যে ঘুমেব ঘোবে আমার একেবাবে পায়ের ওপব এসে পড়েছেন, উঠুন, সরে যান, ঠিকভাবে ঘুরে শুযে পড়ুন। বলতে বলতে পা দুটো মৃগাঙ্কব মুখের ওপব থেকে টেনে নিযে পিছন ফিরে সরে শুলো মঞ্জু—একেবারে বিছানাব প্রান্তে।

মৃগাঙ্ক হাঁপাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি মনের আবেগ দমন করতে করতে শুধু বললে,—এই যে, হ্যাঁ—ভাগ্যিস তুমি ডেকে দিলে নইলে হয়ত আরো কিছু—। এই পর্যন্ত বলেই হঠাৎ থেমে গেল, আব বলতে পাবলে না। কিসের লজ্জা এসে যেন তার মুখটাকে চেপে ধরলে।

পরদিন কলেজ থেকে ফিরতেই বুড়ো চাকরটা এসে মঞ্জুকে খবর দিলে, একটি ভদ্রলোক দেখা করতে চান তার সঙ্গে।

সিঁড়ি বেয়ে তিনতলা থেকে নেমে একতলার বৈঠকখানায় ঢুকতেই দেখলে সামনের সোফায় বসে স্বরজিৎ।

যেন সে এখানে সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত এমনি ভাবে ভ্রূ কুঁচকে মঞ্জু প্রশ্ন করলে, তুমি কি মনে করে?

তোমার এই রাজরানী মূর্তি দেখতে মঞ্জু।

উচ্ছ্বাস যেন তার গলা দিয়ে উপছে সর্বাঙ্গে গড়িয়ে পড়লো। কিন্তু মঞ্জুর মুখে চোখে কোথাও কোন আগ্রহের ভাব লক্ষ্য না করে মনে মনে স্বরজিৎ বেশ খানিকটা দমে গেল। সেই পূর্বের অনুরাগ আবার তার মনে জাগাবার জন্যে মঞ্জু জবাব দেবার আগেই নিজে থেকে বলে উঠলো, মনে আছে—একদিন বলেছিলে বড়লাকের বৌ হলে তুমি আমায় সাহায্য করবে, তাই আজকে একটা সুখবর নিয়ে তোমার কাছে এসেছি। বিলেত যাওয়ার একটা সুযোগ পাচ্ছি, যাতায়াতের জাহাজ ভাড়া এবং দু'বছর সেখানে থেকে ডিগ্রী নিযে আসতে মোট খরচ লাগবে পাঁচহাজার টাকা,··· এই টাকাটা আমি তোমার কাছে চাইতে এসেছি। তুমি নিশ্চয়ই জানো যে ফিরে এসে এখানে কেবল যে একটা মোটা চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা তাই নয়, বেশীদামে ছবিও বেচতে পারবো।

তাই নাকি? সত্যি এর চেয়ে সুখবর আর কি থাকতে পাবে, শুনে বড় খুশি হলুম। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে তোমাকে বলছি যে টাকা আমি দিতে পারবো না। তুমি অন্য কোথাও থেকে জোগাড় করার চেষ্টা করো।

স্বরজিৎ বললে, একটা পয়সা দেবার মত লোক যে আমার নেই সে তুমিই সবচেয়ে ভালো জানো। তাই ওকথাটা তোমার মুখ থেকে শুনবো আশা করি নি, বিশেষ করে যার স্বামী এই বিপুল অর্থের অধিকারী তার

মুখে কি এ—কথা শোভা পায়?—আর তা ছাড়া—

তুমি আমার অবস্থায় পড়লে কি করতে সুরজিৎদা একবার ভেবে দেখো ত। স্বামীর মনে যেখানে তোমার ওপর সন্দেহ, সেখানে, আবার কোন্ মুখে আমি তোমারই জন্য এই টাকা চাইবো! তুমি কি চাও যে তোমার জন্য এখানেও অবিশ্বাস আর সন্দেহ নিয়ে চিরদিন আমি জ্বলে মরবো?…না-না তা আমি কিছুতেই পারবো না। বিয়ের আগে যে-সম্বন্ধ তোমার আমার মধ্যে ছিল, বিয়ের পর তা শোধ হয়ে গিয়েছে চিরকালের জন্য মনে রেখো।—এত স্পষ্ট করে বলতে বাধ্য হচ্ছি, পাছে তুমি আমায় ভুল বোঝ। তাই আমি চাই না, তুমি আর কোন দিন এখানে আসো। বলতে বলতে হঠাৎ গলার স্বরটা নামিয়ে কতকটা যেন কৈফিয়ৎ দেবার ভঙ্গীতে বলে উঠলো,…আজ পর্যন্ত বাবার দেনাটা শোধ দেবার কথা মুখ ফুটে তাঁকে বলতে পারিনি পাছে তাঁর মনে হয় বুঝি কেবল টাকার লোভেই তার গলায় মালা দিয়েছি। তিনি সবই জানেন, স্বেচ্ছায় সেকথা কবে উত্থাপন করবেন তারি অপেক্ষায় দিন গুণছি।…জোড় হাত করে বলছি—আর একমুহূর্তও অপেক্ষা না করে তুমি এখান থেকে এখনি চলে যাও, বাড়ির অন্য কেউ না জানতে পাবে, তুমি এসেছো—এই আমার ইচ্ছে।

সুরজিৎ অটল—বললে, টাকাটা দিয়ে দাও এখনি চলে যাচ্ছি, আর এক মুহূর্তও এখানে থাকবো না।

ভয়ার্তকণ্ঠে মঞ্জু বলে, কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব। তুমি স্বার্থে এমনি অন্ধ, যে আমার দিকটা একবারও ভেবে দেখা কর্তব্য বলে মনে করো না। আমি পরস্ত্রী, আমার ওপর কোন জুলুম খাটাতে যাওয়া যে অন্যায়—সে বোধশক্তিটুকুও তুমি হারিয়েছ!

দেখো মঞ্জু, আমিও ছেলেমানুষ নই। তুমি ইচ্ছে করলে তোমার স্বামীকে না জানিয়ে টাকাটা যে এখনি আমায় দিতে পারো তা আমি জানি এবং সেই আশাতেই এসেছি।

তা যদি পারতাম, তাহলে তোমার সঙ্গে বেশি বাক্যালাপ না করে অনেক আগেই টাকা দিয়ে তোমায় বিদায় করতাম। তোমার পায়ে ধরে অনুরোধ করছি—চলে যাও শিগ্‌গির, এখানে আর থেকো না। সত্যিই বলছি আমার কোন উপায় নেই। তোমার জন্যে চরিত্রের দুর্নাম নিয়েছি, এর ওপর কি আবার চোর অপবাদটাও চাপাতে চাও?—জানি, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে তুমি এখন সব পারো। কিন্তু আমার শেষ কথা আমি তোমায় বলে দিয়েছি। আর আমি অপেক্ষা করতে পারছি না।—চললুম। আশা করি এই আমাদের শেষ দেখা! নমস্কার।

অল্পদিনের মধ্যে মঞ্জুর এই মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করে শুধু বিস্মিত হলো না সুরজিৎ, সেই সঙ্গে অপমানিতও বোধ করলো। মঞ্জু ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেও আর এক মুহূর্ত্ত সেখানে অপেক্ষা করলে না। বড লোকের ঘরে বিয়ে হ'লে মঞ্জু যে তাকে সকল দিক দিয়ে সাহায্য করবে এতদিন এমনি একটা কল্পনা তার মনে বদ্ধমূল ছিল, কিন্তু আজ তার সেই সমস্ত স্বপ্ন নিজে হাতে মঞ্জু ভেঙ্গে চুরমার করে দিলে। ভগ্নমনোরথ হয়ে সুরজিৎ সেই সব কথা চিন্তা করতে করতেই বাসায় ফিরলো এবং ওই টাকাটা জোগাড় করার জন্যে কলকাতা ও কলকাতার বাইরে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু বান্ধব যে যেখানে ছিল, প্রত্যেকের দরজায় গিয়ে ধন্না দিল, তবু কোন ফল হলো না। অবশেষে লাজলজ্জার মাথা খেয়ে সুরজিৎ একটা চিঠি লিখলো মঞ্জুকে। তাতে লিখলো, বিলেত থেকে পাশ করে বড় শিল্পী হয়ে আসবো, বাল্যকাল থেকে এই স্বপ্ন দেখেছি তা তুমি জানো। তাই পাঁচ হাজার টাকা তুমি না দিলে আমার জীবনের এই উচ্চাশা চিরকালের জন্যে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে,—আজ টাকা যদি তুমি দাও তাহ'লে সারাজীবন ঋণী থাকবো তোমার কাছে। বিফল করবে না আমায়—এই আশায় আবার লিখছি।

মঞ্জু তখন কলেজে। চিঠিখানা একেবারে গিয়ে পড়লো মৃগাঙ্কর হাতে। মৃগাঙ্ক চুপি চুপি চিঠিখানা গোমস্তাকে দিয়ে পড়িয়ে তখনি পাঁচ হাজার টাকা স্বরজিতের কাছে পাঠিয়ে দিলে এবং গোমস্তাকে অনুরোধ করলো একথা যেন আর কেউ না জানতে পারে—বিশেষ করে মঞ্জু। অথচ এই টাকাটা যেন মঞ্জুই স্বরজিৎকে গোপনে পাঠিয়েছে এটা সে বুঝতে পারে। যাবার সময় তার কানে কানে শুধু বললে, মঞ্জুর নাম ক'রে স্ববজিৎকে টাকাটা দিয়ে বলবে, আর কোনদিন যেন সে মঞ্জুকে কোন চিঠি না লেখে বা কোন কিছু তার কাছে প্রার্থনা না করে। এই তার একমাত্র অনুরোধ।—বহুদিনের বিশ্বাসী পুরাতন গোমস্তা সাধুচরণের মনিবের এই কথাটার নিগূঢ় অর্থ বুঝতে এতটুকু বিলম্ব হলো না।

টাকাটা দিয়ে সাধুচরণ ফিরে এলে মৃগাঙ্কর মন থেকে একটা মস্তবড় দুর্ভাবনার বোঝা নেমে গেল। সে সব সময়ে ভাবতো, ওই শিল্পীর কাছেই বুঝি মঞ্জুর মনটি বাঁধা পড়ে আছে, তাই কিছুতেই তার দিকে ফিরিয়ে আনতে পারছে না। আপাততঃ সুদূর বিলাতে চলে গেলে কিছুদিনের জন্যে ত নিশ্চিন্ত হবে মৃগাঙ্ক।

ভেতরে ভেতরে যে এতকাণ্ড মৃগাঙ্ক করেছে, মঞ্জু তার কিছুই জানতো না। স্বরজিতের শুধু বিলেতে যাবার খবরটা যেদিন সংবাদপত্রে পড়লো সেদিন আনন্দেব সঙ্গে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে যেন সে বাঁচলো। কি জানি, পুবানো সম্পর্কের কথাটা কোনদিন হয়ত আবার মৃগাঙ্কর কানে তুলে সে নতুন কোন অভিসন্ধি নিযে আসতো। তাছাড়া, মৃগাঙ্ক যে তার পিতৃ-ঋণ পরিশোধ করার কথা এখনো মুখে আনছেনা, তার কাবণও যে স্বরজিৎ, এ ধারণাটাও কেমন করে যেন মঞ্জুর মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। মৃগাঙ্ক আগেই জানতো শিল্পী স্বরজিতের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার কথা—তাই

সুকৌশলে সংবাদপত্রের সে খবরটা মৃগাঙ্ককে পড়ে শোনালে মঞ্জু। অন্ততঃ মৃগাঙ্ক জেনে নিশ্চিন্ত হোক যে সুরজিৎ দেশ ছেড়ে বহুদূরে চলে গেছে, তার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক নেই।

মৃগাঙ্ক সংবাদটা শুনে বলে উঠলো, ভালই হলো—আমাদের দেশের এতবড় একজন গুণী শিল্পী বিলেত যাচ্ছে এ ত খুব আনন্দের কথা।

গুণী শিল্পী না হাতী। নিজে টাকা কড়ি ধার ধোর ক'রে যে বিলেত যায়, আর যাই হোক সে অন্ততঃ গুণী নয়।

না, না, এ ধারণা তোমার অত্যন্ত ভুল মঞ্জু।

মঞ্জু তর্ক করে মৃগাঙ্কর সঙ্গে। মোটেই ভুল নয়, যে সত্যিকারের গুণী তাকে নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে বিলেত যেতে হবে কেন? কলেজ থেকে বা সরকার থেকে যেচে তাকে পাঠাবে। যারা এখানে কোন কিছু করতে পারে না, তারাই ওই বিলেতী ডিগ্রীর ধোঁকা দিয়ে লোককে ভোলাতে চায়। শিল্পীর যদি সত্যিকারের কোন প্রতিভা থাকে, তাহ'লে তাকে কিছুতেই কেউ চাপা দিয়ে রাখতে পারে না। একদিন না একদিন সে রসিকজনের সমাদর লাভ করবেই।

মৃগাঙ্ক বললে, তাহলে কি তুমি বলতে চাও সুরজিতের মধ্যে কোন প্রতিভা নেই?

আমি যদি তাই বলি, সেকথা কে বিশ্বাস করবে? কেননা চিত্রশিল্পের আমি কতটুকু বুঝি, তবে তার মধ্যে যদি কিছু প্রতিভা থাকতো, তাহলে কি দেশের লোক তা দেখতে পেতো না? সকলেই কি মূঢ়, অন্ধ!

একটু ভেবে উত্তর দিল মৃগাঙ্ক,—কথাটা তুমি খুব খারাপ বলোনি মঞ্জু। তবে এত টাকা খরচ করে মিছিমিছি ও যেতে গেল কেন সেখানে?

ওর ধারণা এদেশে শিল্পীর কদর নেই, ওখানে গেলেই তাকে নিয়ে লোকে মাথায় করে নাচবে। তাই ওদেশে একবার গেলেই আর কোনদিন এখানে ফিরে আসবে না।

এই কথাটা শুনে মনে মনে মৃগাঙ্ক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে বটে, তবু মঞ্জুর মনটা পরীক্ষা করার জন্যে বললে—তাহলে এতবড় একটা শিল্পীকে হারানো দেশের পক্ষে ক্ষতি বলতে হবে।

হো হো করে হেসে উঠলো মঞ্জু তাচ্ছিল্যের হাসি। বললে, বরং তার উল্টো। দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ঢের বেশী ভালো। •

সুরজিতের সম্বন্ধে মঞ্জুর মনের এই ধারণা জানতে পেরে মৃগাঙ্কর মনের যেন সব মেঘ কেটে গেল।

সেদিন সন্ধ্যার পূর্বে হঠাৎ আকাশে দেখা দিল কালবৈশাখী, ঝড়ের তাণ্ডব থামতে না থামতেই শুরু হলো বিদ্যুৎ আর মেঘগর্জন, সঙ্গে সঙ্গে নামলো বৃষ্টি মুষলধারে।

নিচে থেকে ছুটতে ছুটতে তিনতলার ঘরে জানালা বন্ধ করতে এসে চমকে উঠলো মঞ্জু। সামনের ছোট্ট বারান্দায় নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ভিজছে মৃগাঙ্ক একা!

একি! এখানে দাঁড়িয়ে একা একা ভিজছেন কেন? ভেতরে আসুন শিগ্গির; মৃগাঙ্কর হাতটা গিয়ে ধরলো মঞ্জু—বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত শিউরে উঠলো মৃগাঙ্কর সর্বাঙ্গ। সঙ্গে সঙ্গে সেও এক অপ্রত্যাশিত কাণ্ড করে বসলো।...দু'হাত দিয়ে মঞ্জুর সেই যৌবনপুষ্ট দেহটাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে মৃগাঙ্ক বললে,...একা কি? এই ত তুমি রয়েছ।

ছাড়ুন ছাড়ুন—ইস্, ভিজে গেল যে আমার সব—শাড়ি, ব্লাউজ—

মৃগাঙ্ক বললে, তোমার মনটা না ভিজলে ছাড়বো না।

কি পাগলের মত যা তা বলছেন। ছাড়ুন বলছি—সব ভিজে গেল যে,—

যাক আজ সব ভিজে! ওই মাটির দিকে চেয়ে দেখো দেখি—একটু আগে যার অন্তর ও বাহির জ্বলে পুড়ে খার হয়ে যাচ্ছিল—বৃষ্টির

ধারায় তার কি উল্লাস!…মৃগাঙ্ক আরো দৃঢ় বলে তাকে আলিঙ্গন করে বললে, আজ সব ভিজে যাক।…এমনি করে এসো…আজ ভিজি শুধু তুমি আর আমি।

মঞ্জুর সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে মৃগাঙ্কর মুখের এই কথা শুনে। তবু মুখে তার কথা আর ফোটে না। সেই অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ধারায় নিঃশব্দে দুজনে দাঁড়িয়ে থাকে তেমনি ভাবে।

বৃষ্টি যখন থামলো, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ঘরের মধ্যে এসে মৃগাঙ্ককে জামা কাপড় ছাড়িয়ে নিজে বেশভূষা করে মঞ্জু চায়ের পেয়ালা হাতে করে এসে মৃগাঙ্ককে দিতে যাবে পিছন থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে সাধুচরণ এসে বললে, ছোট বাবু, ছোট বাবু, সর্বনাশ হয়েছে। আমাদের ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে গেছে আর সঙ্গে সঙ্গে শেয়ারের দামও জলের মত নেমে গিয়েছে।

এ্যাঁ। কি বললি।…

বজ্রাহতের মত চায়ের পেয়ালাটা হাতে নিয়ে মৃগাঙ্ক বসে রইলো।

কি হবে তাহলে! বলে মঞ্জুও স্থির দৃষ্টিতে সাধুচরণের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। পর-পুরুষের সামনে যে মাথায় ঘোমটা টেনে দিতে হয় সেকথা ভুলেই গেল মঞ্জু।

মৃগাঙ্কমৌলিই প্রথম সামলে নিলে নিজেকে। প্রায় সহজ-কণ্ঠে বললে, 'তুমি একটু নিচে গিয়ে গিয়ে বসো সাধুচরণ, আমি যাচ্ছি। তোমার একটু স্থির হয়ে বসাও দরকার।'

তারপর যেন স্বাভাবিক ভাবেই চায়ের পেয়ালাটা মুখে তুললো।

মঞ্জু এতক্ষণ বিহ্বল হয়ে ছিল, এবার বিস্মিত হ'ল। বিস্মিত হ'ল মৃগাঙ্কমৌলির এই অসাধারণ চিত্ত-সংযমের শক্তিতে। কোন মতে শুক্নো ঠোঁটের ওপর জিভটা বুলিয়ে সে বললে, 'হ্যাঁ গো—কী হবে তা'হলে?'

এতদিনের মধ্যেও সে 'তুমি' বলতে পারেনি স্বামীকে। 'হ্যাঁ গো' সম্বোধন ত কল্পনাতীত। অথচ আজ অতি সহজেই কথাগুলো বেরিয়ে এল তার মুখ দিয়ে। এত সহজে যে, সে তা অনুভবও করতে পারলো না নিজে।

মৃগাঙ্কমৌলি হাসলো। বাঁ-হাতে চায়ের পেয়ালাটা বদলে নিয়ে, ডান হাতখানা বাড়িয়ে ধরলে মঞ্জুর একখানা হাত। একটু টান দিতে মঞ্জু নিজেই সরে এল তার কাছে। মৃগাঙ্ক এবার ওর কাঁধে হাত রেখে দৃষ্টিহীন চোখ দুটি সুদ্ধ মুখখানা ফেরালো ওর মুখের দিকে। হাসলো একটু।

মধুর, ক্ষমাসুন্দর—কেমন এক রকম আশ্চর্য হাসি। এই হাসিই প্রথম পরিচয়ের দিনটি থেকে আকৃষ্ট করেছে ওর শ্রদ্ধাকে।

মৃগাঙ্কমৌলি বললে, 'ভগবান একদিক ভাঙ্গেন আর একদিক গড়েন মঞ্জু।...আজ আমার জীবনের সবচেয়ে বড় কাম্য বস্তুটি পেয়েছি—যা সব পাওয়ারও উপরে। এই মুহূর্তে আর তাই লোকসানের হিসেব করতে ইচ্ছে করছে না।'

এই কথাটাই যেন আর কোথায় শুনেছে মঞ্জু। খুবই চেনা-চেনা

লাগে শব্দগুলো। কার মুখে শুনেছিল যেন?…বোধ হয় সুরজিৎই সেদিন বলছিল কথাগুলো।

সুরজিৎ!

নামটা মনে পড়তেই কে জানে কেন মঞ্জুর মনে আজ কেমন একটা ঘৃণার ভাবই জেগে উঠ্‌ল। অথচ দু'দিন আগেও কী শ্রদ্ধাই না করত সে ঐ লোকটাকে!

মৃগাঙ্ক খাটের ধারে বসে চা খাচ্ছিল, মঞ্জু দাঁড়িয়েছিল পাশে। চা খাওয়া শেষ হ'তে কতকটা যন্ত্রচালিতের মতই সে স্বামীর হাত থেকে পেয়ালাটা নিয়ে ওপাশের টেবিলে রেখে আবারও এসে পাশে দাঁড়াল। কেমন যেন স্তম্ভিত, আড়ষ্ট হয়ে গেছে সে। কিছু পরিষ্কার ভাবতেও পারছে না। স্বামীর আর্থিক অবস্থা ঠিক কেমন তা সে জানে না—এতদিন সে জানতে চায়ওনি। কতখানি গেল তা সে তাই ধারণা করতে পারছে না—কিন্তু সাধুচরণের আর্তনাদে এবং মৃগাঙ্কমৌলির কণ্ঠস্বরে কেমন ক'রে এটা সে বুঝেছে যে সর্বনাশের খুব বেশী আর বাকী নেই।…এ ক্ষেত্রে কি করা উচিত, কী বললে এ লোকটি একটু সান্ত্বনা পাবে তাও সে জানে না। এ সব কথা নিয়ে কোনদিনই মাথা ঘামায়নি সে। কিন্তু কিছু যে বলতেই হবে তাকে। কিছু একটা করা দরকার। এই লোকটিকে সে মাত্র কিছুক্ষণ আগেই নতুন করে আবিষ্কার করেছে, নতুন ক'রে চিনেছে। শ্রদ্ধা, প্রেম—তার সঙ্গে হয়ত কিছু কৃতজ্ঞতাতেও ভরে উঠেছে তার সমস্ত অন্তর। কিছু একটা না করতে পারা পর্যন্ত যেন স্থির হ'তে পারছে না কিছুতেই। আজ প্রথম সে বুঝতে পেরেছে কত অসহায়, কত বেচারী এই মানুষটি। এই মনোভাবের মধ্যে মঞ্জুর মনে বুঝি সেই জন্য বিস্ময়েরও সীমা নেই। আশ্চর্য! এই মুহূর্তে এই লোকটির জন্যে তার মন যেমন ব্যাকুল সহানুভূতিতে উদ্বেল হয়ে উঠেছে—এমন ত কখনও হয়নি!…এমন কি তার বাবার জন্যও না।…

অথচ কিছুদিন আগেও তার ধারণা ছিল যে—এই লোকটিকে কখনই ভালবাসতে পারবে না সে।

মৃগাঙ্ক হাত দিয়ে ওকে বেষ্টন ক'রে একেবারে বুকের মধ্যে টেনে নিলে। ওর গালের ওপর নিজের গালটা চেপে ধরে চুপি চুপি প্রশ্ন করল, 'কী ভাবছ বলো ত?'

মঞ্জু কিন্তু সেই বাহুবেষ্টনের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ এলিয়ে দিতে পারলে না। বোধহয় এত দিনের অনভ্যাসেই। কেমন একটু আড়ষ্ট হয়ে রইল। মৃগাঙ্ক আবারও তেমনি চুপি চুপি বললে, 'কী, কথা কইছ না যে?' তারপরই কেমন একটু চমকে মুখ তুলে বললে, 'এ কি, জল কিসের?'

বাঁ হাতটা চকিতে একবার ওর কপালে, গালে, গলায় বুলিয়ে নিয়ে অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হয়ে বললে, 'ও, তাই ভাল। তুমি ঘামছ। আমি বলি বা কেঁদেই ফেললে! যা ছেলেমানুষ তুমি!'

এইবার মঞ্জু কথা বললে। কতকটা যেন জোর ক'রেই, কেমন একটা ভাঙ্গা ভাঙ্গা অস্পষ্ট কণ্ঠে বললে, 'আপনি—না, মানে তুমি খুব আপসেট হওনি ত?'

'আপসেট হবো কেন। তুমি ত রয়েছ। আর কিছুতেই আমাকে কোনদিন বিচলিত করতে পারবে না মঞ্জু। শুধু তুমি আমার পাশে থেকো।'

'আমি চিরদিনই থাকব। এ ত শুনেছি জন্মান্তরের সম্পর্ক।' আস্তে আস্তে বলল মঞ্জু, 'কিন্তু আজ নিজের জন্য বড় লজ্জাবোধ হচ্ছে। কতটুকুই বা কাজে লাগব, কী-ই বা জানি। চাকরী আমি অবশ্যই একটা জুটিয়ে নেব—তবে তাতে আর কতটুকু হবে। তুমি চিরদিন আরামে অভ্যস্ত—সেইটিই ভাবনা।'

এইবার হো-হো ক'রে হেসে উঠল মৃগাঙ্কমৌলি। তার সে হাসিতে

অপ্রতিভ হ'ল মঞ্জু, একটু ক্ষুণ্ণও হ'ল। সে নিজেকে তাড়াতাড়ি ওর বাহু-বন্ধন থেকে মুক্ত ক'রে নেবার চেষ্টা করলে।

কিন্তু মৃগাঙ্ক ছাড়লে না। আরও দৃঢ় করে ওকে বুকে চেপে ধরে বলল, 'না না। ছাড়ব না তোমাকে আমি। তুমি রাগ করো না। আমার হাসাটা হয়ত অন্যায় হয়েছে। তুমি জানো না মঞ্জু, তুমি দিন দিন আমার কাছে কতটা সুন্দর হয়ে উঠছ। তোমার বাইরেটা দেখবার সৌভাগ্য থেকে আমাকে ভগবান বঞ্চিত করেছে—কিন্তু সেজন্যে নালিশ করব না। তোমার অন্তরটি আমি দেখেছি—আর তাতেই আমি কৃতার্থ।...তুমি এমনিই সরল থেকো চিরকাল, বুদ্ধিমতী অনেক দেখেছি—আমার তাতে কোনদিন লোভ নেই।'

মঞ্জু উত্তর দিলে না। শুধু ওর বিশাল বুকের মধ্যে মুখটা চেপে ধরলে।

সে-ও সুখী হয়েছে। সেও সার্থক হয়েছে। আরও কী পেতে পারত তা সে জানে না। যা পেয়েছে তাতেও সে কম সুখী নয়।

অনেক, অনেকক্ষণ পর মুখ তুলে আস্তে আস্তে বললে, 'সরকার মশাই কিন্তু নিচে বসে রয়েছেন!'

'ও হ্যাঁ। তাও ত বটে। দেখেছ, কেবল আজ লাভের দিকটাই মনে পড়ছে বেশী করে। লোকসানের দিকটা নয়। মানুষের জীবনে এমন সৌভাগ্যের দিন কারুরই খুব বেশী আসে না। আচ্ছা দাঁড়াও, আমি ওকে একটু প্রকৃতিস্থ করে আসি—'

মৃগাঙ্কমৌলি হাসিমুখেই নিচে নেমে গেল। মঞ্জুর আড়ষ্টতা কিন্তু তবু ঘুচল না। অনেকক্ষণ সে খাটটার প্রান্তে ঠেস দিয়ে তেমনি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থেকে একসময় আবার বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ আগেকার প্রবল বর্ষণের চিহ্নও নেই আকাশে। সারি সারি তারা ফুটে

উঠেছে ; পশ্চিম দিকটা এখনও সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়নি, এখনও কিছু রক্তাভা লেগে আছে সেখানে। বাতাসে অপরূপ একটা স্নিগ্ধতা।

কিন্তু এসব কিছুই চোখে পড়ল না মঞ্জুর। আকাশপাতাল ভাবছে সে। যে চিন্তাটাকে সে কিছুতেই নিজের সচেতন মনে প্রশ্রয় দিতে চায় না —সেইটেই বেশী করে উঁকি ঝুঁকি মারছে।

বাবার দেনা।

আজও মুখ ফুটে কথাটা তুলতে পারেনি। আর বোধ হয় তোলবার কোন সুযোগও রইল না। ঠিক হয়েছে। এ তার আত্মপ্রবঞ্চনার, তার মিথ্যাচরণের যোগ্য শাস্তিই হয়েছে! সে টাকার লোভে মৃগাঙ্কমৌলিকে বিয়ে করছে না—এটাই সে চিরদিন নিজের মনকে বোঝাতে চেয়েছে, একদিন অচলাকে ঘটা করে এমন কথাও বলতে গিয়েছিল যে তারা গরীব হয়ে পড়েছে বলেই সে আর ওর ধনী কাকাকে বিয়ে করতে চায় না। শেষের দিকে আর সে গর্ব রইল না ঠিকই—কিন্তু তবু, টাকার জন্যই মৃগাঙ্কমৌলিকে ও বিয়ে করেছে এটা কোনদিনই মনে মনে স্বীকার করতে পারেনি। অবস্থার পার্থক্য ওদের মধ্যে যে কাল্পনিক ব্যবধান রচনা করেছিল সেই-টেকেই শুধু সে লঙ্ঘন করেছে মাত্র—এই কথাই মনকে বুঝিয়েছে। হয়ত সেই আত্মপ্রবঞ্চনাটুকুর জন্যই আজও মুখ ফুটে বাবার দেনার কথাটাই মুখে আনতে পারেনি!

কিন্তু এখন আর কিছুতেই এ মুখোশ রাখা যাচ্ছে না।

একটা হতাশার শৈত্য কতকটা তার অজ্ঞাতে, অন্তত তার মানসিক চোখরাঙানিকে উপেক্ষা করে মেরুদণ্ড বেয়ে উঠে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তার বাবার দেনা সে শোধ করবে, নিজেকে বলিদান দিয়েও সে শোধ করবে—এই আশাটাই তার কাছে বড় ছিল। একহাত সে নেবে তার দাদার ওপর—দাদা পুরুষ হয়েও পিতৃঋণ অস্বীকার করেছে ; চেষ্টা করেনি শুধু তাই নয়—চেষ্টা করবার কথা ভাবেওনি সে—সেটা শোধ দেবার।

অনেকদিন আগে মৃগাঙ্কমৌলির দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল সে। কিন্তু সে কি প্রেম? না শুধুই শ্রদ্ধা। রূপবান মৃগাঙ্কমৌলি, অসাধারণ রূপবান। গুণী ত বটেই। তবু অন্ধ ত! সারা জীবন একটা অন্ধের বোঝা বয়ে বেড়াবার মত ভালবাসা কি তাকে সম্ভব? বয়সেরও অনেকখানি ব্যবধান।' না, সে আত্মবিক্রয় করতে যাচ্ছে পিতৃঋণের জন্য এমন কথাও সে মনকে বুঝিয়েছিল একবার।

আজ সব দিকেই সে যেন পরাজিত।

নিজের বিচিত্র মনোভাব—পরস্পর-বিরোধী মনোভাবের সংঘাতে যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ে মঞ্জু। ভাবতেও পারে না।

মৃগাঙ্কমৌলিকে সে ভালই বেসেছে। বয়সেব ব্যবধান ডিঙ্গিযে অন্ধত্বের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করে স্বামীর প্রতি প্রেম তার সমস্ত মনকে অনুপ্লাবিত করেছে। সুতরাং আত্মবলিদানের প্রশ্নও আর ওঠে না। এবং আজ···অস্বীকার করার উপায় নেই, একথা মানতে সে বাধ্য—নানাসমস্যা থেকে ত বটেই, কতকটা দারিদ্র্য থেকে মুক্তির জন্যও সে বিযে করেছিল! হয়ত আবার দারিদ্র্য, এবং সেই সব অপ্রীতিকর সমস্যাব সম্মুখীন হ'তে হবে, এইটেই যেন তার কাছে আজ বড় সমস্যা। তাব সঙ্গে পিতৃঋণ ত আছেই। এ একটা ব্যক্তিগত অপমানের প্রশ্ন তার কাছে। একটা শোচনীয় পরাজয়।···

হঠাৎ মনে হ'ল মঞ্জুর—সে কি পাগল হয়ে যাবে নাকি? কত মেয়ে ত জীবনকে কত সহজে নেয়? সে কেন নিতে পারে না? সে কেন এমন সৃষ্টিছাড়া, এমন স্বতন্ত্র? কেবলই আত্মবিশ্লেষণ আর আত্মবিচার, কেবলই মনের গহনে ডুব দেবার চেষ্টা কেন? আর পাঁচজনের যদি এত ভাবনা না ভেবেও চলে যায় ত তারই বা চলবে না কেন?

সে আর কিছু ভাববে না, কিছু না।

সে জোর করে সদ্য-বর্ষণ-সিক্ত বারান্দার থামটাতে মুখটা চেপে ধরে

চোখ বোজে। আঃ !…কান ও গালটা যেন আগুন হয়ে উঠেছিল, ভিজে থামটায় চেপে ধরতে কী ভালই লাগছে।…সে আর কিছু ভাববে না, ভাবতে পারছে না।

মৃগাঙ্ক নিঃশব্দে ঘরে এসে দাঁড়াল। খাটের যেখানটায় ঠেস দিয়ে মঞ্জু দাঁড়িয়েছিল সেইখানটা অনুভব করল—তারপর তেমনিই নিঃশব্দে বারান্দায় এসে মঞ্জুর কাঁধে হাত রাখলে। ডাকলে স্নিগ্ধকণ্ঠে, 'মঞ্জু ?'

মঞ্জু চমকে উঠল একটু। তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে মৃগাঙ্কর হাতটা ধরে বললে, 'চলো ভেতরে যাই। আজ অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে কাটিয়েছ, বসবে চলো।'

মৃগাঙ্কমৌলি বাধা দিল না। ওর কাঁধে হাত রেখে অভ্যাস মত খাটের ধারে এসে বসল—তারপর মঞ্জুকে একেবারে বুকের কাছে টেনে নিয়ে ওর মাথায় নিজের গালটা চেপে ধরে বললে, 'কী ভাবছিলে বলো ত মঞ্জু, বাবার দেনার কথাটা না ?'

শিউরে উঠল মঞ্জু। লোকটা কি অন্তর্যামী ?

অন্ধের বাইরের দৃষ্টিটা নষ্ট হয়ে যায় বলেই নাকি তার অন্তর্দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ হয়—একথা বহুলোকের মুখে শুনেছে মঞ্জু—কিন্তু তাই বলে এতটা তার ধারণারও অতীত।

অনেকক্ষণ সময় লাগল মঞ্জুর বিস্ময়টা সামলে নিতে।

লজ্জায় সে তাকাতেও পারছিল না স্বামীর দিকে—যদিচ তার চোখে চোখ পড়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। অবশেষে অনেক কষ্টে যখন তাকাল—তখন দেখল তার মুখ প্রসন্ন মধুর হাসিতে উদ্ভাসিত। সে হাসিতে বরাভয় অনুভব করে সে বলে ফেলল, 'হ্যাঁ। কিন্তু আমি ত তোমাকে বলিনি কোনদিন ?'

আবারও হাসল মৃগাঙ্কমৌলি। ওর গালটা টিপে আদর ক'রে

বললে, 'তোমার মনের কথা আমার কাছে কোনদিনই মুখে বলবার দরকার হবে না—এই গর্বটুকু যেন বজায় রাখতে পারি এমনি ক'রে!' তারপর বললে, 'ভয় নেই। তোমার বাবার দেনা তুমি শোধ করতে পারবে।'

মঞ্জু ওর বুকে মুখটা ঘষতে ঘষতে বললে, 'কিন্তু কৈ তুমিও ত এতদিন কোন কথা বলোনি।'

'বলবার সময় আসেনি যে! তোমরা ওঁর দেনার বিপুলতা শুনেই পাগল হয়ে গিয়েছিলে, সে সম্বন্ধে কোন খোঁজখবর করাও দরকার বিবেচনা করোনি। আমি অন্ধ হলেও বিষয় সম্পত্তি আমি নিজেই দেখি, আমার একটা আফিসও আছে—তাও ত তুমি জানো। এসব কিছু কিছু বুঝি। তোমার বাবার দেনাটা কার কাছে—এই সহজ প্রশ্নটাও তুমি তোমার দাদাকে কোনদিন করোনি, কাগজপত্রও দেখোনি।'

তারপর একটু থেমে ঈষৎ গম্ভীর-কণ্ঠেই মৃগাঙ্কমৌলি বললে, 'মঞ্জু, সংসারটা বড়ই কঠিন স্থান। টাকা-পয়সার সঙ্গে হৃদয়াবেগের কোন যোগাযোগ নেই।...আশী হাজার টাকা নাকি তাঁর দেনা। সে দেনা দিলে কে? কিসের ওপর দিলে? তোমরা কেউ খোঁজ করেছিলে কোনদিন? বাড়ীটাও ত তাঁর নিজের ছিল না। অত টাকা কি কেউ শুধু-হাতে ধার দেয়?...খোঁজ করতে জানা গেল যে তিনি যার মারফৎ শেয়ার কেনাবেচা করতেন সেই লোকটির কাছেই নাকি তাঁব বেশীর ভাগ দেনা। তুমি ছেলেমানুষ—এসব কথা জানোও না তার ওপর—কিন্তু আমি এই কাজ বহুদিন ধরে করছি। এই সব ব্রোকার বা সাব-ব্রোকাররা একটি ঘণ্টাও টাকা বাকী রাখেন না। মার্জিন যতক্ষণ হাতে থাকে ততক্ষণই ধরে রাখেন—নইলেই বেচে দেন।...আসলে তোমার বাবা ছিলেন অত্যন্ত ভালমানুষ; তার ওপর য়্যামেচার হিসেবেই এই কাজ করতে গিয়েছিলেন, চাকরী বজায় রেখে। ব্যবসায়ে য়্যামেচারের স্থান

নেই। তাঁকে ওরা যা বুঝিয়েছিল—তিনি তাই বুঝেছিলেন। আসলে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা বিরাট ফাঁকি। মাত্র তেইশ হাজার টাকা তিনি নিয়েছিলেন তোমার পিসেমশাইয়ের কাছ থেকে হ্যাণ্ডনোট দিয়ে—সেইটেই আসল দেনা। সে ভদ্রলোক অথচ কোনদিনই তাগাদা করেননি। আর কিছু খুচ্‌রো দেনা আছে—সব জড়িয়ে আটাশ হাজারের বেশী নয়। এইটেই তুমি শোধ করে দিও। উনি যে বন্ধুর থ্রু দিয়ে শেয়ারের কাজ করতেন, তাকে পুলিশের ভয় দেখিয়ে সব শোধ লিখিয়ে নিয়েছি, সে কাগজ আমার ঐ ড্রয়ারটার মধ্যে আছে।'

মৃগাঙ্কমৌলি—বোধ করি তার এই সংবাদের কী প্রতিক্রিয়া হয় তা অনুভব করবার জন্যই—থামল এইবার। মঞ্জু স্তম্ভিত হয়ে শুনছিল কথাগুলো—অবিশ্বাস্য, একেবারে অবিশ্বাস্য যেন। উপন্যাসের মতই অবাস্তব বুঝিবা। আর সেই সঙ্গে নিজের অজ্ঞাতসারেই স্বামীর প্রতি সুগভীর বিস্ময়-মিশ্রিত একটা শ্রদ্ধায় মনটা ভরে যাচ্ছিল। এঁকেই সে বোঝা বলে ভাবছিল জীবনের ?

মনে পড়ল মৃগাঙ্কমৌলিই একদিন বলেছিল, 'সবই আছে আমার শুধু চোখ দুটোই নেই!' আজ মনে হ'ল মঞ্জুর—সেটাও মিছে কথা। এমন করে যিনি মানুষের মনের মধ্যে দেখতে পান তাঁর আবার চোখ নেই!···বাইবের দৃষ্টিরই বা অভাব কি? যারা চক্ষুষ্মান বলে জাহির করে নিজেদের—তাদের কারুর যা নজরে পড়ল না, এই অন্ধ লোকটি ত অনায়াসে তা দেখতে পেলেন!···স্নেহে, প্রেমে, কৃতজ্ঞতায় ওর চোখে জল এসে পড়ল।

'কি গো, কথা কইছ না যে!'

অতিকষ্টে প্রায় রুদ্ধ-কণ্ঠে মঞ্জু বললে, 'কিন্তু এখন ত ত্রিশহাজার টাকাও—, তুমি—তোমার পক্ষেও—'

আরও জোরে ওর মাথাটা নিজের বিশাল বক্ষে চেপে ধরে মৃগাঙ্ক-

মৌলি বলল, 'ঠিক এই কারণেই আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে, সমস্ত ভাবনা দিয়ে তোমাকে কামনা করেছিলাম মঞ্জু।...তুমিই একমাত্র মেয়ে বোধহয়, যে তার নিজের টাকার কথাটা ভুলে যেতে পারে। অচলা তো তোমাকে বলেই ছিল মঞ্জু যে—আমার বাবা—আমায় যে দয়া ক'রে বিবাহ করবে তার জন্য—বহুকাল ধরেই একটা টাকা পৃথক ক'রে রেখে গিয়েছিলেন! তুমি সেটার কথা ভুলেই গিয়েছিলে, না? সেটার অঙ্কও বড় কম নয় মঞ্জু, পঞ্চাশহাজার টাকা। সেটা সুদে আসলে অনেকখানিই হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এমন ভাবেই সেটা রেখে গেছেন বাবা যে আর কারুরই হাত দেবার উপায় ছিল না। যে আমাকে বিবাহ করবে, বিবাহের একবছর পরেও যদি সে আমার কাছে থাকে ত সে-ই শুধু ঐ টাকাটা পাবে। অর্থাৎ আর মাত্র তিনটি মাস পরেই তুমি হবে সেই টাকার মালিক।'

অনেকক্ষণ সময় লাগল সংবাদটা উপলব্ধি করতে। আজ কি বিস্ময়ের শেষ হবে না। এতগুলো টাকা তার? তার নিজস্ব?

মৃগাঙ্কমৌলি জানে যে এ-খবরটা ভাল করে মঞ্জুর ধারণায় পৌঁছতে কিছু সময় লাগবে। তাই সেও কথা কইল না—সস্মিত মুখে চুপ করে বসে রইল।

একটু পরে মঞ্জু নিজেকে সেই অভিভূত অবস্থা থেকে সামলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। বেশ দৃঢ় কণ্ঠে বললে, 'কিন্তু সে টাকা তোমারই কাজে লাগা উচিত। বাবা মারা গেছেন তাঁর প্রতি কর্তব্য আমার গৌণ। মুখ্য তুমি। স্বামীর প্রতি কর্তব্য স্ত্রীর সর্বপ্রধান ও প্রথম। ওটাকা দিয়ে আমি এখন পিতৃঋণ শোধ করতে পারব না!'

এবার মৃগাঙ্কমৌলির পালা। তারও সমস্ত অন্তর প্রেমে ও কৃতজ্ঞতায় আকুল হয়ে উঠল। প্রাণপণ চেষ্টায় মৃগাঙ্ক নিজের হৃদয়াবেগ সংবরণ করে নিল বটে—তবুও কণ্ঠস্বরের ঈষৎ কম্পনে তার রেশটুকু লেগেই রইল,

মঞ্জুর একখানা হাত নিজের দুটো হাতের মধ্যে চেপে ধরে বললে, 'আমার মা-বাবা কাশীতে বসে তাঁদের শেষ জীবনটা শুধু আমার ভাবনাই ভেবেছেন আর বিশ্বনাথের কাছে কেঁদেছেন—যে আমার এমন একটি বৌ আসুক্, যে শুধু আমাকে টাকার লোভে বিয়ে করবে না—ভালও বাসবে। তাঁদের সে কান্না সার্থক হয়েছে মঞ্জু। আমি হয়ত একটু স্বার্থপরের মতই তোমাকে ছিনিয়ে নিলুম—মনে এই রকম একটা গ্লানি ছিল—কিন্তু আজ আমি নিশ্চিন্ত।'

তাবপর একটু থেমে বললে, 'কিন্তু অত চিন্তার সত্যিই কোন কারণ নেই মঞ্জু। আমাব অনেকখানিই গেছে বটে—কিন্তু সব যায়নি। একটা কলিয়ারী বেচে দিয়েছিলুম কিন্তু এখনও দুটো কলিযারী আছে। এই বাড়ীটা ছাড়াও একটা ছোটবাড়ী মা দিয়ে গেছেন আমাকে—তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি সে বাড়ী—আমার দান-বিক্রয়ের অধিকার নেই, যদি কখনও, —ঈষৎ লাল হয়ে উঠল মৃগাঙ্কমৌলি, 'যদি কখনও তোমার ছেলেপুলে হয় ত শুধু তারই বা তাদেরই সেই অধিকার বর্তাবে।...আমাব বাবা-মা, আমার অসহায় অবস্থার জন্যেই বোধহয়, বেশ একটু পক্ষপাত করে গেছেন। এবং কতকটা সেই জন্যেই, দাদারা কিছু কিছু বিরূপ হয়েছেন আমার ওপর, আর্থিক ব্যাপারে তাঁদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ত নেই-ই, পারিবারিক সম্পর্কও শিথিল হয়ে এসেছে।'

মঞ্জু বলে উঠল, 'তবু ভালো, আমার মনে হয়েছিল বুঝি আমার জন্যেই ওঁরা তোমার ওপর উদাসীন হয়ে উঠেছেন।'

'না। তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন যে আমাদের বিয়েব মাত্র ছমাস আগে বাবা ও আটমাস আগে মা মারা গেছেন।...তাঁদের উইল জানতে পারার পর থেকেই ওঁদের মনোভাব বদলাতে শুরু হয়েছে। আর হওয়াই স্বাভাবিক, সে জন্য তাঁদের দোষ দিই না।' হাতের মধ্যে ধরা হাতখানায় আর একটু চাপ দিয়ে মৃগাঙ্কমৌলি বললে, 'সে জন্যে

আমার কোন দুঃখও নেই মঞ্জু—একজনকে পেয়েই আমার সকল অভাব মিটেছে !'

বাঁধ যখন ভাঙ্গে তখন একটু ভেঙ্গেই থামে না। জলের বেগ তার এতদিনের বন্ধনদশার মূল্য কড়ায়-গণ্ডায় শোধ ক'রে নেয়। চারিদিক প্লাবিত করে শোধ তোলে সেই বাঁধনের। এদেরও বুঝি সেই দশা। দুজনেরই নিরুদ্ধ অন্তরাবেগের বাঁধ ভেঙ্গেছে। এত দিনের শুষ্কতার—রিক্ততার—নিঃসঙ্গতার পূর্ণ মূল্য আদায় ক'রে নিচ্ছে ওরা। একটি অন্ধ, প্রায়-বিগতযৌবন লোক এবং একটি তরুণী মেয়ে--পরস্পরকে এত ভালবাসতে পারে—না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত বৈকি! ওদের দিন এবং রাত্রি, সপ্তাহ এবং মাস কোথা দিয়ে, কোন্ স্বপ্নবিহ্বলতার মধ্যে দিয়ে কেটে যেতে লাগল, তা ওরা বুঝতেও পারল না।

অবশ্য মৃগাঙ্কমৌলি নিয়মিত অফিস যেত কিন্তু সে কতটুকুই বা। নিজের অফিস, বারোটায় যেত, চারটেয় ফিরে আসত। এই একটু সময় ছাড়া দুজন কেউ কাউকে ছেড়ে থাকত না। ওসময়টাও মৃগাঙ্ক নিজের অফিসে এসে নানা কাজের ফাঁকে ফাঁকে অনুভব করত নিজের জামার বুকে-লাগা-মঞ্জুর মাথার গন্ধ; আর মঞ্জুব বিদায়কালের চুম্বনের স্মৃতি নিয়ে থাকত দিবাস্বপ্নে মশগুল হয়ে। সে তার বাপের বাড়ী যায় না—মা ডেকে পাঠালে জবাব দেয়, 'তোমার জামাইয়ের বড় অসুবিধা হয় মা, আমি না থাকলে।' এমন কি অচলাকেও এখন যেন আর সহ্য করতে পারে না। কখন যে সে ভেতরে ভেতরে অচলার গুরুজন-স্থানীয়া হয়ে গেছে তা সে নিজেই বোঝেনি। এখন অন্তরঙ্গভাবে তার সঙ্গে বসে গল্প করতে রীতিমত লজ্জা লাগে ওর, পাছে তাদের প্রণয়লীলার কথা বেরিয়ে যায় মুখ দিয়ে। যে সুখে মানুষ পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, বিভোর হয়ে থাকে—

সেই কথা আলোচনা করাই ত স্বাভাবিক! তাই সে ওর সঙ্গে কথা কওয়াটাই এড়াতে চায়।

এইভাবে কয়েকটি মাস কেটে গেল ওদের—ক্ষণকালের সুখস্বপ্নের মত।

কিন্তু অকস্মাৎ একদিন এই নির্মল আকাশে বেশ-একটু কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে।···

বিলিতী ডাকের চিঠি আসে একখানা মঞ্জুর নামে। এয়ার মেলের চিঠি—অথচ বেশ বড় গোছের চৌকো খাম।

তার আবার বিলেতে কে এমন চেনা লোক আছে?

এত পয়সা ডাকখরচ ক'রে তাকে চিঠি পাঠিয়েছে?

অনেক ভেবেও মঞ্জু বুঝতে পারে না। হাতের লেখা নয়—ঠিকানা টাইপ করা, প্রেরকের নামও নেই খামের ওপরে।

বহুক্ষণ মঞ্জু চিঠিখানা হাতে নিয়ে বসে থাকে। কিছুতেই মনে পড়ে না কারুর নাম। খামখানা খুললেই আর অনুমানের প্রয়োজন থাকে না—কিন্তু তাতে নিজের বুদ্ধির ওপরও শ্রদ্ধা থাকে না। এ অবস্থা প্রায় সকলকার জীবনেই আসে মধ্যে মধ্যে—হাতের লেখাটা পরিচিত বলে মনে হয় অথচ ঠিক চেনাও যায় না। এক্ষেত্রে মন স্মৃতির দুয়ারে মাথাকুটে অকারণে ক্ষতবিক্ষত হয়, তবু খামটা খুলে দেখতে ইচ্ছে করে না। তার ভেতর কোথায় একটা পরাজয়ের সূক্ষ্ম অপমান-বোধ থাকে—মন যেটা মেনে নিতে চায় না সহজে!

অবশেষে একসময়ে চিঠিটা খুলতেই হয়। সুরজিৎ দা!

আশ্চর্য। এ নাম তার মনে পড়ার কথাও নয়। সুরজিৎদা তাকে চিঠি পাঠাবে—সেদিনকার সেই অপমানের পর—এ যে ধারণারও অতীত।

চিঠি আর তার সঙ্গে একটা ওআটার-কলার স্কেচ্।

পড়বার আগে বার-দুই চিঠিটা উল্‌টে পাল্‌টে দেখে মঞ্জু। নামটা, হাতের লেখা দেখেও যেন বিশ্বাস হয় না।

কিন্তু চিঠিটা পড়ে বিস্ময় আরও বেড়েই যায়। নিজের চোখকে বিশ্বাস করাও কঠিন হয়ে পড়ে।

সুরজিৎদা তাকে অজস্র ধন্যবাদ দিয়ে চিঠি লিখেছে। মঞ্জুর দয়াতেই তার এতদিনের স্বপ্ন সার্থক হ'তে চলেছে। বিলেতে এসে কোন দিন তার প্রতিভা বিকাশের পূর্ণ সুযোগ পাবে—এ ছিল তার কল্পনারও অতীত। এই উদারতা, এই স্বার্থত্যাগ, মনীষা ও প্রতিভাকে পূর্বাহ্নে চিনতে পারা বা তার মূল্য নিরূপণ-করা একমাত্র মঞ্জুর মত যথার্থ শিক্ষিতা এবং শিল্পবুদ্ধিশালিনী মেয়ের পক্ষেই সম্ভব।···সেদিন টাকাটা পাঠানোর সঙ্গে তাকে আর এ বাড়ীতে আসতে নিষেধ করা হয়েছিল বলেই সুরজিৎ তার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাতে আসতে পারেনি—নইলে অকৃতজ্ঞ সে নয়। যাই হোক্—সেদিনই সে প্রতিজ্ঞা করেছিল, বিলেতে পৌঁছবার পর প্রথম আঁকা ছবিটা সে মঞ্জুকে পাঠাবে—এবং তার সর্বশ্রেষ্ঠ ছবিটাও। তার ইচ্ছে আছে যে এখানে বসে স্মৃতি থেকে মঞ্জুর একখানা ছবি আঁকবে—এবং সমস্ত সাধনা ও শক্তি উজাড় ক'রেই আঁকবে। তারপর ভগবান যদি দিন দেন ত সেই ছবিটিই পাঠাবে সে য়্যাকাডেমীর প্রদর্শনীতে।······

এমনি নানা কথা। স্তুতিবাদই বেশী। শেষে অবশ্য আরও একটা কথা আছে। এখানে শিল্প-ছাত্রদের খরচ বড় বেশী—চাকরী সে একটা নিতে পারে কিন্তু তাতে কাজের ক্ষতিই হবে। মঞ্জুর মত আর কেউ যদি তাকে সামান্য কিছু টাকা দিত ত নিশ্চিন্ত হয়ে সে নিজের সাধনায় মন দিতে পারত! অবশ্য মঞ্জুকে বলবার আর তার মুখ নেই। অনেক দিয়েছে সে। কিন্তু—সামান্যর জন্য সে সর্ব শক্তি ও সর্ব সময় শিল্পের সাধনায় নিয়োগ

করতে পারবে না—এটা ভাবতেও যেন সে পাগল হয়ে যায়। মঞ্জুর মত আর একজনও যদি থাকত!

চিঠিখানা পড়ে স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল মঞ্জু। বার-দুই পড়বার পরও কথাগুলোর কোন অর্থই হৃদয়ঙ্গম হ'ল না।

ছবিখানা উল্টে পাল্টে দেখলে। সাধারণ একটা বিলিতী ল্যাণ্ড্‌-স্কেপ—নিতান্তই মামুলি। তা হোক—বিলেতের মাটিতে পা দেবার পর সর্বপ্রথম আঁকা ছবি তাকেই পাঠিয়েছে সুরজিৎ। আর কাউকে নয়; স্ত্রীকে ত নয়ই—

কিন্তু টাকার কথাটা কী লিখেছে এত ক'রে?

একবার মনে হ'ল তবে কি সুরজিৎ তাকে বিদ্রূপই করেছে—সে দেয়নি ব'লে? অর্থাৎ মঞ্জু না দিলেও বিলেত যাওয়া তার আট্‌কায়নি।

আবও একবার পড়লে চিঠিখানা, মন দিয়ে। না, ঠিক সে রকম ত মনে হচ্ছে না। তবে—?

বিহ্বল শূন্য দৃষ্টি মেলে বসেই রইল মঞ্জু বহুক্ষণ—এক ভাবে। তারপর একটু একটু ক'রে সেই শূন্য দৃষ্টিতে সন্দেহ ও রোষের ছায়া ভরে এল। চিঠিখানা ও ছবিটা আবার খামে পুরে মুখ কালো করে সে এসে দাঁড়াল মৃগাঙ্কমৌলির ঘরে।

মৃগাঙ্ক ওর পায়ের শব্দ পেয়ে হাসি হাসি মুখ তুলে কী একটা রসিকতা করতে যাচ্ছিল কিন্তু তার মুখ থেকে কোন শব্দ বেরোবার আগেই মঞ্জুর কঠিন কণ্ঠ কানে এল, 'তুমি সুরজিৎদাকে টাকা দিয়েছিলে—বিলেত যাবার?'

যেমন আকস্মিক, তেমনি অপ্রত্যাশিত—প্রশ্নটা।

নিমেষের মধ্যে হাসি-মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল মৃগাঙ্কমৌলির। মাথা নিচু করে বললে, 'হ্যাঁ।'

'কেন দিয়েছিলে? পরিচয় তার আমার সঙ্গেই। আমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলুম—তুমি তাকে দিলে কেন?'

'তাড়িয়ে দিয়েছিলে হয়ত—আমি মনে করলাম—তোমার কাছে টাকা ছিল না, অথচ আমার কাছে চাইতেও সঙ্কোচবোধ হয়েছিল অতগুলো টাকা, তাই—। সুরজিৎদাকে তুমি কত শ্রদ্ধা করো, তার প্রতিভার উপর তোমার কত আস্থা—তা ত তুমিই কতবার বলেছ আমায় মঞ্জু !'

'তুমি সেই জন্যেই টাকাটা দিয়েছ ? ঠিক ক'রে বলো দিকি !' তীব্র, তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে মঞ্জুর কণ্ঠস্বর, 'না, নিরাপদে বহুদূরে তাকে সরিয়ে দেবার জন্য ঘরের কড়ি বার করে দিয়েছ ! তা নইলে ত আমাকে জানিয়েই দিতে পারতে !···বাঃ, কী বিশ্বাস তোমার নিজের স্ত্রীর ওপর !'

'তা নয় মঞ্জু। তুমি তাকে শ্রদ্ধা করো বলেই, তাঁর উন্নতিতে তোমার আনন্দ হবে বলেই—বিশ্বাস করো তুমি—'

ব্যাকুল, অসংলগ্নভাবে বেরিয়ে আসে মৃগাঙ্কমৌলির কথাগুলো।

'সুরজিৎদার প্রতি আমার মনোভাবে শ্রদ্ধার চেয়েও বেশী কিছু আছে —এই তোমার মনোভাব কিনা আজ নিজের বুকে হাত দিয়ে বলো দিকি !'···

মঞ্জুর কণ্ঠস্বরে বিষ উপ্‌চে পড়ে যেন !

তারপরই আরও একটা কথা বুঝি মনে পড়ে যায় ওর, কাছে সরে এসে তীক্ষ্ণতর কণ্ঠে ব'লে ওঠে, 'কী করে জানলে তুমি যে সে আমার কাছে টাকা চেয়েছিল, আমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি ?···তুমি আমার পিছনে পিছনে আড়ি পাতো ?'

আরও হেঁট হয়ে আসে মৃগাঙ্কমৌলির মাথা।

'কী বলো—চুপ করে রইলে কেন ? জবাব দাও !'

ধীরে ধীরে বললে মৃগাঙ্ক, 'সুরজিৎবাবু তোমাকেই একখানা চিঠি দিয়েছিলেন—তাঁর অনুরোধটা পুনর্বিবেচনার জন্য, অনুনয়-বিনয় করে।'

'আমাকে চিঠি দিয়েছিলেন ?···কৈ সে চিঠি ত আমি পাইনি !··· তুমি পড়লে কি ক'রে সে চিঠি ? কে পড়ে শোনাল ?'

থে—সেদিন আর দূরে থাকা সম্ভব হ'ইল। শব্দে। বহুক্ষণ পরে আড়ষ্ট-কণ্ঠেবলে মনকে প্রবোধ দিলে মঞ্জু!

'তারপর আস্তে আস্তে সবটা চিঠি পড়া যে অপরাধ তা জানবার মত বয়স এবং নে যে একটা অদৃশ্য পর্দ তোমার!...তার ওপর সে চিঠি আরও একজনকে তার মনের মধ্যে কোন কৈফিয়ৎই নেই।...ছি ছি! স্ত্রীর চিঠি তুমি চাকরকে সেটার ওপড়িয়ে নিলে? এর একটিই মাত্র অর্থ হয় যে—স্ত্রীর সম্বন্ধে তুমি অল্প মাত্রায় সন্দিগ্ধ!...হায়রে! এক সময় ভেবেছিলাম তুমি মানুষের মনের ভিতরটা দেখতে পাও। এখন দেখছি গোয়েন্দাগিরি অবধিই তোমার দৌড়। তুমি ঈর্ষায় ও সন্দেহে অন্ধ হয়ে উঠেছ। তোমার মত দুর্ভাগ্য সত্যিই আমি দেখি নি কারুর—তুমি ভেতরে-বাইরে সমান অন্ধ।'

হাঁপাতে হাঁপাতে উত্তেজিত ভাবে বলতে থাকে মঞ্জু। তবু কিছুতেই যেন তার আক্রোশ মেটে না। আঘাত দিয়ে প্রত্যাঘাত না পেলে মানুষের বুঝি আঘাত দেবার ইচ্ছা আরও তীব্র হয়। মঞ্জু একটু থেমেই আরও বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে বলে, 'আমাকে তখনই সকলে বারণ করেছিল। কানা-খোঁড়ার একগুণ বাড়া। ভগবান মানুষ বুঝেই শাস্তি দেন! অন্ধকে বিয়ে করে কেউ কখনও সুখী হতে পারেনি। লোকের কথা না শুনেই ভুল করেছি।'

মরণাহত ব্যক্তির মতই যন্ত্রণায় কুঁচ্‌কে ওঠে মৃগাঙ্কমৌলি, হাত জোড় করে বলে, 'এই একটা অপরাধ আমার ক্ষমা করো মঞ্জু। আর ত আমি কখনও কোন অন্যায় করিনি তোমার কাছে!'

'কে জানে? কেমন করে আর তোমাকে বিশ্বাস করব আমি? কত কাল ধরে ওই গোয়েন্দাগিরি করছ, কে জানে!...তুমি যখন সুরজিৎদাকে শ্রদ্ধা করি ভেবে ঈর্ষায় গোয়েন্দাগিরি করে বেড়াচ্ছ তখন আমি তোমার জন্যেই শ্রদ্ধার ডালা সাজাচ্ছি মনে মনে।...ইস্‌, কী নির্বোধ আমি। ভালই হ'ল ভুল ভেঙ্গে দিলে। সুরজিৎদাকে অনেকদিন আগেই ঘৃণা

করতে শুরু করেছিলুম, আজ থেকে ই মনে করলাম—তোমার কাছে টাকত

সম্বন্ধেই সব মোহ ঘুচে গেল আমার। ও সঙ্কোচবোধ হয়েছিল অতং

যেন শেষ আঘাত দিয়েই মঞ্জু ঘর থেকে শ্রদ্ধা করো, তার প্রমৃগাঙ্ক-

মৌলি পাথরের মত অনড়, স্তম্ভিত হয়ে বসে ার বলেছ আমায় ম

'রে বলো দিকি

াকে সা

এর পর স্বামী-স্ত্রীর কয়েকটা দিন কাটল যেন দুঃসহ দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়েই।

হয়ত মঞ্জু সেই দিনই কোথাও চলে যেত, বাড়ীর বাইরে এসে একবার দাঁড়িয়েও ছিল—কিন্তু 'যেখানে হোক্' মুখে বলা সোজা হ'লেও সত্যি-সত্যিই সেই অজ্ঞাত 'যেখানে-হোক'-এর ভরসায় পথে বেরোনো যায় না। দাদার বাসায় গেলে বিশ্রী জবাবদিহির মধ্যে পড়তে হবে—তারপর শুরু হবে মায়ের স্বার্থপর উপদেশ ও তিরস্কার; আত্মীয়স্বজনদের সহানুভূতি ও গোপন উল্লাস। প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ত বটেই! না সেখানে যাওয়া অসম্ভব। আর এমন কেউ নেই কলকাতায়, যেখানে গিয়ে দুচারটে দিন নিরুপদ্রবে কাটানো যায়।

সুতরাং শেষ পর্যন্ত বাড়ীতেই ফিরে আসতে হয়েছিল। যদিও দু-তিন দিন সে স্বামীর ঘরে ঢোকেনি, কোন খবরও নেয়নি।...তারপর আর বাহ্য ব্যবধান রাখা সম্ভব হয়নি অবশ্য—কারণ মৃগাঙ্কমৌলির বুড়ো চাকর, যে এতকাল সব সময় ওর কাছে কাছে থাকত—তাকে মঞ্জুই ছুটি দিয়ে এবং টাকা দিয়ে দেশে পাঠিয়েছিল। দেশে তার ভাই-পো ভাইঝিদের দেখে তীর্থ করতে যাবে শ্রীক্ষেত্রে।...মৃগাঙ্কমৌলি তার সাহায্যপ্রার্থী হয়নি, কিন্তু যেদিন স্নান করতে গিয়ে স্নানের ঘরের পাথরের শেল্‌ফে লেগে মাথা ফেটে গেল তার এবং প্রায়-অভুক্ত ভাতের থালা ফিরে যেতে দেখল নিজের

চোখে—সেদিন আর দূরে থাকা সম্ভব হ'ল না। তার কর্তব্য তার কাছে, এই বলে মনকে প্রবোধ দিলে মঞ্জু!

তারপর আস্তে আস্তে সবটাই সহজ হয়ে এল। কিন্তু মঞ্জুর অতি-সচেতন মনে যে একটা অদৃশ্য পর্দা পড়েছিল তা আর নড়তে চাইল না। কোথায় ওদের মনের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম ব্যবধান রচিত হয়েছিল—সেটা রয়েই গেল। সেটার ওপর আর সেতু রচিত হ'ল না কিছুতেই!

মৃগাঙ্কমৌলি নীচ—এটা ঠিক মনে না হ'লেও তাকে বেশ একটু ছোটই মনে হতে লাগল। আসলে ও সংকীর্ণ পরিধিরই মানুষ—যতটা শ্রদ্ধার আসনে সে বসিয়েছিল ওকে নিজের মনের মধ্যে, ততটা শ্রদ্ধার ঠিক যোগ্য নয়। একটু বেশী উদারতা আরোপ ক'রে ফেলেছিল ও।

তার পাশে—এতকালের বহুপরিচয়ের মালিন্য-লিপ্ত সুরজিৎকে যেন অনেক বড়, অনেক উজ্জ্বল দেখায়। সুরজিৎ ঐ শেষের টাকাটার ইঙ্গিত না দিলে সে হয়ত তাকে রীতিমত পূজোই শুরু করত সেদিন থেকে।

তা হোক—মঞ্জু নিজেকেই বোঝায় মনে মনে—দোষে গুণে মানুষ। ওর সেই প্রথম মুকুলিত কৈশোরে সুরজিৎকে সে যে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছিল তাতে এমন কিছু ভুল হয়নি ওর। সারা দুনিয়াই তাকে ভুল বুঝেছিল, কিশোরী মঞ্জুই একমাত্র তাকে চিনেছিল, তার ভেতরের শিল্পীকে দেখতে পেয়েছিল। শিল্পী যে মানুষ হিসেবেও খুব বড় হবে—এতটা আশা করা বৃথা। তবে ছোটও যে নয় সুরজিৎদা তার কৃতজ্ঞতাতেই সেটা প্রমাণ করে দিয়েছে।

উঃ—কী অন্যায়ই হ'ত, সুরজিৎদা যদি বিলেতে যেতে না পেত!

এই একটা কারণেই সে আবার মৃগাঙ্কমৌলির কাছে একটু কৃতজ্ঞ বোধ না করে পারে না। যে কারণেই হোক্—মৃগাঙ্কমৌলিই সে সুযোগ দিয়েছে।

স্বরজিৎদা যেদিন বিজয়ী হয়ে, সার্থক হয়ে ফিরে আসবে—তার সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি উৎসর্গ করবে একমাত্র মঞ্জুর নামেই—সেদিন জগৎসুদ্ধ সবাই বুঝবে মঞ্জুর দূরদৃষ্টি কত সুদূর-প্রসারী। হয়ত মঞ্জুরই প্রতিকৃতি সেই কীর্তি-হিসাবে স্বীকৃত হবে। যদি সত্যিই কোনদিন তার ছবি য়্যাকাডেমীর সালোঁতে ঝোলে?···

ভাবতেও পারে না মঞ্জু সে দুর্লভ সৌভাগ্যের কথা।···

মঞ্জু ধীরে ধীরে মৃগাঙ্কর অনেক কাজ নিজের হাতে তুলে নিলে। মৃগাঙ্কর একজন প্রাইভেট সেক্রেটারী অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল—মঞ্জুকে পেয়ে বেঁচে গেল সে। মঞ্জুরও উচ্চমধ্যবিত্ত-ঘরনীর অলস জীবন ভাল লাগছিল না, সে-ও যেন একটা কাজ পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে।

তা ছাড়াও একটা সুবিধা হ'ল ওর। ওদের দুজনের মধ্যকার সেই মনোমালিন্যের সূক্ষ্ম ব্যবধানটাও অনেকখানি কমে গেল। এই কাজের মধ্য দিয়ে মঞ্জু স্বামীর অনেকটা কাছে এসে পড়ল। মঞ্জুর মত মেয়ের পক্ষে শ্রদ্ধার আসন ছাড়া কাউকেই ভালবাসার আসনে বসানো সম্ভব নয়, কাজ করতে করতে আবারও মৃগাঙ্কমৌলির ওপর শ্রদ্ধা এবং প্রীতি ওর নিবিড় হয়ে উঠল।

মৃগাঙ্ক যে ব্যবসা-বাণিজ্য এত ভাল বোঝে, এ সম্বন্ধে তার এত জ্ঞান, পাণ্ডিত্য এবং সহজ বুদ্ধি আছে—এ কোনদিন কল্পনাও করতে পারত না মঞ্জু, ওর সঙ্গে কাজ করতে শুরু না করলে। অসাধারণ মেধা এবং স্মৃতি-শক্তি মৃগাঙ্কমৌলির। এ লাইনের পূর্বপথিকদের সমস্ত ভুল-ভ্রান্তির ইতিহাস তার কণ্ঠস্থ, তাই তার হিসাবে ভুল হয় কদাচিৎ। যাকে প্রাথমিক সমস্ত কাজগুলোর জন্যেই পরের মুখাপেক্ষী হ'তে হয়, সে এত সব আয়ত্ত করলে কেমন করে? ভাবতেই যেন অবাক্ লাগে মঞ্জুর। তা ছাড়া

সৌজন্য-জ্ঞানের সঙ্গে ইংরেজী ভাষাতে অসামান্য দখল থাকার জন্য—চিঠি-পত্রগুলি তার যেন সাহিত্য হয়ে ওঠে। ওর চিঠির শ্রুতিলিখন লিখতে বসে এক এক সময় মঞ্জু এমন বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়ে পড়ে যে কলম থেমে যায় কখন, লেখাই হয়ে ওঠে না।

সেদিনও যখন চাকর এসে খবর দিলে, একটি মেয়েছেলে এসেছেন মাইজীর সঙ্গে মুলাকাৎ করতে এবং নিচের ঘরে বসে অপেক্ষা করছেন, তখন সে বসে মৃগাঙ্কমৌলিরই কতকগুলো দরকারী চিঠি লিখে দিচ্ছিল। এই আকস্মিক ব্যাঘাতে সে একটু বিরক্তই হল। ভ্রূ-কুঁচকে বললে, 'আচ্ছা, একটু বসতে বলগে যা, আমি যাচ্ছি।'

মৃগাঙ্কই ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'না না তুমি যাও, কে এসেছেন হয়ত জরুরী কোন দরকার আছে। কিংবা তোমার বন্ধু কেউ—'

অগত্যা মঞ্জু উঠল। তারও বিস্ময় এবং কৌতূহল ইতিমধ্যে যথেষ্টই জাগ্রত হয়েছে। তার কাছে আজকাল তার বন্ধুবান্ধব বড় একটা কেউই আসে না। যারা আসে চাকর তাদের চেনে—সোজা ওপরেই নিয়ে আসে। অপরিচিত কে এল এমন হঠাৎ ?

নিচে নেমে এসে মানুষটিকে দেখে তার বিস্ময় আরও বেড়েই গেল।

সুধা বৌদি।

দরজার দিকে পেছন ফিরে বসে আছে, স্থির পাথরের মূর্তির মত—একেবারে সামনে এসে তবে চিনতে পারে মঞ্জু।

অতি সাধারণ একখানা আধময়লা সাড়ী পরনে—কোথাও কোন অলঙ্কারের চিহ্নমাত্র নেই। যৎপরোনাস্তি নিঃস্ব এবং শীর্ণ দেখাচ্ছে সুধাকে।

রোগা সে বরাবরই কিন্তু এমন শ্রীহীন তাকে কখনও দেখেনি মঞ্জু।

'আরে সুধা বৌদি যে! কী খবর। একটু চা করতে বলি—কেমন ?'

মঞ্জু যেন খুশীই হয়ে ওঠে।

'না না। কিছু দরকার নেই। ব'সো তুমি—দুটো কথা ব'লেই চলে যাবো। তোমার সঙ্গে আত্মীয়তা করতে আসিনি আমি।'

কেমন বিরস এবং তিক্ত শোনায় সুধার কণ্ঠস্বর।

'তোমার শিল্পীর খবর জানো? শুনেছ কিছু?'

'না। সেই যা গিয়েই একখানা চিঠি দিয়েছিলেন। আপনি খবর পাচ্ছেন ত নিয়মিত?'

'আমাকে একখানা চিঠিও সে দেয়নি। দরকারই বা কি? আমার কাছে তার একপয়সাও পাবার আশা নেই তা সে জানে।'

'আপনি সুধা বৌদি বরাবরই ওঁর ওপর একটু বেশী কঠিন।…বোধহয় একটু অবিচারই করেন আপনি!'

'হ্যাঁ—অন্তত তোমার যে সেই মনোভাব তা আমি জানি। আমি তার ওপর অবিচার করেছি, তাকে আমি চিনিনি, বোঝার মত তার ঘাড়ে চেপে থেকে তার জীবনকে বিড়ম্বিত করেছি, তার শিল্পীমনের বিকাশ ঘটতে দিইনি—এই ত? থামলে কেন, বলে যাও।… তাইত তোমার শিল্পীশ্রেষ্ঠকে টাকা দিয়ে তুমি আমার কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে পাঠিয়ে দিয়েছ, আমার সহস্র অশান্তি নিয়ে আমি যাতে তার সাধনার কোন ব্যাঘাত ঘটাতে না পারি।…কিন্তু তোমার সেই অসাধারণ শিল্পীটি সেখানে গিয়ে কি করেছেন জানো?'

তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ফুটে ওঠে সুধার কণ্ঠে।

মঞ্জু বিহ্বল হয়ে চেয়ে থাকে ওর দিকে। সুধাবৌদির কী মাথা খারাপ হয়ে যাবে এবার?

'শোন। তিনি বিলেত পৌঁছবার তিন মাস পরেই একটি হোটেলের ঝি-কে বিয়ে করেছেন এবং বাধ্য হয়ে একটি চাকরী নিয়েছেন সেখানে। শিল্পীর চাকরী নয়—সাধারণ চাকরী। যেমন তোমাকে চিঠি লিখেছেন—তেমনি এখানে আরও অনেককেই চিঠি দিয়েছিলেন। তোমাকে কি

লিখেছিলেন জানি না, আর দু'খানা চিঠির খবর আমি জানি, দুটোতেই লিখেছেন যে মঞ্জুর দয়ায় অনেকটাই হয়েছে—এখন আর সামান্য দু হাজার টাকা পেলেই তাঁর কাজ চলে যায়। প্রত্যেককেই একখানি করে ছবি উপহার পাঠিয়েছেন, আর লোভ দেখিয়েছেন যে আরও কিছু ভাল ভাল ছবি এঁকে পাঠাবেন। অথচ তখনই তাঁর এই বিয়ে হয়ে গেছে এবং এরই মধ্যে মাতলামির জন্য একদিন এক পাউণ্ড জরিমানা দিয়ে এসেছেন !'

এক নিঃশ্বাসে এতগুলো বলে বোধ করি দম নেবার জন্যই থামল সুধা।

মঞ্জু অনেকক্ষণ পর্যন্ত কথা কইতে পারলে না। তারপর বললে, 'সুরজিৎদা আবার বিয়ে করেছেন! কিন্তু সে কী করে হবে, তুমি থাকতে ?'

'হয়ত হয়। আমাদের ত হিন্দু বিবাহ, এখনও ত বহু বিবাহ বে-আইনী হযনি। আর তাছাড়া তিনি জানেন মামলা করার মত এক আধলাও আমার হাতে নেই !'

'কিন্তু এ খবর তুমি পেলে কী ক'রে ? কেমন ক'রে জানলে এ সত্যি ?'

'শুধু শুধু তোমার কাছে স্বামীর নিন্দা করতে আসিনি মঞ্জু। কিছুই ত ছিল না, দেহ পাত করেছি ওঁর জন্য, তবু একটা মিষ্টি কথাও পাইনি দীর্ঘকাল। একমাত্র সুখ ছিল চোখের দেখা—। সেটা থেকেও তুমি বঞ্চিত করলে।...যে বিশ্বাসে তুমি আমার এমন সবনাশ করলে সেটা যে কত বড় ভুল শুধু সেইটে জানাতেই আমি আজ এসেছি—যাতে জীবনে আর কখনও এমন ভুল না করো !'

বলতে বলতেই ঝর ঝর ক'রে জল ঝরে পড়ল সুধার দুই চোখ দিয়ে। ভগ্ন বিকৃত কণ্ঠে সে বললে, 'গিয়ে পর্যন্ত একটাও চিঠি পাইনি—ভাবনায় চিন্তায় পাগলের মত হয়ে গিয়ে আমার এক পিসতুতো দাদার পায়ে মাথা

খুঁড়েছিলুম। তাঁদের বিলেতের সঙ্গে কারবার আছে। তিনি তাঁর এক বন্ধুকে চিঠি লেখেন, সে সব খবর সংগ্রহ ক'রে পাঠিয়েছে। সে বন্ধু ইংরেজ অধ্যাপক—অকারণে মিছে কথা লিখবে না। ইতিমধ্যে ঐ চিঠি দু'খানার সন্ধানও পেলুম। আমি ত তাকে চিনি! তিন তিনটে টেলিগ্রাম করেছি—ছোট খোকার অসুখের খবর দিয়ে টেলিগ্রাম করেছি, তারও জবাব দেয়নি—এতবড় পাষাণ সে! আসলে আমার সঙ্গে আর কোন সম্পর্কই রাখতে চায় না!'

বলতে বলতেই উঠে দাঁড়াল সুধা।

কতকটা ব্যাকুলভাবে মঞ্জু ওর হাত ধরলে, 'আর একটু ব'সো বৌদি, আমাকে কথাটা বুঝতে দাও!'

'এখনই আমাকে টিউশ্যনীতে যেতে হবে। এই বাজারে ঘর ভাড়া দিয়ে আমাকে চারটে ছেলে নিয়ে বাঁচতে হয়। কথা কইবারও সময় নেই!'

হাতটা প্রায় ঝাঁকানি দিয়েই ছাড়িয়ে নেয় সুধা। তারপর কোনক্রমে তলা-ক্ষয়ে-যাওয়া চটিটায় পা গলিয়ে সে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে—কোন-দিকে না চেয়ে!...

অনেকক্ষণ আড়ষ্ট, স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকে মঞ্জু—পাথরের মত। বহুক্ষণ!

তারপর এক সময় পেছনে পদশব্দ পেয়ে চমক ভাঙ্গে ওর—এত দেরী দেখে মৃগাঙ্কমৌলিই নিচে নেমে এসেছে।

'মঞ্জু!'

চমকে ওঠে মঞ্জু। হঠাৎ যেন দিশাহারা আঁধারে জ্যোতির উদ্ভাসন হয়। সমুদ্রে জেগে ওঠে মৃত্তিকার শ্যাম সমারোহ! আবারও কী মিথ্যার পেছনে দৌড়চ্ছিল সে, কাঞ্চন থাকতে কাঁচের অভাবে জীবনের

সব কিছুই ব্যর্থ হয়ে গেল ভাবছিল!···যে দেবতাকে এতকাল, সেই মুকুলিকা বালিকা বয়সের হিসাব-না-রাখা দিনটি থেকে পূজা ক'রে আসছিল সে যে আসলে কাঁচের পুতুল ছাড়া আর কিছুই নয়—তাই এত সহজে ভেঙ্গে পড়ে গেল!

তার অবলম্বন, তার সত্যকারের দেবতা তার পাশেই আছে, মিথ্যা অহঙ্কারে, কল্পিত অভিমানে সে দেখতে পায়নি তাঁকে।···

'মঞ্জু!'

আবারও ডাকল মৃগাঙ্কমৌলি। তার কণ্ঠস্বরে সুগভীর স্নেহ। এবং হয়ত একটু উদ্বেগও—

মঞ্জু উঠে দাঁড়িয়ে প্রায় ছুটে এসেই মৃগাঙ্কর বুকে আছড়ে পড়ে। রুদ্ধ-কণ্ঠে বলে ওঠে, 'আমায় মাপ করো তুমি! আমায় ক্ষমা করো।'

সমাপ্ত